প্রবন্ধ-সঙ্কলন

মুজফ্ফর আহ্মদ

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা ৬

PRABANDHA SANKALAN
Muzaffar Ahmad
1970

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮৮

প্রচ্ছদ-চিত্র : চারু খান
আলোক-চিত্র : বারীন সাহা

দাম : ২০·০০

মুদ্রাকর
সুধেন্দু বাগচী
গুপ্তপ্রেস
৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

আমার কথা	১
ভারত কেন স্বাধীন নয় ?	৩
কোথায় প্রতিকার ?	৭
শ্রেণী-সংগ্রাম	১১
কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন	১৪
কারাগার সম্বন্ধে দেশের ঔদাসীন্য	১৮
স্বরাজের স্বরূপ	২১
শ্রমিক সম্প্রদায়	২৩
নির্বাচন	২৬
ভবিষ্য ভারত	৩০
কোন্ পথে ?	৩৫
সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম	৩৯
জনগণের কাজ	৪৪
রাজদ্রোহ	৪৯
নূতন দল	৫২
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ	৫৬
অর্থনীতিক অসন্তোষ	৬১
কৃষক সংগঠন	৬৬
"আসল কথাটা কি ?"	৭০
মুক্তি-সংগ্রাম	৭৭
একখানা পত্র	৮২
ইস্‌পার কি উস্‌পার ?	৮৯
ভদ্রশ্রেণীর মানবিকতা	৯৩
কি করা চাই ?	৯৬
খোলা চিঠির জওয়াব	১০১

নিবেদন ১০৫
কৃষক ও শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় ১১০
কৃষক ও শ্রমিক দল ১১৯
সাইমন কমিশন ১২৪
গণ-আন্দোলন ও কংগ্রেস ১২৮
পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ১৩৪
স্বরাজের স্বরূপ ১৪০
'শ্রেণীবিরোধ ও কংগ্রেস' ১৪৪
'আত্মশক্তি' ও আমরা ১৪৮
গোড়ায় গলদ ১৫৩

কৃষক-সমস্যা ১৫৭

সূচনা ১৬২
শ্রেণী-সংগ্রামই কৃষক-সমস্যার মূল ১৬৪
ধনিক-প্রথার প্রবর্তন ১৬৮
বিগত শতাব্দীর কৃষি-সঙ্কট ও কৃষকের অবনতি ১৭১
কৃষক-অভ্যুত্থান (উনবিংশ শতাব্দী) ১৭৪
কৃষক-অভ্যুত্থান (বিংশ শতাব্দী) ১৭৭
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণ-নীতি উহার বিরুদ্ধে যাইবে ১৮০
আমূল পরিবর্তন আবশ্যক ১৮৩
কৃষক সংগঠন অপরিহার্যরূপে আবশ্যক ১৮৭
কংগ্রেস ও কৃষক-সভা ১৯২
নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা ১৯৪
কৃষক আন্দোলন ও ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা ১৯৬
কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগ ১৯৮
নবরচিত শাসন-পদ্ধতি ১৯৯
কৃষকদের বিভাগ ২০১

আমার কথা

এই পুস্তকের 'কৃষক-সমস্যা' ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলি ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে রচিত। সেই কালের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' ও 'গণবাণী'তে এগুলি ছাপা হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বন্দীদশা হতে আমি মুক্তি পেয়ে কলকাতা এসে দেখলাম যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা' গঠনের 'উদ্যোগ-আয়োজন' চলছে। আমিও তখনই এ ব্যাপারে যোগ দিয়েছিলাম। এই নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিনায়কত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়ের নামক স্থানে, ১৯৩৭ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তারিখে। 'কৃষক-সমস্যা' এই সম্মেলনের সভাপতি-পরিষদের তরফ হতে সম্মেলনে পেশকরা নিবন্ধ। এটি ২৮শে মার্চ তারিখে সম্মেলনে পঠিত ও গৃহীত হয়। সভাপতি-পরিষদের সভ্য ছিলেন পাঁচ জন ঃ (১) বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, (২) ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) সৈয়দ আহ্মদ খান (নোয়াখালী), (৪) নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার ও (৫) মুজফ্ফর আহ্মদ। ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের সম্মুখে মীরাট বন্দীদের আদালতের বিবৃতির পরে একটা রাজনীতিক ও সাংগঠনিক বক্তব্য পেশ করার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল এই নিবন্ধ। পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসেই এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। প্রথমে দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তারপরে তিনবার তা পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়। এই দলীলটি পুস্তিকারূপে শেষ ছেপেছিলেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে। এখন এ পুস্তিকা আর কোথাও পাওয়া যায় না। পুস্তিকার ভাষা কৃষক-সভার পক্ষে কঠিন হয়েছে। কিন্তু এখন এর আর পরিবর্তন করা যায় না।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মিয়াদ ফুরোবার আগেই জেল হতে মুক্তি পেয়েছিলেম। কিন্তু মুক্তি পেয়ে আমি যে মরলাম না, "দু'পায়ে হেঁটে" দিব্যি রাজনীতিতে ফিরে এলাম তার জন্যে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে সার ডেভিড পেট্রি ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারি সার জন ক্রেরারের নিকট মন্তব্য লিখেছিলেন। ডেভিড পেট্রি ছিলেন ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর। আমি সে-সময়ে বুঝিনি তাঁর এই বিক্ষোভের কারণ কি? আজ 'লাঙল'-এর পুরনো ফাইল

পড়ে মনে হচ্ছে ১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখের 'লাঙল'-এ প্রকাশিত 'ভারত কেন স্বাধীন নয়' প্রবন্ধটি পড়ে হয়তো ডেভিড পেট্রি বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন।

১৯২৭ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখের 'গণবাণী'তে আমার 'কৃষক ও শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়' শীর্ষক একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। এই লেখাটি ঢাকা জিলা বিশেষ যুব-সম্মেলনে কৃষক ও শ্রমিক শাখায় সভাপতিরূপে আমার অভিভাষণ। বলা বাহুল্য, সম্মেলনকে নানা শাখায় বিভক্ত করা হয়েছিল। আমার ভাষণ আমি ১৯শে আগস্ট তারিখে সম্মেলনে পাঠ করেছিলেম। মনোযোগসহকারে পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন যে আমার ভাষণে আমি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেছি। ঢাকা শহর ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের একটি বড় কেন্দ্র। ওই শহরে তাঁদের বিভিন্ন দলের সভ্যরা ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সাধারণ ভাবে নিজেদের সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁদের আবার দলেদলে রেষারেষিও চলত। সম্মেলনের সময়ে আমরা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেম যে অনুশীলন সমিতির সভ্য ধনেশ ভট্টাচার্যের মাথা অন্য কোনো দলের সভ্যরা ফাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে পেছন হতে তাড়া করা হচ্ছিল, আর তাঁর মাথা হতে অবিরাম রক্ত ঝরছিল। আমার সমালোচনা না বুঝে এই বিপ্লবীরা ইচ্ছা করলেই আমারও মাথা ফাটিয়ে দিতে পারতেন। আমাকে কে দয়া করেছিলেন,—অনুশীলন, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, যুগান্তর, না, সকলে—তা জানিনে, অক্ষত মাথা নিয়ে সেদিন আমি কলকাতা ফিরে এসেছিলেম। কিন্তু আমার সমালোচনা ব্যর্থ হয়নি। সেদিনের আট, নয়, দশ বছরের ভিতরে আমরা তাঁদের আমাদের মধ্যে পেয়েছিলেম। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা দলে দলে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

যে-লেখাগুলি এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সে-সবের কোনো মূল্য আছে কিনা সে-বিচার পাঠকেরা করবেন। এগুলির সংরক্ষণই আমার বিশেষ উদ্দেশ্য। তাই, সারস্বত লাইব্রেরি এগুলিকে পুস্তকের রূপ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করতেই আমি আমার সম্মতি জানিয়েছি। তাঁরা শুধু আগ্রহই প্রকাশ করেননি, কঠোর পরিশ্রম করে 'লাঙল' ও 'গণবাণী' হতে লেখাগুলি কপিও করে নিয়েছেন। এজন্য আমি সারস্বত লাইব্রেরিকে ধন্যবাদ জানাই।

মুজফ্ফর আহ্মদ

৪৯ লেক প্লেস, কলিকাতা

১০ই এপ্রিল, ১৯৭০

ভারত কেন স্বাধীন নয় ?

ইংল্যাণ্ডের ধনিক সমাজ তাদের লোভ চরিতার্থ করার জন্যে ইংল্যাণ্ডের নামে ভারতবর্ষকে শাসন করছে, আর ভারতবর্ষ তার নিঃস্বার্থপরতাহেতু এই ধনিক সমাজেরই ভোগের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের নামে দাসখত লিখে দিয়ে বসে আছে। কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলছি। ভারতে যাঁরা জাতীয় আন্দোলন নিয়ে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের অধিকাংশই ভারতের বর্তমান শাসনকে ব্যুরোক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্র নামে অভিহিত করে থাকেন। এই আমলাতন্ত্রকে তাঁরা ধ্বংস করতে চান, তবে ধ্বংস করে এর জায়গায় তাঁরা কোন্ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা জানবার সৌভাগ্য কিন্তু আজো পর্যন্ত আমাদের ঘটে উঠেনি। জগতে অদ্যাবধি এমন কোনো তন্ত্র কল্পিত হয়েছে বলে আমরা শুনিনি, যার কাজ চালাবার জন্যে আমলার প্রয়োজন হবে না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অবস্থাভেদে এই আমলার প্রকারভেদ হয়ে থাকে। একটা তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে হবে সেখানে সে-তন্ত্রের একটা দফ্‌তরের প্রতিষ্ঠাও হতে হবে, আর এই দফ্‌তরটিকে রক্ষা করবার জন্যে আমলারও প্রয়োজন হবেই হবে। দফ্‌তর আর আমলা এ দু'টো বস্তু একেবারেই হরিহর-আত্মা, কাউকে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতে বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এটা আমলাতন্ত্র নয়,—পরন্তু ধনিকতন্ত্র, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Plutocracy, ঠিক তাই।

যাঁদের শোনবার জন্যে কান আছে আর দেখবার জন্যে চোখ রয়েছে, তাঁরা জানেন ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের দ্বারা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না, যাঁরা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁরা হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের জনকতক ব্যাপারী, যত পান ততই তাঁরা চান, তাঁদের লোভ অপরাজেয়। নিজেদের দেশের ধন-সম্পত্তিতে তাঁদের পেট ভরছে না। তাই, তাঁরা ভারতবর্ষে ও অন্যান্য উপনিবেশে দোকান খুলে বসেছেন। ঠিক এ অবস্থা ফ্রান্সের, এ অবস্থা আমেরিকার। ফ্রান্স আর আমেরিকাকে যে গণতন্ত্র বলা হয় সেটা শুধু মনকে চোখ-ঠারা মাত্র। আসলে এ দু'টো গবর্নমেণ্টও ধনিকতন্ত্র

ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাক, ইংল্যান্ডের ধনিক সমাজের কথা বলছিলাম। আমরা অবুঝ আর নাবালক বলে আমাদের উপকারের জন্যে তাঁরা আমাদের অভিভাবক হতে আসেননি। আমাদের এদেশ তাঁদের কারবারের জায়গা। সকল মহাজনেরই খরিদ-বিক্রীর সুবিধার জন্যে স্থানীয় দালালের প্রয়োজন হয়ে থাকে, ইংল্যান্ডের ধনিক সমাজেরও বহু ভারতীয় দালাল রয়েছেন। তাঁরা নানারূপে নানা আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। জমিন কোথায় রয়েছে তা জানা না থাকলেও তাঁরা জমিনের মালিক, কোনো প্রকারে পণ্যদ্রব্য স্পর্শ না করেও তাঁরা মহাজন অর্থাৎ লাভের মালিক, পণ্যদ্রব্য তৈয়ার না করেও তাঁরা পণ্যদ্রব্যের মালিক, আর কর্মক্ষেত্রে তাঁরা যতই কম পরিশ্রম করেন ততই বেশী মাইনের মালিক। কাজেই ধনিকতন্ত্রের দ্বারা সাধারণ ভাবে ভারতের যতই অহিত হোক না কেন, তাঁদের নিজেদের হিত যথেষ্ট হচ্ছে, আর এই আত্ম-হিতের জন্যে তাঁরা ধনিকতন্ত্রেরও হিতাকাঙ্ক্ষী।

এই যে রীতি-নীতি চলেছে এর জন্যে যাঁরা সকল দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাঁরা ভারতের জনসাধারণ—ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। কৃষকগণের দ্বারা সর্ববিধ খাদ্যোপাদান হচ্ছে বটে, কিন্তু সে খাদ্যোপাদান তাঁদের ভোগে যা এসে থাকে, তা না আসারই মতো। শ্রমিকদিগের অবস্থাও তথৈবচ। কারখানাতে তাঁরা খেটে মরেন সত্য, পেটে খেতে কিন্তু যথোপযোগী খাদ্য পান না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে ভারতের লোক দিনকে দিন রুগ্ন, পঙ্গু ও অল্পায়ু হয়ে পড়ছেন, ভারত ধ্বংসের পথে চলেছে।

আমরা দেখেছি কুকুর বিড়ালকে তাড়া করে নিয়ে যায়, বিড়াল তো প্রথমে প্রাণপণে ছুটে ছুটে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে যখন উঠে না, তখন ফিরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করে কুকুরকে। এও দেখেছি এই আক্রমণের চোট কুকুর প্রায় সহ্য করতে পারে না। কিন্তু, এদেশের কৃষক, এদেশের শ্রমিক দিনের পর দিন স্বার্থান্বেষী লোকদের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হচ্ছেন, অথচ, একটি প্রতিবাদের শব্দ তাঁদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে না। এঁদের জীবনে যোগের সাথে কোথাও দেখা-শোনা নেই, কেবল বিয়োগ আর বিয়োগ, বিয়োগের একটানা রেখাটি যেন কোথায় কোন্ অসীমের পানে বেড়েই চলেছে। ভারতের এ দুরবস্থার সাথে জগতের আর কোনো দেশের অবস্থার তুলনা হয় না। আর-আর দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকেরাও যা পাওয়া উচিত তা হয়তো পান না, কিন্তু না পাওয়ার জন্যে অসন্তোষ তাঁরা সর্বদাই প্রকাশ

করে থাকেন। সেইজন্যে তাঁদের জীবন সকল দিক দিয়ে আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের চেয়ে উন্নত।

ভারতবর্ষ একটি অভিশপ্ত দেশ, নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ এর সকল দিককে ঘিরে রেখেছে। এদেশে প্রাচীনকালে বড় বড় ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা নাকি বলে গিয়েছেন, জীবনটা নিছক মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁদের মতে জীবনে বিয়োগের অংকটা যতই বাড়ানো যায় ততই নাকি পুণ্যের কাজ করা হয়, আর যোগের অংক বাড়ালে হয় পাপ, এমন বড় পাপ যে তার কোনো কালে ক্ষমা নেই। পরে এলেন মুসলমানরা। তাঁরাও নিয়ে এলেন গোটা কতক থিওলজি অর্থাৎ ব্যবস্থা-শাস্ত্রের কেতাব। কাজেই ব্যবস্থা-দাতা অর্থাৎ মোল্লার সংখ্যা এদেশে খুব বেড়ে গেল। এই মোল্লারা শিখাচ্ছেন, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টটা কিছুই নয়। কোনো রকম করে দুনিয়ার এ দু'দিনের জীবনটা দুঃখ-কষ্টে কাটালেই হ'ল, তারপরে, পরকালে অক্ষয়স্বর্গে অনন্ত জীবন, আর অনন্ত সুখ। মোটের উপর, কপট সাধু-সন্ন্যাসী-পুরুত-পুরোহিত ও মোল্লা-মৌলবী-ফকিরগণ ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হতে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলোপ-সাধন করে দিয়েছেন। এঁদের ফাঁদে পড়ে ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণ বাকীর লোভে হাতে-পাওয়া জিনিসটা খুইয়ে বসে আছে। শ্রেণী হিসাবে এই কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এঁরা শ্রমবিমুখ লোক, আপনাদের যোল আনা ভোগের জন্যে জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগের বাণী প্রচার করে থাকেন। এঁদের পেশা হচ্ছে কৌশলজাল বিস্তারপূর্বক নিরীহ চাষী-মজুরদিগকে লুঠ করা। কাজেই, শ্রেণী হিসাবে এঁরাও ধনিকতন্ত্রের খুব বড় সহায়ক।

ভারতের প্রাণশক্তি হচ্ছে ভারতের চাষী আর মজুরগণ। এঁদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জনের কম নয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এঁদের চাওয়া-না-চাওয়ার উপরে নির্ভর করছে। এঁরা আপনাদের পাওনা ষোল আনা বুঝে নিতে বদ্ধপরিকর না হলে ভারতের বর্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন কিছুতেই সাধিত হতে পারে না। কিন্তু এঁদের জীবনে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যদি না জন্মে তবে কিসের জন্যে এঁরা পাওয়ার দাবী জগতের সম্মুখে পেশ করতে যাবেন? ভারতের নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ-ক্ষেত্রে সমবেত হতে হবে। চাষী আর মজুরদের মধ্যে জীবনের বাণী প্রচার করা আর তাঁদের সত্যকারের জীবনের সন্ধান দেওয়াই নবীন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র কাজ। চাষী আর মজুরদের বলতে হবে, তোমরা অজানা

ভবিষ্যতের লাভের আশায় বর্তমানের শ্রমলব্ধ ধন পরের পায়ে বিলিয়ে দিয়ে বসে আছ, কিন্তু জান না তোমরা, বিয়োগের ভিতর দিয়ে লাভ কখনো হতে পারে না। লাভের জন্যে যে যোগ চাই-ই চাই। তাদের বোঝাতে হবে, তাদের শ্রমের ধনে তাদের ভোগের অধিকার ষোল আনা রয়েছে, সে-অধিকার ত্যাগ করে তারা পৌরুষের পরিচয় না দিয়ে কাপুরুষতার পরিচয়ই দিচ্ছে, মনুষ্যত্ব হতে তারা বহুদূরে সরে পড়েছে। এক কথায়, জীবনে খাওয়া-পরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যতদিন না আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রাণে জাগবে ততদিন আমাদের অবস্থার পরিবর্তন কিছুতেই হবে না। পরিবর্তনের প্রয়োজনের সৃষ্টি না হলে পরিবর্তন কেনই বা হবে?

কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির দুষ্ট আওতা হতে ভারতের কৃষক- ও শ্রমিক-জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করতে পারলে আমাদের উদ্ধারের আশা একেবারেই নেই। এ অবস্থায় আমাদের শুধু যে দাসত্বের ঘৃণিত জীবন বহন করতে হবে, তা নয়, আমাদের জীবন দিনকে দিন যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে আমরা ধরাবক্ষ হতে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাব।

লাঙল : ১৪ই জানুয়ারি, ১৯২৬

কোথায় প্রতিকার ?

বালির ওপরে পাকা ইমারত তৈয়ার হতে পারে না, একথা সকলেই জানেন, কিন্তু, তথাপি আজ ক'বছর থেকে ভারতবর্ষে একান্ত ভাবে সে চেষ্টাই চলছিল। অদ্ভুত, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনো কাজ করতে গেলে যা হয়ে থাকে, ভারতের ভাগ্যেও ঠিক আজ তা-ই হতে চলেছে,—লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দিন থেকে ভারতে যে একটি রাষ্ট্রীয় পাকা ইমারত গড়ে উঠছিল, সেইটে আজ ভেঙে পড়তে বসেছে—শুধু যে ভেঙে পড়তে বসেছে তা নয়, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাকে ভেঙে পড়তেই হবে। ভারতের জাতীয় মহাসমিতি (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) ভারতে বৃহত্তম ও প্রতিপত্তিশালী সংঘ। এক ফুৎকারে যেমনি তাসের ঘর উড়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে আজ জাতীয় মহাসমিতি উড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ধরতে গেলে অনেকটা উড়েই তো গিয়েছে। কিন্তু, কেন এমন হ'ল ?

ধর্মের ভেদবুদ্ধির ভিত্তির ওপরে জগতে কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমরা কোনোদিন শুনিওনি। কিন্তু ভারতে হিন্দুতে আর মুসলমানে মিলে যে একটা সংহতি গড়বার চেষ্টা চলছিল, কিংবা, আজো পর্যন্ত চলেছে, তাতে এই ধর্মের ভেদবুদ্ধির প্রণোদন সব সময়ে ছিল এবং আজো আছে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে হিন্দু আর মুসলমান সংহত হয়েছিল, কিন্তু যে-চুক্তির ওপরে হয়েছিল সেটা ধর্মের ভেদবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সকলেই জানেন, মুসলমানদিগকে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিশেষ অধিকার দেওয়ার কথা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই স্থিরীকৃত হয়। গান্ধীজীর নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনও আগাগোড়া ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পরিপূর্ণ ছিল। এই আন্দোলনে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু, হিন্দু আর মুসলমান কেউ কাউকে বিশ্বাস করেননি। হিন্দুরা কখনো মনে করতে পারেননি যে খিলাফৎ আন্দোলনে তাঁরা যোগদান না করলে মুসলমানরা তাঁদের সাথে মিশে কাজ করবেন, আবার অনেক মুসলমান ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে শুধু এই জন্যে 'এসেছিলেন'—যেহেতু হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলেন। বাদ্য আর খাদ্যের একটা হাস্যাস্পদ প্রশ্ন ছিল নন্-কো-

অপারেশন আন্দোলনের বড় প্রশ্ন। গরু নাকি হিন্দুর দেবতা, সেজন্যে মুসলমানদের বলা হয়েছিল, "তোমরা গরু খেয়ো না।" মস্‌জিদে মস্‌জিদে মুসলমানরা 'নমাজ' পড়ে থাকেন। সেই নমাজের নাকি ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে হিন্দুরা তার সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে। বড় বড় শহরে ট্রামের ঘর্‌ঘরানিতে নমাজের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের ভোঁ ভোঁ'তেও কোনো ব্যাঘাত হয় না, এমন কি মোহরমের বাদ্য যত তুমুল ভাবেই বাজুক না কেন তাতেও নমাজ এতটুকুও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না,—হয় কেবল হিন্দুর বাদ্য-ধ্বনিতে। মুশকিল এই যে, এই বাদ্য বাজানো আর সংকীর্তন করা হিন্দুর আবার ধর্ম-কর্ম। গরু খাওয়ার বিরুদ্ধে দু'শ্রেণীর হিন্দু দুই দিক থেকে আপত্তি করে থাকেন। এক শ্রেণীর হিন্দু বলেন এবং বিশ্বাসও করেন যে গরু তাঁদের দেবতা। আর এক শ্রেণীর হিন্দুর মনে গরু যে দেবতা এ কুসংস্কারটি বদ্ধমূল হয়ে আছে, কিন্তু. এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এমন হাস্যাস্পদ কথাটি তাঁরা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তাই, তাঁরা আপত্তিটি তুলে থাকেন ঠিক অন্য ভাবে। তাঁরা বলেন, নানা দিক থেকে মানুষের সেবার জন্যে গরু একটি বিশেষ আবশ্যক জন্তু। খেয়ে খেয়ে গরুর সংখ্যা কমিয়ে দিলে একদিন গো-বংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু, খাদ্য হিসেবে গরুকে খেলে যে মানুষের একটা সেবা তাতেও হয়ে থাকে, এটা তাঁরা বুঝেও বোঝেন না। আসলে গরু যে এদেশে কমছে কিংবা দুর্বল ও রুগ্ন হচ্ছে সে তো মানুষের খাওয়ার জন্যে নয়। গরুর চেয়ে মুরগী ও ছাগল প্রতিদিন শতগুণ বেশী বধ হচ্ছে। কিন্তু, তবুও মুরগী ও ছাগলের বংশ তো ভারত হতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। হল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ডে লোকে কত ভাবে, কত জিনিস তৈরার করে প্রতিদিন গো-মাংস খাচ্ছেন তার ইয়ত্তা করাই কঠিন। অথচ এ দু'টো দেশ দুধে ভেসে যাচ্ছে। এত বেশী দুধ এই দুই দেশে পাওয়া যায় যে, লোকেরা তা খেয়ে ফুরোতে পারে না, তাই, দেশে দেশে চালান পাঠিয়ে থাকেন জমিয়ে এবং আরো অনেক উপায়ে। আমাদের দেশে গরুর যে অবনতি হচ্ছে, কিংবা গরু যে কমে যাচ্ছে তার কারণ যতটা যত্ন নেওয়া উচিত ততটা যত্ন আমরা গরুর নিই না।

এই সমস্ত হাস্যকর ব্যাপারগুলো এদেশে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে বড় প্রশ্ন, আর এ প্রশ্নগুলোর সমাধান না হলে হিন্দুতে আর মুসলমানে নাকি সম্মিলন কিছুতেই হতে পারেই না। চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ দল' গঠন করলেন। মুসলমানকে তাঁর দলে চাই; তাই, তিনি এক চুক্তিপত্র তৈয়ার করলেন, তাতে বিধিবন্ধ করলেন মুসলমানদের বিশেষ নির্বাচনাধিকার বিশেষ ভাবে দেওয়া

হবে, অফিস-আদালতে চাকুরিও দেওয়া হবে ঠিক সেই ভাবে। আমি জানি ধর্মের স্বাভাবিক ঘৃণা আমাদের দেশের লোকদের এমনি অন্ধ করে রেখে দিয়েছে যে তারা অপরধর্মাবলম্বীকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে পারে না। এ অন্ধত্ব হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে সমান ভাবেই আছে। তবে, অফিস-আদালত-আদিতে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী বলে চাকুরি প্রভৃতির দিক থেকে মুসলমানরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, এই সমস্ত ভেদবুদ্ধির প্রতিকার লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট থেকে আরম্ভ করে 'স্বরাজ দল' গঠন পর্যন্ত যা কিছু হয়ে গেছে, তার কোনোটাতেই হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের জন্যে যা যা করা হয়েছে সে-সমস্তই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ততর করে দিয়েছে। ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে আকাশ যেরূপ ভাব ধারণ করে থাকে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপ ভাবই ধারণ করে আছে। হিন্দু-মহাসভা, হিন্দু-সংগঠন, শুদ্ধি-আন্দোলন, খিলাফৎ, তব্‌লীগ, তন্‌জীম্‌ ও মুসলিম লীগ প্রভৃতিতে মিলে এমন একটি সর্বনেশে ব্যাপার ঘটিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করে তুলেছে যে তাতে ভারতের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

লালা লাজপৎ রায় নাকি একজন 'সোশালিস্ট'। সোশালিস্টরা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে আপনাদিগকে কিছুতেই প্রলিপ্ত করতে পারেন না। আমার বেশ মনে পড়ছে আমেরিকা হতে ফিরে এসে 'লালাজী' ঘোষণা করেছিলেন যে, কোনো ধর্মে তাঁর আস্থা নেই। অথচ আজ সেই লালাজী হিন্দু-মহাসভা আর সংগঠনের একজন মস্ত বড় চাঁই। লালাজী যতই ব্যাখ্যান করুন, আর যতই কৈফিয়ৎ দিন না কেন, তাঁর হিন্দু-মহাসভা আর সংগঠন ভারতের কোনো হিতসাধন করতে পারবে না। পরন্তু, সর্বনাশ-সাধন যথেষ্টই করবে। ডাক্তার সয়ফুদ্দীন কিচ্‌লু জেল হতে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটানোর জন্যে তিনি তাঁর জীবন পর্যন্ত বলিদান করতে প্রস্তুত আছেন। এহেন ডাক্তার কিচ্‌লু আজ 'তন্‌জীম্‌' আন্দোলনের প্রধান পাণ্ডা। হিন্দু-মুসলিম বিবাদ মিটানোর কি মহান্‌ চেষ্টাই আজ তিনি করছেন!

চারদিক থেকে এই যে অমঙ্গল ঘনিয়ে এসেছে, এর প্রতিকার কোথায়? কি করে ভারতবর্ষ আজ আপনাকে এই সকল অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে পারে?

জগতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মনে করেন তাঁর ধর্মটি বিশেষ ভাবে সত্য,—প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মনে করেন ঈশ্বরের

বিশেষ ইচ্ছানুসারে তাঁর ধর্মটির সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একটি ধর্মের বিধি-নিষেধের সাথে আর একটি ধর্মের বিধি-নিষেধের কিছুতেই মিশ্ খাচ্ছে না। গরু নামক জন্তুটি মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতির খাদ্য, এবং হিন্দুর দেবতা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের প্রতি ধর্মের দিক থেকে এমনি বিশ্রী ভাবে ঘৃণা পোষণ করে থাকেন যে, তা দেখে মনে হয়, ধর্মের সৃষ্টি মানুষের জন্যে হয়নি, পরন্তু, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের জন্যে। সকল ধর্মাবলম্বী লোকের মুখেই একটি সাধারণ কথা আমরা শুনতে পেয়ে থাকি। তাঁরা বলেন, মানুষ নামক জীবটি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম সৃষ্টি। আবার, এই মানুষকে ঘৃণা করাই নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম। ধর্মের মৌলিক ভিত্তিটা কি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। তবে, আজকের দিনে ভারতবর্ষে ধর্ম যে জায়গায় এসে পোঁছেচে, তাতে এখনো ভারতের জনসাধারণ, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়, অবহিত না হলে আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান এখানেই হয়ে যাবে। দেশের জনসাধারণ চারদিক থেকে বিলুণ্ঠিত হয়ে হয়ে খাওয়া-পরার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আজ তাদের যে শক্তিটা তাদের অন্ন-বস্ত্রাভাবের কারণ অনুসন্ধানে ব্যয়িত হতে পারত, সেই শক্তিটা ব্যয়িত হচ্ছে ধর্মের গোঁড়ামির জন্যে। দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আড্ডা হয়ে উঠেছে; নিরীহ বুভুক্ষু শ্রমিক ও কৃষকদিগকে স্বার্থপর লোকেরা ধর্মের নামে নাচাচ্ছে।

একটি মাত্র জিনিস,—কমিউনিজম্ আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কম্যুনিস্টরা মনুষ্যত্বটাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয় না। তারা ধনিকগণের লোভ-লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে, সর্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করে কম্যুনিস্টরা জগতে স্থায়ী-শান্তি আনয়ন করবে।

লাঙল: ২৮শে জানুয়ারি, ১৯২৬

শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রেণী-সংগ্রামের নাম শুনেই অনেকে আঁতকে উঠেন। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, অরাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, মানবতার প্রেমিক ও নিরপেক্ষবাদী—প্রত্যেকেই এ জিনিসটিকে খারাব ভাবে গ্রহণ করে থাকেন, এবং এর জন্যে তাঁরা দায়ী করেন সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদিগকে। তাঁদের অভিযোগ এই হচ্ছে যে সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টরা কেবলমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদেরই পক্ষাবলম্বন করছেন, ইহার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা কেবল বেড়েই যাচ্ছে। আর একদল লোক আছেন যাঁরা কার্ল মার্ক্স হতে আরম্ভ করে লেনিন পর্যন্ত প্রত্যেককেই সমান ভাবে ভক্তি করে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম জিনিসটিকে প্রশ্রয় দিতে তাঁরা একেবারেই রাজী নন। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা ভারতবাসীর মধ্যেই পরস্পর সংঘাত বেধে যাবে, এই আশংকা তাঁরা করেন। ভারতবর্ষ বিদেশীর পদানত হয়ে আছে। যতদিন না এ বিদেশীদের বিদেয় করে দেওয়া যায় ততদিন ঘরের বিরোধ তাঁরা ঘটাতে চান না। দেশীয় জমিদার দেশীয় কৃষকদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেন, আর দেশীয় ধনিকেরা দেশীয় শ্রমিকদের রক্ত শুষে খান, এ-সব কথা তাঁরা জানেন ও মানেন। তাঁদের মতে এ-সবই আমাদের সয়ে নিতে হবে যতদিন না ইংরেজরা আমাদের দেশ থেকে চলে যায়।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম—স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, সোশ্যালিস্ট বা কম্যুনিস্টদের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। সমাজের অসম গঠনের জন্য এ যুদ্ধ আপনা হতেই বেধে বসে আছে। সোশ্যালিস্ট বা কম্যুনিস্টদের একটি প্রাণীও যদি আজকের দিনে বেঁচে না থাকে তবুও শ্রেণীর সংগ্রাম সমাজ হতে কিছুতেই মিটবে না।

সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে বলেই শ্রেণী-সংগ্রাম হচ্ছে। আমরা জমিদার, মহাজন, ধনিক, ব্যবসায়ী, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কথা বলে থাকি। এমন কোন্ মূর্খ আছে যে সমাজের সকল লোককে এ-সব নামে ডাকতে পারে? আমরা শ্রমিক, কারিগর, কৃষক ও সম্পত্তিবিহীন লোকের কথাও সদাসর্বদা বলে থাকি। তাদেরকে আমরা জমিদার ও ধনিক প্রভৃতি নামে কি কখনো ডাকতে পারি? তারপর, শ্রমিক ও কৃষক প্রভৃতির

স্বার্থ যে ধনিক ও জমিদার প্রভৃতির স্বার্থের সাথে এক হতে পারে না একথা যে কোনো বোকা লোকও বুঝতে পারে। সোজা ভাবে বোঝাবার জন্যে উপরে আমরা যতগুলি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছি সে-সমস্তকে দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে; যেমন ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক আমরা কোন্ শ্রেণীর লোককে বলব? শ্রমিক শ্রেণীর লোকের আয়ের উপায় হচ্ছে তার মেহনত বিক্রী করা। যে ঘরে সে বাস করে সে-ঘরখানার মালিক সে নিজে হতে পারে, যে জমিতে সে-ঘর রয়েছে সে-জমির মালিকও সে হতে পারে। কিংবা এ ছাড়া আরো দু'এক বিঘা জমি-জিরাট বা দু'চারটে গরু বাছুরও তার থাকলেও থাকতে পারে। এ সমস্তের মালিক হওয়াতে তাকে কিছুতেই ধনিক শ্রেণীতে গণ্য করা যেতে পারে না। যদি তার আয়ের বেশীর ভাগই সে দিন-মজুরি বা চাকুরির মাইনের দ্বারা পায় তবেই সে শ্রমিক। শ্রমিকের অস্তিত্বটা বজায় থাকে তার বাহুর বা মস্তিষ্কের শক্তির বিক্রয়ের দ্বারা। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকও শ্রমিকের শ্রেণীতে এসে পড়েছে। তার উৎপন্ন দ্রব্য এমনি ভাবে বিলুণ্ঠিত হয় যে তাকে খেতের মজুর ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

নিজের আয়ের জন্যে যে অন্যের পরিশ্রম কিনে নেয় তাকেই ধনিক বলা হয়। যেখানে বেচা-কেনার কারবার হয়, সেখানে দরাদরিও হয়ে থাকে। ধনিক চায় যথাসম্ভব সস্তায় শ্রমিকদের পরিশ্রম কিনে নিতে, আর শ্রমিকরা চায় যতটা সম্ভব তাদের পরিশ্রমের মূল্য ধনিকদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে। পরস্পরের এই যে, দ্বন্দ্ব, এ দ্বন্দ্বকে সোশ্যালিস্ট বা কম্যুনিস্টরা শ্রেণী-সংগ্রাম নামে অভিহিত করে থাকে।

এ শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য আমাদের তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা সোশ্যালিস্ট আর কম্যুনিস্টদের দোষ দিচ্ছেন। এ হচ্ছে ঠিক হাওয়া ঘরের অধ্যক্ষকে ঝড় হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে দোষ দেওয়ার মতো। সোশ্যালিস্ট বা কম্যুনিস্ট শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য মোটেই দায়ী নন। শ্রেণী-সংগ্রাম যে সমাজে অবিরত চলেছে এটুকুর প্রতি তাঁরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন মাত্র। শ্রেণী-সংগ্রাম জিনিসটাকে তাঁরাও যে পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু তাঁরা এও কখনো বিশ্বাস করেন না যে সিংহ আর মেষ এক জায়গায় বসবাস করতে পারে; অবশ্য সিংহ যদি নিরামিষভোজী হয়ে যায় সে আলাদা কথা।

সমাজের পরান্নভোজী ধনিকগণই শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য দায়ী। তারা উৎপাদনকারীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বলেই শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে, এ সংগ্রাম তারা মেটাতেও পারে না। যে কারণটা এই সামাজিক

সংঘাতের ভিত্তি সেই কারণটার উপরে, অর্থাৎ উৎপন্নকারীদিগকে তাদের শ্রমলব্ধ ধন হতে বঞ্চিত করার উপরেই ধনিকগণের জীবন নির্ভর করছে। শ্রেণী-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটাবে এই বঞ্চিত শ্রমিকগণ। এই করে তারা সমাজ হতে ধনিকগণের অস্তিত্ব যে শুধু মিটিয়ে দেবে তা নয়, তাদের নিজেদের অস্তিত্বও আর থাকবে না। মানুষ সভ্যতার এমন এক স্তরে এসে হাজির হবে যেখানে সকলেই কাজ করবে, আর সকলেই তার ফলও ভোগ করবে।

লাঙল : ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন

চাষী আর মজুরের সংখ্যা ভারতবর্ষে কত বেশী একথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষে সত্যিকারের গণ-আন্দোলন যা, তা হচ্ছে এই চাষী আর মজুরের আন্দোলন। ভারতের এ বিশাল গণ-শক্তিকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সমরে আমরা কোনোদিন জয়ী হতে পারব না। সকল প্রকারের জাতীয় আন্দোলন তার প্রেরণা হয়তো মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে, কিন্তু তার শক্তি জুগিয়েছে কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। কিন্তু বড় দুঃখ যে, এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় বরাবর কৃষক ও শ্রমিকদের অবহেলা করে এসেছেন। তাদের মঙ্গলের জন্যে যে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি কোনোদিন কিছু বলেনি, এমন কথা আমরা কখনো বলতে পারব না। কংগ্রেসের নেতারা চাষী আর মজুরের জন্যে মায়াকান্না অনেক কেঁদেছেন। কিন্তু, ধনী ও বিত্তশালী লোকদের সহিত উৎপন্নকারীদের সংঘর্ষ যখনি বেধেছে তখনি কংগ্রেসের নেতারা ধনী ও বিত্তশালী লোকদেরই পক্ষাবলম্বন করেছেন। চৌরি-চৌরা ও মালাবারের কৃষকদের বিদ্রোহের কথা সকলেই জানে, আর মহাত্মা গান্ধী যে এ দু'ব্যাপারকেই খুব বেশীরূপ নিন্দা করেছেন তাও কাহারো অজানা নেই। কংগ্রেস বলতে সে-যুগে মহাত্মা গান্ধীকেই বোঝাত, কারণ, তখন তাঁর কথার ওপরে কথা বলার শক্তি কংগ্রেসের কোনো লোকেরই ছিল না। আমরা জানি, বিদ্রোহ করতে যেয়ে চৌরি-চৌরা ও মালাবারের কৃষকরা অনেক অন্যায় কাজও করেছে, তবে যে কারণে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল সে কারণটি তো মোটেই মিথ্যা নয়। সত্যপ্রিয় মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এখানে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করেননি, কেননা, মিথ্যার পক্ষে ছিল বিত্তশালী সম্প্রদায়। এ-সব ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের বাংলা দেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিধি পর্যন্ত সব কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সেই একই ভঙ্গী,—বিত্তশালী লোকদের পক্ষাবলম্বন।

দেশের স্বাধীনতা সত্যিকার ভাবে যাঁরা চান তাঁদেরকে এমন কাজ করতে হবে যাতে সেই পথে আমরা একান্ত ভাবে এগুতে পারি। স্বাধীনতা সমরের পতাকা বহন করার কোনো অধিকার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর লোকের নেই। শ্রমিকদিগকেই এই মুক্তির পতাকা বহন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এ যুগে শ্রমিক ও অ-শ্রমিকের সংগ্রামই প্রকৃত মুক্তি-সংগ্রাম। এদেশের শ্রমিক তাদের আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন নয়,--তারা অজ্ঞান ও নিরক্ষর। যুগের পর যুগ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে তাদের এই দশা ঘটেছে। কিন্তু, তবুও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার লক্ষণ আজ চারিদিকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে, আর এ লক্ষণ অতি শুভ লক্ষণ। আজকের দিনে আমাদের জাতীয় মুক্তিকামী বন্ধুদের একমাত্র কাজ হচ্ছে শ্রমিকগণের এ চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী করে তোলা। আমাদের সমাজ আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেচে, তাতে তার গতিরোধ করবার শক্তি কাহারো নেই। ভারতের কৃষক ও ভারতের শ্রমিকের উত্থান হবেই হবে। নানা ভাবের লোক, নানা দিক থেকে আজ শ্রমিক ও কৃষকদিগকে সংহত করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে, কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থাপেক্ষা নিজেদের স্বার্থই খুব বেশী রকম রক্ষা করে থাকে। এদের অনেকেই জমিদার ও ধনিকের প্রসাদভোজী। শ্রমিক সংগঠনের নাম দিয়ে শ্রমিকদিগকে দাবিয়ে রাখাই এদের কাজ। আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলে আপনাদের মধ্য হতে লোক দাঁড় করাতে পারছে না। এ সুযোগ পেয়েই তথাকথিত স্বার্থপর শ্রমিক-নেতৃগণ শ্রমিকদের মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছে। কিন্তু, তাদের এ নষ্টামি আর কিছুতেই করতে দেওয়া উচিত নয়।

দেখে শুনে মনে হয়, স্বাধীনতা সমরের জন্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা আমাদের অধিকাংশ স্বাধীনতাকামী বন্ধুরা বুঝতে পারেন না। শ্রমিক সংগঠনের নামে তাঁরা বড় ভয় পান, মনে করেন, তাতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হবে। এমন ধারণা সত্য সত্যই তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সমাজের উচ্চাসনের লোকদের প্রতি তাঁদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণই তাঁদের এত বেশী ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু এই ভয়ের জন্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। সংগঠনের কারণ সমাজে বর্তমান রয়েছে। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সংগঠন হবেই হবে। বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার সাহসই হচ্ছে প্রতিকারের একমাত্র উপায়। আমরা এড়িয়ে চললেও যে এ জিনিসটি ধামাচাপা পড়বে তার কোনো কারণ নেই।

জাতীয় মুক্তি, পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা একান্তই চাই। এই মুক্তির জন্যে যে-কোনো প্রকারে জাতীয় শক্তিকে সংহত ও পরিচালিত করা যে একান্ত

প্রয়োজন, একথাও আমরা মানি। কিন্তু একটা কাল্পনিক সংহতি নষ্ট হবে ভেবে আমরা যদি সমাজের চিরবর্ধমান ইকনমিক ফোর্স (অর্থনীতির শক্তি)-কে অবজ্ঞার চোখে দেখি তা হলে কখনো কি স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় শক্তির পরিচালনা সম্ভবপর হবে? জাতীয় আন্দোলনে লিপ্ত সকল শ্রেণীর লোকই চান যে ভারতে বিদেশী শাসনের অবসান হ'ক। কেননা, পর-শাসন তাঁদের সকল উন্নতির পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এ চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বরাজ্য-দল, স্বতন্ত্র-দল, মডারেট-দল প্রভৃতি কত দলই না রয়েছে। এ সকল দলের লোকেরা সকলই শিক্ষিত। কাজেই, আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি যে তারা বোঝেন-শোনেনও বেশ। তা সত্ত্বেও দলাদলি হয় কেন? প্রত্যেক দলের বিভিন্ন বাস্তব স্বার্থই কি দলাদলির প্রকৃত কারণ নয়? আশ্চর্য এই যে, তবুও আমরা চাই সমাজের দু'টো বিশিষ্ট শ্রেণী—শোষণকারী ও শোষিত এক হয়ে কাজ করুক, যদিও এ কাজের দ্বারা কেবলমাত্র শোষণকারীর দলই লাভবান হবে! আমাদের অতিদেশভক্তরা বলেন, "আমাদের এ পুণ্য-পবিত্রতার দেশ। এদেশে তোমরা কিছুতেই শ্রেণীগত স্বার্থের কথা তুলো না। কেননা, আধ্যাত্মিক ভাবে সকল শ্রেণীর সমতা আমরা মেনে থাকি।" একটা খুব বড় বিচার্য ও চিন্তনীয় বিষয়কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা শুধু এ নয়, এ হচ্ছে সমাজের নিম্নস্তরের লোকগুলোর এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু, এতে অবস্থার পরিবর্তন কিছুতেই হবে না। কেউ স্বীকার করুন আর না-ই করুন, বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজে বর্তমান রয়েছে, আর এই বিভিন্ন শ্রেণীর উন্নতি অনুসারেই আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পন্থা নিরূপিত হয়ে থাকে। এ যদি না হ'ত তা হলে আজ কংগ্রেস আন্দোলনের বাহিরে শ্রমিক-আন্দোলনের সৃষ্টি কিছুতেই হ'ত না। বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক-বিদ্রোহ হতে এ আন্দোলনের সত্তা আজ আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছি। ধর্মঘট আর বিদ্রোহের দ্বারা তারা তাদের দাবী-দাওয়া বুঝে নিতে চায়। এর জন্যে কৃষক ও শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তাদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নেয় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের দাবী যতদিন না পূর্ণ হবে, যতদিন বিদেশী শোষণ-শাসনের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আমাদের শ্রমিক ও কৃষকগণই আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম চালাবে। কিন্তু, তা'দিগকে জাগাবার জন্যে, সচেতন করার জন্যে, তাদের সংহত শক্তির পরিচালনার জন্যে, তাদের উপস্থিত শ্রেণীগত স্বার্থটা মেনে

নিতেই হবে। কৃষক ও শ্রমিকের সংগঠন ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সংগঠন। তাদের শ্রেণী-সংগ্রামকে যাঁরা ভুল বুঝেন তাঁরা কিছুই বোঝেন না।

সমাজের অধিকাংশ লোক অল্পাংশ লোকের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হচ্ছে। এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে আমাদের জাতীয় শক্তিসমূহের সংহতির স্বপ্ন কোনো দিনও সফল হবে না। শ্রমিকদের ভিতরে বিদ্রোহ মাথা তুলে উঠেছে। আজকের দিনে বাজে ঐক্যের দোহাই দেওয়া আর চলবে না। শ্রমিকদের জাগরণ অবশ্য অ-শ্রমিক লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখে না, যেহেতু এতে তাদের স্বার্থের হানি যথেষ্ট হবে। এখন তারা পরের পরিশ্রমের কড়ি খুব আমোদ করে উপভোগ করছে, শ্রমিকরা জেগে উঠলে তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

শ্রমিক-আন্দোলন এমন সব লোকের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, যারা স্বার্থের খাতিরে আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চায়। দেশকে যাঁরা সত্য সত্যই স্বাধীন করতে চান, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে তাঁদের সকল শক্তি নিয়োজিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

লাঙল ঃ ১৮ই মার্চ, ১৯২৬

কারাগার সম্বন্ধে দেশের ঔদাসীন্য

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হতে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করে কারাগারসমূহের ভিতরের ব্যাপার অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। আশা করা গিয়েছিল তাঁদের কল্যাণে জেলগুলোর অনেক সংস্কার হবে, কিন্তু দেশের দূরদৃষ্টবশতঃ তার কিছুই হয়নি। রাজনৈতিক কয়েদীর সুখ-সুবিধার বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা কখনো কখনো হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সাধারণ কয়েদীদের সম্বন্ধে দেশ একেবারেই নীরব। সকল রাজনৈতিক কয়েদীর প্রতিও দেশের যে অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হয় একথাও আমরা ঠিক বলতে পারি না। এ-ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি কেবল তেলা মাথার জন্যই তেলের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। মান্দালয় জেলের অনশন-ব্রতের সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের অনশন-ব্রতের তুলনা করে দেখলে পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা অতি অল্প, এত অল্প যে কোনো গণনার মধ্যেই নেওয়া যেতে পারে না। সাধারণ কয়েদীদের নিয়েই জেলের অস্তিত্ব, জেল সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এদেরি কথা বলতে হয়।

১৯১৯ সনের পর হতে জেল কমিটির কল্যাণে জেলসমূহের সামান্য সংস্কার হয়েছে বটে, তবে সে-সংস্কার আজ পর্যন্তও কয়েদীদের মনুষ্যত্ব মেনে নেয়নি। সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। একটিমাত্র জিনিস নিয়েই আজ আমরা শুধু আলোচনা করব। লৌহ জেলসমূহে একটি বিশিষ্ট জিনিস। লৌহ-কপাটের ভিতরে কয়েদীরা বন্ধ হয়ে থাকে। লোহার বেড়ী দরকার হলে তা'দিগকে পরানো হয়, লোহার বাসনে তা'দিগকে খেতে দেওয়া হয়। এমনকি খাদ্যদ্রব্য যে হাঁড়িতে পাকানো হয় তাহাও লোহারি দ্বারা তৈয়ার করা হয়। যত ঘৃণিত কাজ করে কয়েদীরা কারাবরণ করুক না কেন, তারাও যে মানুষ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের মত্যো অধিকারও তাদের নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। লোহার পাত্রে পাকানো খাবার কষ উঠে বিস্বাদ হয়ে যায়। তারপরে, সেই খাবার লোহার থালাতে খেতে যেয়ে

আরো ভয়ানক খাবার হয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কয়েদীদের এ বিশ্রী-খাদ্যও খেতে হয়। কিন্তু, কেন এমন ব্যবহার কয়েদীদের প্রতি করা হয়? জেলের ব্যবহৃত অধিকাংশ জিনিসপত্রই কয়েদীগণ তৈয়ার করে থাকে। ভাল বাসন ভাল হাঁড়ি তারা তৈয়ার করে নিতে পারে। ভাল বলতে আমরা অন্য কোনো ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত পাত্রাদি মনে করেছি। লৌহপাত্রে না পাকিয়ে কলাই-করা তাম্রপাত্রে পাকালে খাবারটা আর বিস্বাদ হয় না। লৌহপাত্রটিও যেমন কয়েদীরাই প্রস্তুত করেছে, তাম্রপাত্রও তেমনি তাদেরই দ্বারা প্রস্তুত হতে পারে। খাওয়ার জন্যে থালাগুলো পিতল কিংবা এলুমিনিয়ামের দ্বারা প্রস্তুত কয়েদীরাই করতে পারে। এমন অবস্থাতেও অবৈজ্ঞানিক লৌহপাত্রাদি খাবার জিনিসের জন্য ব্যবহার করতে দিয়ে দেশের হাজার হাজার লোকের স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করা হচ্ছে, অথচ দেশ সে-সম্বন্ধে একটি কথাও কইছে না। এদেশের জেলসমূহে ইউরোপীয় কয়েদীদিগকে ইনামেল-করা বাসন ও পেয়ালা দেওয়া হয়, আর তাদের খাদ্য পাকও হয়ে থাকে কলাই-করা তামার দেগে। জেলের বাহিরে ইউরোপীয় কয়েদীরা যেমন লোহার বাসনে খেতে অভ্যস্ত নয়, তেমনি ভারতীয় কয়েদীরাও নয়, তা যতই দরিদ্র তারা হ'ক না কেন। এ সত্ত্বেও যে ভারতীয় কয়েদীদিগকে লোহার বাসন-কোসন দেওয়া হয় তার একমাত্র কারণ তাদের মানবতার অবমাননা করা। প্রথম জেলে গিয়েই এ লোহার বাসনাদির কল্যাণে প্রায় শতকরা আশিজন কয়েদী পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথচ জেলগুলোর ডাক্তার সুপারিন্-টেন্ডেন্টের তাতে মন এতটুকুও বিচলিত হয় না। এই ডাক্তাররাও তাঁদের চিকিৎসকের ধর্ম বর্জিত হয়ে জেলে ঢোকেন। দেখে শুনে যে অবস্থায় যে ব্যবস্থা তাঁরা কোনো কয়েদীর জন্যে করতে পারেন ঠিক সে অবস্থায় সে ব্যবস্থা তাঁরা কোনো বাইরের লোকের জন্যে করতে পারেন না।

নানা প্রকারের লোক নানা কারণে জেলে গিয়ে থাকে। অনেকে অপরাধ করেও যায়, আবার অনেক নিরপরাধকেও পাকেচক্রে পড়ে জেলে যেতে হচ্ছে। অপরাধ রাতদিন দেশে কত লোকই না করছে, সকলে কিন্তু ধরা পড়ে না। ধরা যারা পড়েনি তারা আর দশজনের সঙ্গে দিব্য ভাল মানুষের মতো চলে যাচ্ছে। তাদেরকে কোনো কথা বলার শক্তি কাহারো নেই। অথচ যারা জেলে গিয়েছে তাদেরই প্রতি যত প্রকারের অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এমনটি আর হতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমি অপরাধ করেছি বলে তুমি আমাকে আমার প্রিয়তম

বস্তু স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছ, কিন্তু আমার কাছ থেকে আমার মনুষ্যত্ব কেড়ে নেবার কি অধিকার রয়েছে তোমার ?

জেলে যারা যায় তারা মানুষ, আমাদের দেশের লোক, পরম আত্মীয়। তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এতগুলো লোককে এই যে পশুত্বে অবনমিত করা হচ্ছে,—এতে দেশের খুব বেশী ক্ষতি হচ্ছে। এতদিন আমরা জেলের দিকে তাকিয়ে দেখিনি, না দেখে পাপ করেছি। সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনি আমাদের করা চাই।

লাঙল : ২৫শে মার্চ, ১৯২৬
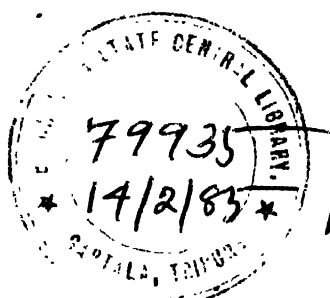
স্বরাজের স্বরূপ

স্বরাজ আমরা সকলেই পেতে চাই, কিন্তু স্বরাজ বস্তুটা কি? কতকাল থেকে স্বরাজের আন্দোলন এদেশে চলছে, অথচ এর সংজ্ঞাটা আজো স্থির হ'ল না। 'স্বরাজের স্বরূপ কি হবে' এ প্রশ্নটা বারে বারে জনসাধারণের পক্ষ থেকে উঠেছে, আর বারে বারেই ওকালতি বুদ্ধির অর্থহীন কূটতর্কের ভিতরে হারিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা প্রদান করছেন না। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত স্বরাজ্য-দলও তাঁদের আদর্শ সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। সম্প্রতি কিছুকাল থেকে বাংলা দেশে 'কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ' নামক একটি নূতন সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। এ সঙ্ঘের অধিকাংশ সদস্যই বিপ্লববাদী বলে যাঁরা আখ্যাত হয়েছেন তাঁদেরই লোক—বয়সেও তাঁদের অধিকাংশই নবীন। আশ্চর্য এই যে তাঁরাও বলছেন না কি তাঁরা পেতে চান। বিরাট, বিশাল ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জাকর বিষয় আর কি হতে পারে?

একটুকু চিন্তা করে দেখলেই আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মানসিক দৌর্বল্য অনেক বেশী, আর অনেক জায়গায় ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধেও তাঁরা খুব সচেতন। এজন্যেই স্বরাজের সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁরা বরাবর গোঁজামিল দেবার প্রচেষ্টা করেছেন। এ-সব সত্ত্বেও কংগ্রেসের বড় বড় নেতার মনোভাব থেকে স্বরাজ সম্বন্ধে কংগ্রেসের আদর্শ কি তা অনুমান করে নিলে বোধ হয় কিছুই অন্যায় করা হবে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পেলে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক নামক পতাকাটি তখনি ভারতের ভাগ্যাকাশে পতপত করে উড়িয়ে দেবেন। কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের বেশী কিছু পেতে চাননি। স্বর্গীয় বাল গঙ্গাধর তিলকের বক্তৃতাদি পড়ে জানতে পারা যায় যে তাঁরও আশা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পর্যন্তই ছিল। কিন্তু, তাই কি আমাদের চরম আদর্শ হওয়া উচিত? তারপরে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি সম্ভবপর? গ্রেট বৃটেনের সহিত আমরা চিরকাল বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি, কিন্তু,

তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে চিরকালটি তার বশ্যতা কিসের জন্যে আমরা মেনে থাকতে যাব? মানুষ হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবার অধিকার যদি বৃটেনের থাকে তা হলে আমাদেরও তা আছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বৃটেনের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, ভারতের অবস্থা আর ঐ সকল দেশের অবস্থা এক নয়। গ্রেট বৃটেন হতে লোক যেয়ে কানাডা আর অস্ট্রেলিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। এ সকল দেশের লোকদের সাথে গ্রেট বৃটেনের লোকদের একটা রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে। কাজেই কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে আপন দেশের কাজ চালানোর অধিকার পাওয়াকে অগৌরবের বিষয় মনে নাও করতে পারেন। পিতৃভূমির প্রতি একটা প্রাণের টান থাকাও তাঁদের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, ভারতের অবস্থা তো তা নয়। ভারত গ্রেট বৃটেনের উপনিবেশ নয়,—অধীন দেশ। ভারতের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের এতটুকুও রক্তের যোগ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকুও অধীনতার সূত্র ভারতের গ্রেট বৃটেনের সাথে জড়িত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যে-চোখে সে কানাডা আর অস্ট্রেলিয়াকে দেখতে পাচ্ছে, ঠিক সেই চোখে কিছুতেই সে ভারতবর্ষকে দেখতে পারবে না। এক কথায়, ভারতবর্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণবিমুক্ত হয়ে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সমানে সমানে দাঁড়াতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত না পারবে সে গ্রেট বৃটেনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে, না পারবে তার সাথে কোনোরূপ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে। আমাদিগকে হয়তো পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, নতুবা চিরকাল বৃটেনের অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকতে হবে। এ দু'এর কোনো মধ্যপথ নেই। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে বাস্তব পদার্থ হলেও ভারতের পক্ষে তা একেবারেই অশ্বডিম্ব বিশেষ।

আমাদের আদর্শ হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীনতা লাভ করা —ভিতরে নয়। আর এই স্বাধীন ভারতের কার্য পরিচালিত হবে সার্বজনীন ভোটের অধিকারের দ্বারা। এ আদর্শ নিয়েই আমাদিগকে কাজে অগ্রসর হতে হবে।

গণবাণী: ১৯শে আগস্ট, ১৯২৬

শ্রমিক সম্প্রদায়

পৃথিবীর যে সকল দেশে কল-কারখানায় মূলধন খাটিয়ে জিনিস আদি উৎপন্ন হয়ে থাকে সে-সকল দেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম মূলধনের মালিক অর্থাৎ ধনিকগণ। উৎপাদনের যাবতীয় উপায়, যথা যন্ত্রপাতি, মেশিন ও ভূমি ইত্যাদি এই ধনিকদেরই অধিকারে আছে, অথচ উৎপাদনের কাজে তারা কোনো অংশই গ্রহণ করে না। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকগণের, অর্থাৎ যারা আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের। এদের সম্পত্তি হচ্ছে এদের শ্রমের শক্তি। এ শ্রমশক্তি বিক্রয় ক্রমেই এরা জীবন ধারণ করে থাকে, আর জগতের সমস্ত ধনই উৎপন্ন হয় এদেরই এ শ্রমশক্তির দ্বারা।

ধনের পরিমাণ বাড়াবার জন্যে ধনিকদের এমন একটা সুবৃহৎ দলের সর্বদাই প্রয়োজন হয়, যে দল আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত থাকবে। এমন এক সময় ছিল যখন বলপূর্বক এ শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করতে হ'ত, কিন্তু এখন আর তা হয় না। মেশিনের সাহায্যে অত্যধিক মাত্রায় উৎপাদনের সুবিধে হয় বলে ছোট ছোট উৎপাদকগণের কাজ অচল হয়ে যায়। মোট মূলধনের দ্বারা ছোট ব্যবসায়িগণকেও ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হতে হয়। ফলে, এ সমস্ত লোকের দ্বারা সেই আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত সর্বহারাদেরই দল পরিপুষ্ট হয়।

বড় মূলধনের দ্বারা উৎপাদনের প্রসার যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সর্বহারাদেরও দল পুরু হতে থাকে। বড় কারখানা হলে ছোট কারখানা কিছুতেই আর টিকতে পারে না। কাজেই ছোট ছোট কারখানার মালিকেরা নিঃস্ব হয়ে বড় কারখানার মজুর হয়ে পড়ে। সত্য বটে, এ মজুরেরা কারখানা হতে একটা বেতন পায়, কিন্তু একথাও সত্য যে যতটা তারা উৎপন্ন করে থাকে ততটা বেতন তারা পায় না। জগতের সকল দেশেই এ আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত দলই এখন সর্বাপেক্ষা বড় সম্প্রদায়। শৈল্পিক অনুষ্ঠানেই হ'ক, আর কৃষি অনুষ্ঠানেই হ'ক মূলধনের মালিক সর্বহারা দলের কাছ থেকেই সে-পণ্যদ্রব্যটিকেই ক্রয় করে থাকে যা তার বিক্রয় করবার আছে। এ বস্তুটি আর কিছুই নয়—

তাদের শ্রমশক্তি। একথা বলাই বাহুল্য যে, ধনিক এ শ্রমশক্তি কিনে থাকে লাভেরই জন্যে। শ্রমিক যতই বেশী উৎপন্ন করবে তার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ততই বেশী হবে। ধনিক যত বেতন শ্রমিককে দিয়ে থাকে, ঠিক যদি সে-পরিমাণ কাজই মাত্র সে তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়, তা হলে কিছুমাত্র লাভ সে করতে পারে না। কিন্তু, ধনিক যতই আপনাকে পরোপকারী ও মানবতার দুঃখ-কষ্টের বিচারক বলে ঘোষণা করুন না কেন, তার মূলধন সর্বদাই চায় লাভ,—লাভ ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই। শ্রমিকগণ যে বেতন পেয়ে থাকে, তার জন্যে যতক্ষণ সময় কাজ করা দরকার ততক্ষণেরও উপরে যত বেশী তাদের খাটানো যাবে ততই তাদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাবে। ধনিক শ্রমিকদের বেতন বাবদে যে মূলধনের লাগান করে থাকে তার উপরে যতই বেশী অতিরিক্ত মূল্য সে পাবে ততই বেশী শ্রমিকগণ শোষিত হবে। এই যে শোষণ-বৃত্তি, এর শেষ কেবলমাত্র দুটো জায়গাতে আছে—প্রথমতঃ, যে জায়গায় শ্রমিকগণের কর্মশক্তির অবসান হবে, দ্বিতীয়তঃ, যেখানে শ্রমিকগণ এ শোষণের বিরুদ্ধে মাথা ওঠাতে সমর্থ হবে।

পূর্বকালে মজুর নিয়োগ করলে মজুর আর নিয়োগকারী একই সঙ্গে কাজ করত। এখনো ভারতের নানা জায়গায় সে-প্রথা আছে। কিন্তু মূলধন খাটিয়ে যেখানে উৎপাদন করা হয় সেখানে শ্রমিক আর ধনিক একসঙ্গে কাজ করে না। এখানে ধনিক হয়ে যায় সওদাগর। ধনিককে যদি কোনো কাজ করতে দেখা যায় তা হলে সে-কাজ সে সওদাগর হিসাবেই করে—বাজারের অনুসন্ধানে। সে চায় যথাসম্ভব সস্তা দামে শ্রমশক্তি ও কাঁচা মাল খরিদ করতে এবং যথাসম্ভব বেশী মূল্যে পাকা মাল বাজারে বিক্রয় করতে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকগণকে বেশী খাটানোই হচ্ছে তার কাজ, কেননা, যত বেশী কাজ সে শ্রমিকগণের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে, ততই তার মূল্য বেড়ে যাবে। শ্রমিকগণের সঙ্গে সে তাদের সহকর্মী নয়—সে হচ্ছে তাদের চালক ও শোষক।

শ্রমিকগণ যত বেশী সময় কাজ করবে ধনিকের অবস্থা ততই ভাল হবে। কাজের সময় বাড়ালে ধনিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, উৎপাদনপ্রণালীর মধ্যে যদি জীবন-নাশের সম্ভাবনা থাকে তবে তার জীবন তাতে কখনো নাশ হয় না। আর যত শাসক শ্রেণী আছে তার মধ্যে ধনিক তার খাটিয়েদের জীবন সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক বেপরোয়া। তারা মরুক-বাঁচুক তাতে তার কিছু যায় আসে না, সে চায় বেশী কাজ।

শ্রমিকগণের বেতন এত বেশী হতে পারে না যাতে ধনিকগণের ব্যবসায় চালানো বা জীবনধারণ করা অসম্ভব হতে পারে। শ্রমিকরা যা উৎপাদন করবে তার মূল্য যদি তাদেরকে দিতে হয় তাহলে ধনিকগণের পক্ষে ব্যবসায় তুলে দেওয়াই শ্রেয়স্কর হবে। ধনিকগণের জন্যে অতিরিক্ত মূল্যের সংস্থান করার জন্যে শ্রমিকগণকে কম বেতন নিতেই হবে। কেননা, এ অতিরিক্ত মূল্য পায় বলেই ধনিকগণ বেশী শ্রমশক্তির নিয়োগ করে থাকে। কাজেই ধনিকপ্রথা যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন শ্রমিকদের যে শোষণ করা হয় তা কিছুতেই নিবারিত হতে পারে না।

ধনিক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে অতিরিক্ত মূল্য পেয়ে থাকে তার পরিমাণ আমরা সাধারণতঃ যা ধারণা করে থাকি তার চেয়ে অনেক বেশী। বাড়ি ভাড়া, অন্যান্য ট্যাক্স, সুদ, উচ্চ কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি সমস্তই অতিরিক্ত মূল্য হতে দিতে হয়। ধনিকগণের অধীনে শ্রমিকগণের খাটানোর যে প্রথা আছে তদ্দ্বারা শ্রমিকগণ শোষিত হবেই হবে। এ প্রথা থাকবে অথচ শোষণ থাকবে না, এরূপটা কিছুতেই হতে পাবে না। শ্রমশক্তি যে শোষিত, লুণ্ঠিত হচ্ছে, তার নিবারণের একমাত্র উপায় বর্তমানের ধনিকপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করা।

বর্তমান প্রথায় যতটা উচ্চ বেতন শ্রমিকগণকে দেওয়া সম্ভব ততটাও দেওয়া হয় না। তাঁদিগকে যা দেওয়া হয় তাতে মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্যরূপে যা আবশ্যক তা-ও হয়ে উঠে না।

এক সময়ে কারখানায় যেমন সুদক্ষ কারিগরের আবশ্যক হ'ত, তেমনি সে-কারিগরের গায়ে জোর থাকারও প্রয়োজন ছিল। অনেক দিন শিক্ষানবিসী করে তবে শ্রমিকেরা কাজ শিখতে পারত আর তাতে খরচও হ'ত বিস্তর। এখন মেশিনের উদ্ভব হয়ে সে-সব ব্যবস্থার উলট-পালট করে দিয়েছে। শ্রমিকের গায়ে তেমন জোর না থাকলেও চলে, তেমন সুদক্ষও তাকে আর হতে হয় না। এমন কি স্ত্রীলোক ও বালকদের দিয়েও কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মেশিনের সাহায্য পেয়ে ধনিকগণ নারী ও বালকগণকেও অতি ঘৃণিতরূপে শোষণ করছে। স্ত্রীলোকগণ কারখানায় কাজ করে তাদের গৃহকর্ম হতে অব্যাহতি পায় না। কাজেই, তাঁদিগকে ডবল পরিশ্রম করতে হয়।

গণবাণী : ২৬শে আগস্ট, ১৯২৬

নির্বাচন

ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাসমূহের নব নির্বাচন আর কয়েক মাস পরেই আরম্ভ হবে। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাসের চেষ্টা ও প্রেরণায় স্বরাজ্য-দল গঠিত হবার পর হতে নির্বাচনপ্রথাটা একটা অভিনবরূপে এদেশে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নির্বাচনব্যাপারে এর পূর্বে এত বেশী আগ্রহ আর কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলের ভিতরে প্রবেশ করে কাউন্সিলকে ভেঙে দেওয়া এবং তার দ্বারা গবর্নমেন্টের কাজ-কর্মকে অচল করে তোলা। স্বরাজ্য-দলের এই যে ভাঙার, বাধা দেওয়ার নীতি,—এর সহিত আমাদের কোনো বিরোধ নেই, যে গবর্নমেন্ট গণমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, সে গবর্নমেন্টকে চারদিক থেকে প্রতিহত করার সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তবে এইটে ভাল করে দেখতে হবে যে, যেখানে কিয়ন্জন আর বহুজনের স্বার্থে সংঘাত বাধে, ভাঙার নীতি অবলম্বন করে যাঁরা কাউন্সিলে যান সেইখানে তাঁদের মতিগতি কোন্ দিকে যায়। এই কষ্টিপাথরেই পরীক্ষা করে কাউন্সিল-যাত্রীদিগকে সর্ব-সাধারণের ভোট দেওয়া উচিত। কাউন্সিলের নির্বাচনের সময় যখন হয়ে আসে তখন পদপ্রার্থীরা অনেক বড় বড় কথা বলে থাকেন। এই বলার উপরে নির্ভর করে, কেবলমাত্র বক্তৃতার মোহে আবিষ্ট হয়ে, কেউ যেন কাউকে ভোট না দিয়ে বসেন।

মিনিস্টারের বেতন বন্ধ করে দেওয়া কাউন্সিলেয় একমাত্র কাজ নয়। আমাদিগকে সর্বপ্রথমে দেখতে হবে যিনি কাউন্সিলে যাচ্ছেন তিনি কোনো প্রকার স্বার্থের বশীভূত হয়ে যাচ্ছেন কিনা। তারপরে এও দেখতে হবে, সর্বসাধারণের স্বার্থের সহিত সেই মেম্বরের বা তাঁর সমশ্রেণীর লোকদের স্বার্থের যেখানে বিরোধ বাধে সেখানে তিনি কোন্ দিকে ঢলে পড়বেন। জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর লোকদের স্বতন্ত্র সভ্য নির্বাচন করার অধিকার আছে। তাঁরা যাঁকে ইচ্ছে নির্বাচন করুন, সে-সম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই বলতে চাইনে। কিন্তু, সর্বসাধারণের নাম দিয়ে যাঁরা যেতে চান তাঁদের সম্বন্ধে আমরা নীরব থাকতে পারব না। মিনিস্টারের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার বা কমিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধে প্রত্যেক মেম্বরই সায় দিতে পারেন;

কারণ সেখানে লাভ-লোকসান যা হয় তা ব্যক্তিগত। এমন একটা বিষয় যদি কাউন্সিলে আসে যার দ্বারা কৃষকের হিতের জন্যে জমিদারের স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে, শ্রমিকের মঙ্গলের জন্যে ধনিকের ক্ষতি হতে পারে, কিংবা গরিব কেরানীদের বেতন বাড়াবার জন্যে বড় বড় কর্মচারীদের বেতন কমে যেতে পারে—সে-সময় কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত বা বাইরের সদস্যগণ তাতে সায় দিতে পারেন এমন মনের বল তাঁদের আছে কিনা সেটাই দেখে নিতে হবে।

সম্প্রতি কংগ্রেসের মনোনীত নির্বাচন-প্রার্থীদের নামের তালিকা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকায় অনেক জমিদারের নামও রয়েছে। সর্বসাধারণের স্বার্থটা মেনে নিতে পারেন, জমিদারের মধ্যে এমন মনোভাব থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কোনো জমিদার যে কখনো সর্বসাধারণের কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন না এমন কথা আমরা কিছুতেই বলতে পারব না। এমন জমিদার অনেকেই হয়তো আছেন যিনি নিজের অ-শ্রমলব্ধ জমিদারিকে বৈধ সম্পত্তি বলে মনে করেন না। কিন্তু সে-শ্রেণীর জমিদারের সম্বন্ধে আজ আমরা কোনো কথা বলতে যাচ্ছিনে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ীভূত হচ্ছেন সেই সকল জমিদার, যাঁরা কাউন্সিলে যাবার জন্যে কংগ্রেসের দ্বারা মনোনীত হয়েছেন। তাঁরা সর্বসাধারণের সুবিধার জন্যে তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন কি? যাঁরা সব কিছু উৎপন্ন করেও সব কিছুতেই চিরবঞ্চিত, তাঁদের জন্য কংগ্রেস কি করতে চান?

জমির মালিক জমিদার নন, একথা কংগ্রেস মানেন কিনা, সাধারণের জেনে নেওয়া উচিত। জমিদাররা পরান্নভোজী সম্প্রদায়। জমির সাথে তাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। জঙ্গল কেটে, মাটি কেটে, জমিদার কোনোদিন জমি আবাদ করেননি, ফসল তাতে তাঁরা কখনও উৎপন্ন করেননি, এমন কি অধিকাংশ স্থানে জমীন তাঁরা কখনও চোখে পর্যন্ত দেখেননি,—তবুও তাঁরা জমির মালিক! কৃষকের মুখের গ্রাস তাঁরা কেড়ে নিতে পারেন, কৃষকের উপরে যদৃচ্ছা অত্যাচার তাঁরা করতে পারেন—কেউ কিছু তাতে বলতে পারবেন না! এঁরা সমাজের পরগাছা-স্বরূপ। এই পরগাছার আওতা হতে সমাজকে মুক্ত করার সাহস, অন্ততঃ তার জন্যে চেষ্টা করার সাহস সদস্যপদ-প্রার্থীদের আছে কি?

সুদখোর মহাজন, দোকানদার প্রভৃতি সর্বসাধারণের রক্ত দিনের-পর-দিন শোষণ করছে। এ সকল অন্যায় স্থায়ী ভাবে নিবারণ করার জন্যে কি উপায় সদস্যপদ-প্রার্থীরা অবলম্বন করতে চান?

কারখানার মালিকগণ কারখানার মজুরদিগকে লুণ্ঠন করে করে দুর্দশার চরম পথে টেনে এনেছে। তাদের পেটে অন্ন নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, বাসের জন্যে ঘর নেই। মজুরদের পরিশ্রমের অংশ লুণ্ঠন করে করে কারখানার মালিকরা যতই স্থূল হয়ে যাচ্ছে ততই শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়ছে। এ দুর্দশার নিরাকরণের জন্যে কংগ্রেসের কার্য-তালিকায় কোনো উপায় স্থান পেয়েছে কি ?

তারপরে মাথা খাটিয়ে যাঁরা পরিশ্রম করেন সেই কেরানীদের কথা। শীত নেই, বর্ষা নেই, গ্রীষ্ম নেই, সকল ঋতুতে সমান ভাবে অবিরাম যাঁরা খাটছেন, তাঁদের সব কিছুরই অভাব। তাঁদের খাওয়া-পরার সংস্থান হয় না, কিছুই হয় না। ওদিকে উচ্চ কর্মচারীদের বেতন কেবলই বাড়ছে। একই অফিসে কাজ করে কয়েকজন দিন কাটাচ্ছে বিলাস বিভবে, আর বহুজন দিন কাটাচ্ছে অনশনে, অর্ধাশনে। উচ্চ কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করে নিম্নতম কর্মচারীদের জীবনধারণের সুব্যবস্থা করার বিষয়ে কিছু কি সদস্যপদ-প্রার্থীরা চিন্তা করছেন ?

জমিদারের স্বার্থের বিরুদ্ধে, ধনিকের লোভ-লোলুপতার প্রতিকূলে যাঁরা দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াতে না পারেন, সর্বসাধারণের প্রতিনিধি তাঁরা কিছুতেই হতে পারেন না। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার দ্বারা যাঁরা দেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে বসেছেন, তাঁরাও সর্বসাধারণের তরফ হতে কাউন্সিলে যাবার যোগ্য নন। কেননা, এ সকল লোক কাউন্সিলে গেলে দেশের সর্বসাধারণের কোনো উপকার তো তাঁরা করতেই পারবেন না, পরন্তু অপকার তাঁদের দ্বারা যথেষ্টই হবে। গত তিন বৎসরের ব্যবস্থাপক-সভার কার্য-প্রণালী অধ্যয়ন করলে বহুলোককে আমরা অনায়াসে চিনে নিতে পারব। একটুকু চেষ্টা করলে নূতন যাঁরা কাউন্সিলে যেতে চাইছেন তাঁদেরকেও চেনা কিছুমাত্র কষ্টকর হবে না। কোনো প্রার্থী দলবিশেষের দ্বারা মনোনীত হলেই যে তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। যে সকল শ্রেণীর লোকেরা দেশের সর্বসাধারণের রক্ত শোষণ করে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে সেই বিশিষ্ট দলের কোনো প্রকারের বাধ্যবাধকতা আছে কিনা সেটা খুব ভাল করে দেখে নিতে হবে। দলাদলি করতে হলেই টাকাকড়ির খুব বেশী দরকার হয়। এ টাকাকড়ির অভাবে নিষ্পেষিত হয়ে অনেক সময়ে দেশে যাঁদের বিন্যস্ত স্বার্থ রয়েছে তাঁদের নিকটে হাত পাততে হয়, আর হাত পাতলে টাকাও পাওয়া যায়। কিন্তু, এই শোষক শ্রেণীর লোকেরা টাকা কি শুধু শুধু দিয়ে থাকেন ? কখনো নয়। দেশের সর্বসাধারণ তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন

হলে শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। সেই জন্যে তাঁরা আগে থেকে নানাদিক হতে নানা ভাবে সর্বসাধারণের চৈতন্য লাভের পথে বাধা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কোনো উন্নত রাষ্ট্রীয় দলের হাতে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে যদি টাকাকড়ি এ'রা দেন তা হলে এ কারণেই দেন, অন্য কোনো কারণে নয়।

অনেক রাষ্ট্রীয় দলের কার্য-তালিকায় আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা শ্রমিক ও কৃষককে সচেতন করবার জন্যই তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করবেন। কিন্তু, কাজের বেলা আমরা তার কিছুই দেখতে পাইনে। কেন এমন হয়? শোষকদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করার ফলে এ দুর্দশা হয়ে থাকে, এমন সন্দেহ যদি আমরা করি তা হলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হবে না আমাদের তরফ থেকে। জমিদাররা যদি কোনো রাষ্ট্রীয় দলের হাতে কিছু টাকাকড়ি দেন, তা হলে নিশ্চয়ই এ শর্তের উপরে দেন যে তাঁদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সে-দল কোনো কাজ করতে পারবেন না। ধনিকেরা টাকা দিলেও তাঁদেরও সঙ্গে ঠিক এ রকমই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে হয়। এরূপ বাঁধাবাঁধির চাপে আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতাদের কত যে অধঃপতন হয়েছে, গত ক'বছরের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমরা তা খুব ভালোরূপে উপলব্ধি করতে পারব।

নেতারা বলেন, "দেশের কাজ তো করতেই হবে, আর কাজ করতে হলেই টাকার দরকার। যদি ধনিক-বণিকের দ্বারস্থ না হই, তা হলে টাকা আসবে কোত্থেকে?" আমরা জিজ্ঞাসা করছি, "এ ধনিক-বণিকরাই বা টাকা পান কোত্থেকে? তাঁরা পরান্নভোজী জীব, উৎপন্ন না করেও তাঁরা ধনের মালিক হন! এ ধন কি দেশের সর্বসাধারণের কাছ থেকে আসছে না? সর্বসাধারণের দুর্দশার হেতু যাঁরা তাঁদের ধনাগম যদি সর্বসাধারণের কাছ থেকে হয়, তা হলে তাদের মঙ্গলের হেতু যাঁরা হবেন তাঁদের খরচ কি সর্বসাধারণ জোগাতে পারে না?"

মোটকথা, নেতা-সেবক তো সবাই সাজেন, কিন্তু, কষ্ট না করে, সর্বসাধারণের নিকটে না যেয়ে, তাঁরা সবাই সস্তায় বাজি জিতে নিতে চান। ফলে বাজি জেতা তো হয়-ই না, সর্বসাধারণের স্বার্থের হানিই শুধু হয় তাদের দ্বারা।

এজন্য এবারকার নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

গণবাণী: ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

ভবিষ্য ভারত

আমরা এর আগে এক প্রবন্ধে বলেছি যে আমরা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে নয়, বাহিরে। আজ সে কথাটাকে আরো খানিকটা পরিস্ফুট করে তুলতে চেষ্টা করব। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে আসতে পারলেই যে স্বাধীনতা লাভ আমাদের হয়ে যাবে তা নয়। তখনো যদি দেশের শাসনকার্য দেশের কিয়ৎজনের ইচ্ছানুযায়ী নির্বাহ হয় তা হলে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারব না যে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ দেশে হয়েছে। সে-অবস্থায় বিদেশী কিয়ৎজন-তন্ত্রের পরিবর্তে স্বদেশী কিয়ৎজন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে মাত্র, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাজেই স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে ভিন্ন ভিন্ন স্টেটে বিভক্ত করে সে-সকল স্টেটকে সমসূত্রে আবদ্ধ রাখতে হবে। অর্থাৎ এই স্টেটগুলো আপন আপন সরকারের কাজ স্বাধীন ভাবে নির্বাহ করলেও তাদেরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে একে অন্যকে সাহায্য করার জন্যে। ইংরাজীতে যাকে বলে Federated Democratic Republic. ঠিক তা-ই হবে আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ।

সর্বজনীন ভোটাধিকার—

গণতন্ত্র গণমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, একথা বলাই বাহুল্য। বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটাধিকার থাকতেই হবে এবং সেই ভোট নিয়ে সকল কার্যের পরিচালনা করা হবে।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ—

বর্তমান সময়ে দেশে নানা প্রকারের জমিদারী প্রথা বিদ্যমান রয়েছে। এ জমিদারী প্রথার ইতিহাস নিয়ে আমরা আলোচনা এখানে করব না। আমাদের একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে এই যে সমাজের হিতের জন্যে এ প্রথা

থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। স্টেট (সরকার) ও কৃষকগণের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীরা কেন থাকবেন? এখনো ভারতবর্ষে গভর্নমেণ্টের খাস-মহাল আছে। এই খাস-মহালের ব্যাপারে কৃষকের সহিত গভর্নমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে, এবং রয়েছে বলে কাজের অসুবিধা এতটুকুও হয়নি। সুতরাং বিনা মধ্যস্বত্বভোগীতেও যখন কাজ চলতে পারে তখন মধ্যস্বত্ব-গুলো থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কৃষক ফসল উৎপাদন করবে এবং সরকার তার অংশ নেবে দেশের নানাবিধ কাজের জন্যে। কিন্তু, কৃষকের শ্রমের ধনে মধ্যস্বত্ববান লোকেরা কেন যে ভাগ বসাবেন এবং সে-ভাগ বসানোটা যে কি প্রকারের সুবিচার, তা আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে। কথায় বলে "যে এল চ'ষে, সে রইল ব'সে"। আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই। কৃষকেরা তো খেটে খেটে মরছে আর মধ্যস্বত্ববান প্রভুরা তার অংশ নিচ্ছেন কোনও পরিশ্রম না করে। সমাজে পরাশ্রিত ও পর-রক্তপিপাসু লোক যত থাকবে ততই তাতে বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার বাড়তে থাকবে এবং দেশের সর্বসাধারণের অবস্থা ততই বেশী শোচনীয় হয়ে উঠবে।

মাটির বুকে যে ফসল উৎপন্ন হয় সে ফসল খেয়ে সকল মানুষ বাঁচে, সকল প্রাণী বাঁচে। এ মাটি কিছুতেই কেবলমাত্র সমাজের কতিপয় লোকের সম্পত্তি হয়ে থাকতে পারে না। যে মাটির ফসলে দেশের প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন আছে, সে মাটি দেশের প্রত্যেক লোকেরই সম্পত্তি হবে। অর্থাৎ ভূমিকে দেশের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে, এখনকার মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যে কৃষক এ ভূমি থেকে ফসল উৎপাদন করবে একমাত্র তারি সাথে থাকবে ভূমির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

শ্রমিকগণের বেতনের হার ও কাজের সময়

কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদের বেতনের নিম্নতম হার বেঁধে দিতে হবে। এমন একটা হার নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে তারা সত্যকার মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারবে। বর্তমান সময়ে শ্রমিকগণ যে পরিশ্রম ধনীর নিকটে বিক্রী করে তার অতি সামান্য মূল্যমাত্র তারা পায়। তাদের শ্রমের অতিরিক্ত মূল্যটা যায় ধনীর পকেটে। এই অতিরিক্ত মূল্য পেয়ে ধনিক বিলাসে গা ঢেলে দেয়, আর শ্রমিক দু'বেলা দু'মুঠো পেট পুরে খেতেও পায় না। ভারতবর্ষের শ্রমিকের ন্যায়

দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাদের জীবনযাত্রা দেখে বিশ্বাসই করা দায় হয়ে পড়ে তারা মানুষ না আর কিছু। কিন্তু, এ প্রবঞ্চনার অবসান করতেই হবে। তারি জন্যে বেতনের একটা নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তার কম বেতন দিয়ে কেউ কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কাজের সময় শ্রমিকরা আট ঘণ্টা করতে চাইছে। এই আট ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করাটা শ্রমিকদের একটা আন্তর্জাতিক দাবী হয়ে পড়েছে। কিন্তু, আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের ন্যায় গরম দেশে কাজের সময় আট ঘণ্টারও কম নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, অন্ততঃ আট ঘণ্টার বেশী তো কোনোক্রমেই নয়। মানুষের গড়া হাতে কলেরও যখন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় তখন প্রাণবন্ত মানুষেরও জীবনে বিশ্রাম করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু, বর্তমান সময়ে মানুষকে কলেরই মতো খাটানো হচ্ছে। কেননা, শ্রমের অতিরিক্ত মূল্য যতই পকেটস্থ করা যায় ততই ধনিকের লাভ।

সামাজিক কুপ্রথা—

ভারতবর্ষ সামাজিক গ্লানি ও কুপ্রথার জন্যে সুবিখ্যাত হয়ে পড়েছে। কুসংস্কারের জন্যে, কুপ্রথার জন্যে এমন অন্ধ-মমত্ববোধ দুনিয়ার আর কোনো দেশের লোকের আছে কিনা সন্দেহ। সংস্কার ও প্রথার দাসত্বের মতো এমন ঘৃণিত দাসত্ব আর কিছুরই হতে পারে না। দেশ যদি স্বাধীন হয় এবং তখনো দেশে কুপ্রথা ও অন্ধ-সংস্কার বিদ্যমান থাকে তা হলে সে-স্বাধীনতা আমরা কিছুতেই উপভোগ করতে পারব না। এ সমস্ত গ্লানির আওতায় থেকে মন কখনো কোনো ভাল জিনিস, বড় জিনিস গ্রহণ করতে পারবে না। তাই সামাজিক গ্লানিগুলো দূর করতে হবে, এবং আইন করেই করতে হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—

অন্যান্য সভ্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা, ভারতবাসীরা কোনো শিক্ষা পাইনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের জনসাধারণের অক্ষর-জ্ঞান পর্যন্ত নেই। এত পিষ্ট, দলিত ও শোষিত হয়েও আমাদের কৃষক ও শ্রমিকেরা যে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে এতটুকুও সচেতন হচ্ছে না তার একমাত্র কারণ শিক্ষাহীনতা। বর্তমান সময়ে যে গবর্নমেণ্টের অধীনে আমরা

বাস করছি সে গবর্নমেণ্ট আমাদের শিক্ষার জন্যে কিছুই করতে পারেনি। প্রায় পৌনে দু'শ বছরের ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষে সাক্ষর লোকের সংখ্যা শতকরা সাত জনের উপরে উঠেনি। জাপানে সাক্ষর লোকের সংখ্যা শতকরা আটানব্বুই জন। ইউরোপের দেশসমূহেও কোথাও শিক্ষিতের সংখ্যা এর চেয়ে বেশী, আর কোথাও বা সামান্য কম। শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হলে এবং স্টেট শিক্ষার সমূহ ভার গ্রহণ না করলে কখনো দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হতে পারে না। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং তার সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে সরকারকে।

প্রেস ও বক্তৃতার স্বাধীনতা—

মানুষের মন বড় করার জন্যে, ভাব-বিনিময়ের জন্যে, চিন্তাধারার স্ফুরণের জন্যে, প্রেস ও কথার স্বাধীনতা থাকা একান্তই আবশ্যক। কোনো জাতির চিন্তাকে গলা টিপে মেরে ফেললে সে-জাতি কখনো জগতের কোনো সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের স্বাধীনতার আদর্শের সহিত প্রেসের স্বাধীনতা আর কথার স্বাধীনতা ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত থাকা উচিত।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার—

নারী আর পুরুষকে নিয়ে সমাজদেহ গঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষে কিন্তু সকল কাজে আমরা নারীকে বাদ দিয়ে চলেছি। তারি জন্যে আমাদের সমাজের অঙ্গ বিকল হয়ে আছে। এ বিকলাঙ্গ নিয়ে আমরা কোনোদিনও স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না। সমাজ ও দেশ কিছু পুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এ দুয়ের উপরে পুরুষ ও নারীর ঠিক একই অধিকার রয়েছে। নারীর অধিকারের উপর এতকাল আমরা অনধিকার চর্চা করে এসেছি। তাদের অধিকার তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে।

রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার (civic right) যতটুকু পুরুষের থাকবে, ঠিক ততটুকু থাকবে নারীর।

সাধারণ হিতকারী জিনিস—

খনি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী

জিনিসগুলো কতিপয় ব্যক্তির লাভ-লোলুপতার উপায় না হয়ে দেশের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা উপরে যা হওয়া উচিত বলেছি তার একটিও ছাড়া দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ-সব ছাড়াও দেশ যদি কখনো পর-শাসনমুক্ত হয় তা হলে দেশে কিয়ৎজন-তন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে,—গণতন্ত্র নয়।

গণবাণী : ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

কোন্ পথে

গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর জন্যে পথ চলা শুরু করার আগেই সকলে স্থির করে নিয়ে থাকেন কোন্ পথে তাঁদের যেতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা যদি আমরা চাই, তা হলে তা লাভের একটা পথ খুঁজে বের করা আমাদেরও একান্ত প্রয়োজন। কী সে পথ? আজ পর্যন্ত কত আন্দোলন, বিপ্লবের কত প্রচেষ্টা হয়ে গেল, কিন্তু, আমরা গন্তব্য পথে এতটুকুও এগুতে পারিনি। সত্যকারের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে একটা বিপ্লবের—একটা আমূল পরিবর্তনের অবশ্য প্রয়োজন হবে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, এ পরিবর্তনের পথ তো আমাদের আজো স্থির হয়নি।

রাষ্ট্রীয় মুক্তির যত প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত করা হয়েছে সমস্ততেই দেশ বলতে দেশের মাটিকেই আমরা ধারণা করেছি, দেশের সর্বসাধারণের সহিত আমাদের কোনো যোগই স্থাপন হয়নি। কংগ্রেসের আন্দোলন যেমন বরাবর একটা অভিজাত শ্রেণীকে ঘিরে নিয়ে চলেছিল, ঠিক তেমনি চলেছিল ত্রাস-নীতি যাঁরা অবলম্বন করেছিলেন তাঁদেরও কর্ম। শুধু যে এ শ্রেণীগত গণ্ডির ভিতরে থেকে তাঁরা কাজ করেছিলেন তা নয়, তার উপরে একটা ধর্মগত গণ্ডিও আছে। শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন যে তাঁরা হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই দেশে বিপ্লব আনতে চেষ্টা করেছিলেন। শুনেছি শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাসও সে-ধারণা পোষণ করতেন। লালা হরদয়াল ও মিঃ সাবরকার প্রভৃতি লণ্ডনে যে বিপ্লববাদী দল গঠন করেছিলেন তাঁদেরও উদ্দেশ্য ভারতে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পক্ষান্তরে অনেক মুসলমান বিপ্লববাদীর উদ্দেশ্যও ছিল ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আজকাল অবশ্য এ উভয় পক্ষের অনেকেরই মতের পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জন্যে এক সময়ে যাঁরা রাশি রাশি টাকা ব্যয় করেছেন তাঁরা আজকাল আর তা করেন না। কারণ, তখন তাঁরা মনে করেছিলেন যে দেশের শাসনে পরিবর্তন ঘটলে সমস্ত ক্ষমতা তাঁদেরই হাতে আসবে,—সময়ের পরিবর্তনে সে-বিশ্বাস এখন আর তাঁদের নেই।

অসহযোগ আন্দোলন দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

করেছিল। দেশের সর্বসাধারণের জীবনের সহিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একটা যোগ সাধিত হয়ে যাবার লক্ষণ এ আন্দোলনের সময় স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে অসহযোগের একটা উদ্দেশ্য ছিল ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া। এরি জন্যে সাধারণ লোকজন অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তারা আপনা হতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যখনি স্থানে স্থানে ট্যাক্স বন্ধ করে দিতে লাগল তখনি মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে উপদেশ পাওয়া গেল জমিদারের খাজনা আদায় করে দিতে। ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়ার যে ব্যাখ্যা তিনি করলেন তাতে বোঝা গেল যে কেবলমাত্র গবর্নমেণ্টের ট্যাক্সই বন্ধ করতে হবে, জমিদার প্রভৃতির নয়। সর্বসাধারণের সহিত আন্দোলনের যে যোগটা স্থাপিত হতে চলেছিল এখানেই তা কেটে গেল। অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনও গণের (masses) আন্দোলন না হয়ে শ্রেণী আন্দোলনে পর্যবসিত হল। দেশের সর্বসাধারণের গভর্নমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে কোনো লেন-দেন নেই। তাদের সব কাজই হয় অপরের মধ্যবর্তিতায়। এ মধ্যবর্তিগণ যতই অলস, পরাশ্রিত ও পরান্নভোজী হ'ক না কেন মহাত্মা তাদেরকে কোনো প্রকারে উত্ত্যক্ত করতে রাজি হলেন না। সুতরাং নন্-কো-অপারেশনের কর্ম-তালিকায় যে ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়ার কথা স্থান পেয়েছিল তার কোনো মূল্যই রইল না,—সে ছিল একটা ভুয়ো কথা।

এমনো অনেক লোক দেশে আছেন যাঁরা মনে করেন যে যোগসাধনার ভিতর দিয়ে স্বরাজ্য লাভ হবে। কোনো একটা বড় কাজ করতে যেয়ে যাঁরা অকৃতকার্য হয়েছেন তাঁরাই যৌগিক সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, দেশের অনেক লোকই এ-সবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন হয়তো সত্যিই এটা একমাত্র স্বাধীনতা লাভের পথ। এতে দেশের বাস্তবিকই ক্ষতি হচ্ছে। আমরা ভেবেই স্থির করতে পারছিনে কি করে এমন সব কথাও লোকে বিশ্বাস করে থাকে। ভারতবর্ষ একদিন এ-সব সাধনার চরমে পৌছেছিল। তা সত্ত্বেও তার পরাধীন হওয়ার কারণ কি? যদি যৌগিক সাধনার দ্বারা স্বরাজ লাভের এতটুকুও সম্ভাবনা থাকত তা হলে গোড়াতেই সে-স্বরাজ নষ্ট হতে পারত না। চিন্তা কেউ করতে চায় না, সকলেই গতানুগতিকতাতে গা ভাসিয়ে একটা কিছু কূল-কিনারা করে নিতে চায়।

মোটের উপরে, সব কাজই নিতান্ত এলোমেলো ভাবে হচ্ছে। দেশের একটা ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করে সেই সীমাটুকুকে চোখ বুজে 'মা' 'মা' বলে ডাকার নামই দেশপ্রেম নয়। দেশের সর্বসাধারণকে বাদ দিয়ে

দেশপ্রেম হয় না। অথচ আমাদের সবকিছু হতে সর্বসাধারণ বাদ পড়ে আছে। আমাদের স্বাধীনতা লাভ বিবর্তনের পথে হবে কি বিদ্রোহের পথে হবে, তা আমরা জানিনে,—আমরা জানি যে-পথেই হ'ক না কেন, দেশের সর্বসাধারণ সচেতন না হলে স্বাধীনতা লাভ কিছুতেই হবে না। দেশের সকল কাজ যদি সর্বসাধারণের জন্যে এবং সর্বসাধারণের দ্বারা পরিচালিত না হয় তা হলে দেশ যে স্বাধীন হয়েছে একথা কিছুতেই বলতে পারা যায় না। জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে দেশ কখনো পর-শাসনমুক্ত হবে না, হতে পারে না। কিন্তু এই যে জনসাধারণের কথা আমরা বলছি, তারা কোথায়? তাদের কোনো আশা নেই, ভাষা নেই,—শোষিত ও পিষ্ট হয়ে হয়ে তারা ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়েছে। জীবনের সকল সন্ধান তারা ভুলে গেছে, খাওয়া কাকে বলে তারা তা জানে না।

এই মূঢ়, মূক জনসাধারণকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। খাওয়া-পরা সম্বন্ধে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রাণে জাগিয়ে দিতে হবে, এ আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ না দেশের জনসাধারণের প্রাণে জাগছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একথাটা বুঝতে না পারছে যে তারা প্রতিনিয়ত তাদের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদে বঞ্চিত হচ্ছে অলস অ-শ্রমিক লোকের দ্বারা—ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের ভাগ্যে কোনরূপ পরিবর্তনের আশা নেই। এই একটি কথা আমরা বারে বারে বলেছি এবং বারে বারেই আমাদিগকে বলতে হবে।

আমাদের দেশের যুবকগণ দেশের মুক্তির জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলছেন। তাঁদের স্মৃতিকে আমরা চিরকাল শ্রদ্ধা করব। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের যে সকল বন্ধু নানারূপ নিগ্রহ ভোগ করেছেন তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু, তাঁদের অবলম্বিত পথ যে সত্যকারের স্বাধীনতার পথ ছিল একথাটি আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। যে সংগ্রামে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার সহিত দেশের জনসাধারণের কোনো যোগ ছিল না এবং ছিল না বলেই বারে বারে তাঁরা অকৃতকার্য হয়েছেন।

যাঁরা মধ্যশ্রেণীর লোক তাঁদের মধ্যে একটা উৎকট আভিজাত্য-জ্ঞান আছে। তাঁরা বিষয়-বৈভবের মালিক। কাজেই যাদেরকে বঞ্চিত করে তাঁরা মালিক হয়েছেন তাদের সহিত তাঁদের কোনোরূপ সদ্ভাব স্থাপিত হতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। সর্বসাধারণের সহিত তাঁদের একটা পার্থক্য ও বিরোধ আপনা হতেই সৃষ্টি হয়ে আছে। কিন্তু যদিও সমাজের

নিম্নতর মধ্যশ্রেণীর লোকদের অবস্থা কৃষক ও শ্রমিকগণের অবস্থার চেয়ে এতটুকুও ভাল নয় তথাপি শিক্ষিত বলে একটা আভিজাত্য-অভিমান তাঁদেরও মধ্যে রয়েছে। ত্রাস-নীতির পথে যাঁরা চলেছিলেন তাঁরা মধ্যশ্রেণী ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোক। সর্বত্যাগী হয়ে পথে দাঁড়িয়েও তাঁরা জনসাধারণের সহিত মিশতে পারেননি, তাঁদের অন্তরে যে একটা লুক্কায়িত আভিজাত্যের ভাব রয়েছে তারি জন্যে। দেশের উৎপাদক সম্প্রদায়ের সহিত আমরা মিশব আমাদের জীবনের স্থিতিকে নিম্নতর করার জন্যে নয়, পরন্তু, তাদের জীবনের স্থিতিকে উচ্চতর করে তোলার জন্যে।

সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে ইংরেজ আমাদের দেশে কেবল শাসনের জন্যে শাসন করতে আসেনি। তারা আমাদিগকে শোষণ করবার জন্যেই শাসন করছে। কিন্তু একা যে বৃটিশ শোষণবাদ আমাদের উৎপাদক সম্প্রদায়কে শোষণ করছে তা নয়, আমাদের দেশীয় শোষকগণও তাদেরকে অনবরত লুটছে। এ-সব লুণ্ঠন ও শোষণের বিষয়ে উৎপাদকদিগকে সচেতন করতে হবে। ইউরোপের শ্রমিক বা কৃষক আমাদের দেশের কৃষক ও :মিকগণের ন্যায় নিরক্ষর নয়। কাজেই, সে-দেশে কাজ করা এদিক দিয়ে তেমন কঠিন নয় যেমন কঠিন আমাদের এদেশে।

দেশের প্রেমে যে সকল শিক্ষিত যুবক উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাঁদের এখন একমাত্র কাজ সর্বসাধারণকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। সর্বপ্রকার ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের ভুলতে হবে। শোষিত বঞ্চিত যারা তাদের হয়ে কাজ করতে হলে শোষকদের সহিত একটা সংঘর্ষ বাধবেই বাধবে। এ সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হয়েই আমাদের যুবকগণকে দেশের কাজে, গণ-উদ্বোধনের কাজে লাগতে হবে। শ্রেণী-সংগ্রাম দেশে আমরা সৃষ্টি করিনি। যেদিন জগতে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী-সংগ্রামেরও সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন।

গণবাণী : ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম

ভারতবর্ষে ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার দলাদলি খুবই বেড়ে চলেছে। গত ক'বছরের মধ্যে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। খিলাফৎ কমিটি, হিন্দু-মহাসভা, জমিয়ৎ-ই-উলামা, শুদ্ধি-সভা, তবলীগ সভা, হিন্দু-সংগঠন, তনজীম, শিখ লীগ ও মুসলিম লীগ প্রভৃতি কত যে হয়েছে তার হিসাব রাখাই মুশকিল, এর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেরই দ্বারা দেশে অশান্তি ও অসন্তোষ খুব বেশী মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে, এবং এর সবগুলি অনুষ্ঠানেরই পেছনে সে-সকল লোকের হাত রয়েছে যাঁরা উৎপাদন না করেও উৎপন্ন দ্রব্যের সার ভাগটুকু নিঃশেষে উপভোগ করে থাকেন। দেশের সর্বসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় না হলেও ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের একটা মিলনক্ষেত্র ছিল। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে মহাসমিতিও আজকাল শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলির বিষময় ফল এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আজকাল বহুসংখ্যক লোক সমগ্র ভাবে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট গন্ডির বিষয়ই ভাবছে। হিন্দু ভাবছে কি করে মুসলমানকে জব্দ করা যাবে, আর মুসলমান ভাবছে ঠিক তার উল্টো। এই করে ভারতের জাতীয় জীবন অংকুরেই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

একটি ধর্মের নিয়ম-কানুনের সহিত আর-একটি ধর্মের নিয়ম-কানুনের প্রায়ই মিশ খায় না। অধিকাংশ স্থলে এ নিয়ম-কানুনগুলি পরস্পর-বিরোধী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ধর্ম জিনিসটা বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বীর পক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু হলে তা সহ্য করতে পারা যায়। কিন্তু, তা না করে যখনি আমরা আমাদের ধর্মকে অপর-ধর্মাবলম্বীর সহিত বোঝাপড়ার ব্যাপারে পরিণত করি তখনি ধর্ম সাধারণ ভাবে সমগ্র দেশের পক্ষে অসহ হয়ে উঠে। ভারতবর্ষে তথাকথিত ধর্মগুলি আজকাল একেবারেই অসহ হয়ে পড়েছে। এক-ধর্মাবলম্বী অপর-ধর্মাবলম্বীকে বলছে তোমাকে আমার ধর্মের বিধিবিধানগুলো মেনে চলতেই হবে। কেন যে চলতে হবে তার যুক্তি হচ্ছে লাঠির গুঁতো। সাধারণ লোকের মধ্যে এমনি সব মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে দিয়ে যাদের বিন্যস্ত স্বার্থ রয়েছে তারা খুবই মজা লুঠছে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের শোষিত হওয়া কপাল। সকল দিক থেকে সকল-রূপে তারা কেবলই শোষিতই হচ্ছে।

ধর্মসমূহের মধ্যে সারবস্তু কি আছে না আছে তা জানিনে, কিন্তু, এদেশে প্রতিনিয়ত চোখে দেখতে পাচ্ছি যে বেশী ধার্মিক হওয়ার মানেই হচ্ছে বেশী সংকীর্ণ হওয়া। আমি যত বেশী ধার্মিক হব, তত বেশী অন্য-ধর্মাবলম্বীকে ঘৃণা করব, এই হচ্ছে আমার ধার্মিকত্বের পরিচয়। হিন্দু শুধু হিন্দু বলেই মুসলমান তাকে ঘৃণা করে, আর মুসলমানকেও হিন্দু ঘৃণা করে থাকে কেবল সে মুসলমান বলে। হ'ক না কেন উভয়েই মানুষ, তাতে কি এসে যায়—হিন্দু কিংবা মুসলমান তো নয়।

এই যে ধর্মগত সংকীর্ণতা, এটা কেটে যেতে পারত যদি এদেশের বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লোকের জন্যে একটা সাধারণ মিলনক্ষেত্রের সৃষ্টি হ'ত। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রই ছিল একমাত্র মিলনক্ষেত্র যে ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান অর্থনীতিক কারণে, সমস্বার্থের জন্যে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঠিক এইরূপ একটা রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে উঠার পরে সাম্প্রদায়িক গণ্ডিগুলি আপনা হতেই ভেঙে যেত। কিন্তু এমন একটা প্রচেষ্টা আজো পর্যন্ত করা হয়নি। কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে এরূপ রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে উঠা উচিত ছিল বটে, কিন্তু তা হয়নি। প্রথম কথা, কংগ্রেসের সহিত কখনো দেশের সর্বসাধারণের জীবনের যোগ সাধিত হয়নি। ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই কংগ্রেসের সর্বেসর্বা, জনসাধারণ তার কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে একটা ধর্মচর্চার ক্ষেত্র করে তুলেছিলেন। এই অসম জিনিসের একত্র সমাবেশ করার চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল এখন দেশে ফলেছে।

শুদ্ধি-আন্দোলন, হিন্দু-মহাসভা, তব্‌লীগ, হিন্দু-সংগঠন ও তন্‌জীম্ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলি দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনকে একেবারেই বিনষ্ট করে দেবার চেষ্টা করছে। এই সকল অনুষ্ঠানের নেতৃগণ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বক্তৃতা দিতে যেয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন বটে যে তাঁরা খুব একটা উদার মত নিয়ে তাঁদের অনুষ্ঠানগুলো গড়ছেন, কিন্তু সে কেবল কথার কথা মাত্র। শুদ্ধিওয়ালাদের মতে ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্মের স্থান নেই, বৈদিক কর্ষণ (কালচার) ব্যতীত আর যত প্রকারের কাল্‌চার ভারতবর্ষে অনধিকারপ্রবেশ (তাঁদের মতে) করেছে সে-সকলকে তাঁরা ভারত-বর্ষ হতে তাড়িয়ে দেবেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও ডাক্তার মুঞ্জে প্রভৃতি এরূপ মত প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এত বেশী নির্বোধ কি করে তাঁরা হলেন তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই বিংশ শতাব্দীতেও

যাঁরা বহু সহস্র বছরের পুরাতন বিশিষ্ট সভ্যতা নিয়ে সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরে বসে থাকতে চান তাঁদেরকে বিকৃতমস্তিষ্ক বললেও বোধ হয় বিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আজকের দিনে বাইরের আলোবাতাস হতে আপনাকে কেউ কি কখনো বাঁচিয়ে রাখতে পারে? রেলওয়ে স্টীমার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে জগতের বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে একটা যোগ স্থাপিত হয়ে গেছে। আজকের দিনে কোনো একটা বিশিষ্ট সভ্যতা, একটা বিশিষ্ট কাল্‌চার নিয়ে কোনো জাতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, ইচ্ছা করলেও না। মানুষের সাথে মানুষের যোগ যেমন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে তেমনি মানুষের সভ্যতার সাথেও সভ্যতার একটা যোগ সাধিত হতেই হবে। বেদের সভ্যতা ও বৈদিক যুগের কর্ষণ আমাদের অগৌরবের জিনিস নয়, কিন্তু সেটাই ঠিক একমাত্র গৌরবেরও বস্তু নয়। কতকগুলি লোক আছেন যাঁরা লেখাপড়া যথেষ্টই শিখেছেন বটে, কিন্তু, মন তাঁদের রয়ে গেছে একেবারেই ছোট। তাঁরা নিজের মনকে বড় করার চেষ্টা তো করেনই না, পরন্তু, ইচ্ছে করেন যাতে সমগ্র বিশ্বের মন তাঁদেরই মতো ছোট হয়ে যায়।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ডাক্তার মুঞ্জের ভিতরে কত যে বেশী তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দেব। মালাবারের মোপলা-বিদ্রোহের কথা সকলেরই মনে আছে। এই মোপলা-বিদ্রোহটা ছিল সত্যকার ভাবে তথাকথিত অত্যাচারী ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ, আর এই কৃষক-বিদ্রোহ কিছু মালাবারে একবার হয়নি। গত বিদ্রোহের পূর্বে এমন বিদ্রোহ আরো পঁয়ত্রিশবার সেখানে হয়ে গেছে। মোপলা কৃষকেরা সবই মুসলমান, আর ওখানকার ভূম্যধিকারীরা প্রায় সবই হিন্দু। কাজেই, কৃষক আর ভূম্যধিকারীতে যে সংঘাত বাধলো সেটা আর-একদিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ হয়ে পড়লো। ডাক্তার মুঞ্জে এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলেন যে এটা নিছক হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক একথাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বিদ্রোহের সময় দু'একজন মাত্র যে মুসলমান জমিদার ছিলেন তাঁরাও বিদ্রোহীদের হাত থেকে রেহাই পাননি। একটা গণ্ডির ভিতরে থেকে থেকে এ-সকল লোকের মন এতই ছোট হয়ে গেছে যে তাঁরা সব জিনিসের ভিতরেই ধর্মগত পার্থক্য দেখতে পান। হাজীপুরে হিন্দুতে হিন্দুতে যে ঝগড়া হ'ল সেটাও এ শ্রেণীর লোকের কৃপায় হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। তারপরে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের হিন্দু-মুসলমান তাঁতি একসঙ্গে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল তাদের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্যে, কিন্তু, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেটাকেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বলে প্রচার করতে

ছাড়লেন না। হিন্দু তাঁতিও যে মুসলমান তাঁতির সহিত একত্রে ধর্মঘট করেছিল একথা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোপন করে রেখে বললেন যে মিলের মালিকরা কেবলমাত্র হিন্দু বলেই মুসলমান তাঁতিরা সাম্প্রদায়িক বৈর-নির্যাতনের জন্যে ধর্মঘট করেছিল।

হিন্দুদের তরফ থেকে বরাবর বলা হচ্ছিল যে মুসলমানদের কোনো ভৌগোলিক দেশাত্মবোধ নেই, তাঁরা 'প্যান ইস্‌লামিজম'-এর স্বপ্ন দেখে থাকেন। এ দেশাত্মবোধ না থাকা আর 'প্যান ইস্‌লামিজম'-এর স্বপ্ন দেখাকে হিন্দুদের তরফ থেকে বরাবর খারাব বলা হয়েছে। মজা এই হয়েছে যে, যে জন্যে তাঁরা মুসলমানদের অভিযুক্ত করেছিলেন সেই অভিযোগে এখন তাঁরা নিজেরাও অভিযুক্ত হয়েছেন। হিন্দু-মহাসভা এখন 'প্যান হিন্দুইজম' প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দু নেই। তাই তাঁরা বৌদ্ধদের নিজেদের দলভুক্ত করে বৌদ্ধ চীন ও জাপানের সহিত বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করছেন। এ হিন্দু-মহাসভার নেতা লালা লাজপৎ রায় ও মিঃ কেলকার বলেছেন—মুসলমানদিগকে বাদ দিয়ে, তাঁদের কোনো সাহায্য না নিয়েও তাঁরা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। আর সকলকে বাদ দিয়ে তাঁরা যদি একা একা স্বরাজ লাভ করতে পারেন তা হলে সেটা শুধু তাঁদেরই স্বরাজ লাভ হবে, ভারতের স্বরাজ লাভ হবে না।

মানুষ কত যে বহুরূপী সাজতে পারে তা বর্তমানের দু'জন প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক নেতা লালা লাজপৎ রায় ও ডাক্তার সয়ফুদ্দীন কিচ্‌লুর কার্য-কলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সহজে বুঝতে পারা যায়। লালা লাজপৎ রায় প্রথমে ছিলেন আর্য-সমাজী। আর সকল আর্য-সমাজীরা যেমন সাম্প্রদায়িক গরল উদ্গীরণ করে থাকেন তিনিও তা করতেন। তারপরে ধীরে ধীরে তাঁর মত বদলে যায়। আমেরিকা হতে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কোনো ধর্মেই তাঁর বিশ্বাস নেই। আজ আবার তিনিই হয়েছেন হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু-সংগঠনের পাণ্ডা। ডাক্তার সয়ফুদ্দীন কিচ্‌লুর দেশাত্মবোধের কথা দেশময় ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। আজ তিনি হয়েছেন তন্‌জীম্‌ বা মুসলিম-সংগঠনের পাণ্ডা। বাংলা দেশে ভ্রমণের সময় ডাক্তার কিচ্‌লু অনেক বড় বড় কথা বলে গেছেন, কিন্তু সে-সকল ভুয়ো কথার কোনো মূল্যই নেই। যদি তাঁর মনে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতা না থাকে তা হলে তিনি পৃথক ভাবে মুসলিম-সংগঠন করতে গেলেন কিসের জন্যে? তারপরে, তাঁর বক্তৃতা অনুসারে কিংবা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতা অনুসারে কেউ কখনো তন্‌জীম্‌ ও হিন্দু সংগঠনের কাজ করতে যাবে না।

মুসলমানরা 'তনজীম' করবে হিন্দুদের মাথা ভাঙার উদ্দেশ্য নিয়ে, আর হিন্দুরা সংগঠন করবে মুসলমানদের মাথা ভাঙার জন্যে ; খারাব জিনিসের খারাব ফলই ফলবে, ভাল ফল কখনো ফলবে না।

ধর্মগতভাবে যে অনুষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি আবার দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করেছে। হিন্দু-মহাসভা, খিলাফৎ কমিটি ও জমিয়ৎ-ই-উলামা প্রভৃতি সভাগুলো দেশের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে দেশের লোককে বিপথে চালিত করছে। কেননা, এ-সব অনুষ্ঠানের তরফ থেকে যা কিছু করা হচ্ছে তার সমস্ততেই একটা ধর্মের রং ফলানো হচ্ছে। আমাদের দেশের লোক ধর্মের নামে যেমন শোষিত হচ্ছে এমনটা পৃথিবীর আর কোথাও কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরাশ্রিত শোষকগুলি দেশের সর্বসাধারণকে এমনি আফিম খাইয়ে রেখেছে যে ধর্মের নামে তাদেরকে যা কিছু বলা হয় তাতেই তারা বিশ্বাস করে থাকে। আজ যা 'না' কালই আবার তা 'হাঁ' হয়ে যায়, অথচ 'হাঁ' ও 'না' দুয়েতেই তাদের বিশ্বাস অব্যাহত থাকে।

কেন যে এমন করা হয় তার ব্যাখ্যা আমরা একাধিকবার প্রদান করেছি। আবারো বলছি—ধর্মগতভাবে অনুষ্ঠিত যতগুলি সঙ্ঘের নাম আমরা করেছি তার সবগুলিরই মূলে একই শ্রেণীগত স্বার্থ রয়েছে। এই দেশের জনসাধারণ যাতে কোনো প্রকারে আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন না হতে পারে তারি জন্যে শোষক শ্রেণীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা হচ্ছে—এই ধর্মগত সঙ্ঘগুলোর অনুষ্ঠান ও তারি ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই করে দেশের সর্বসাধারণের সর্বনাশ করা হচ্ছে। এদেশের যুবকগণ দেশের মুক্তির জন্যে কম নিগ্রহ ভোগ করেননি। ফাঁসিকাঠে ঝুলে আপনাদের প্রাণ তাঁরা হাসিমুখে বলি দিয়েছেন, কারাবরণ তাঁরা করেছেন এবং আরো কত প্রকারে যে নির্যাতিত তাঁরা হয়েছেন কে তার খবর রাখে। কিন্তু বর্তমানে দেশের এ দুর্দিনে তাঁদের কি কোনো কাজ নেই করার? তাঁরা দেশের সর্বসাধারণকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলুন। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে পরিহার করে তাঁদের উচিত জনসাধারণকে বোঝানো কি ক্ষতিই না স্বার্থপর লোকেরা তাদের করছে। এ অচেতন-জনগণকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাদের রক্ত নানা উপায়ে যে সকল লোক শোষণ করছে সে-সকল লোক কোনোদিনও তাদের বন্ধু হতে পারে না।

গণবাণী : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

জনগণের কাজ

ভারতবর্ষে আজকাল সর্বসাধারণের বিষয় সর্বত্র চর্চা হয়ে থাকে। যতগুলি রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্ঘ দেশে আছে তার সবগুলিরই উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের ভাল করা। ব্যবস্থাপক-সভার নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে যখন আসে তখন আবার আমাদের নেতৃবৃন্দের এই সর্বসাধারণের ভাল করার ইচ্ছেটা অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে উঠে। মোটের উপর জনসাধারণের হিতের জন্যে কাজ করার কথা বলাটা আজকের দিনে একটা ফ্যাশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। কৃষক-দিগকে আর নীচে পড়ে থাকতে দেব না, শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করব, সকল রাষ্ট্রীয় সভা-সমিতিতে এ সকল কথা হয়ে থাকে। কংগ্রেস এরূপ প্রস্তাবও পাশ করতে ছাড়েনি যে শ্রমিক-সঙ্ঘসমূহ গঠন করা হবে, এমন কি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে টাকা দিয়ে সাহায্য পর্যন্ত করা হবে। এ কাজের একটা তালিকা তৈয়ার করার জন্যে গয়া কংগ্রেস একটি কমিটি পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্য-শ্রেণীর ভদ্রলোকগণের ত্যাগ ও দেশাত্মবোধের উপরে। কিন্তু যখন এ আন্দোলন একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে গেল তখন একদিন হঠাৎ কর্তারা জেনে ফেললেন যে দেশে তাঁদেরকে বাদ দিয়েও শতকরা আশিজনের উপরে একটা গণ-সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু যাঁরা জাতীয় অসহযোগের দ্বারা গবর্নমেন্টকে কুপোকাৎ করে দেবার মতলব এঁটেছিলেন তাঁরা প্রথমে আমাদের শতকরা আশিজনেরও উপর লোকের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখেননি। শ্রমিকগণের ভাল করার জন্যে নাগপুর কংগ্রেসেও একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সে-প্রস্তাব অনুসারে কোনো কাজ তো কোনোদিনই হয়ই নি, পরন্তু, শ্রমিক সাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে অনেক কাজ কংগ্রেস করেছে। যখনি বিত্তশালী ভদ্রশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হয়েছে, কংগ্রেস পক্ষাবলম্বন করেছে বিত্তশালী ভদ্রশ্রেণীর। অসহযোগ আন্দোলন কোথাও যদি একটুকুও কৃতকার্য হয়ে থাকে তা যে জনসাধারণের অংশ নেওয়া হেতু হয়েছে সেদিকে কিন্তু কংগ্রেস কোনোদিনও ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করে নি। কংগ্রেস বরাবর আদর করেছে ভদ্রসমাজের মনমরা দেশাত্মবোধের।

যুবরাজ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন দেশের জনসাধারণ সমবেত ভাবে তাঁর অভিনন্দন হতে বিরত ছিল। তারপরে আহ্মদাবাদ কংগ্রেসে শুধু শুধু একটা বিধি-লঙ্ঘনের ভয় দেখানো হল, কিন্তু, বারদৌলিতে সে-বিষয়টিই যখন মীমাংসার জন্য উপনীত করা হল তখনি পেছনে হটে আসা হল, অর্থাৎ কংগ্রেস যে জমিদার প্রভৃতি বিন্যাস্ত-স্বার্থ-বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধি-সভা তারি প্রমাণ হয়ে গেল এ কাজের দ্বারা। ১৯২১ সনে ভারতবর্ষে যে গণ-উদ্বেলের একটা অভূতপূর্ব আভাস পাওয়া গিয়েছিল সেটাকে কংগ্রেস ধ্বংস করে দিলে বণিক ও জমিদার শ্রেণীর মুখ চেয়ে, আরো খোলাসা করে বলতে গেলে তাঁদের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু, আজকাল যে জনসাধারণের নামে এতসব কথা হচ্ছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় দলের মূলনীতির সহিত যে কৃষক ও শ্রমিকের কথা জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার কারণ কি ? মনে হয়, আমাদের নেতৃগণ ইতিহাস হতে কিছু পাঠ গ্রহণ করেছেন—তাঁরা বুঝেছেন বিত্তশালী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ই একমাত্র পৃথিবীর সব কিছু নয়। তাঁরা এখন বুঝতে আরম্ভ করেছেন জনসাধারণের নাম না নিয়ে কোনো আন্দোলন চালানো ঠিক হবে না। ওদিকে বৃটিশ শোষণবাদীরা বলছেন যে তাঁরা যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে যান তা হলে ভারতে জনসাধারণকে জমিদার ও সুদখোর মহাজনের হাত হতে বাঁচানোর জন্যে কেউ থাকবে না। মোটের উপর প্রত্যেক দলই চাইছেন জনসাধারণকে কিছু-না-কিছুর হাত থেকে বাঁচাতে। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা চরম মত মেনে চলেন তাঁরা দিন-মজুর ও শ্রমিকদের ভাল করতে চান কাউন্সিলে আইন বিধিবন্ধ করে এবং শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে একটা সহযোগিতার সৃষ্টি করে। খেয়ালী রাজনীতিকরা মনে করেন যে তাঁরা জনসাধারণকে মুক্ত করবেন পুরাতন পঞ্চায়েত প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তাঁদের মতে গণতন্ত্রের এতদপেক্ষা ভাল নমুনা আর কিছুই হতে পারে না। প্রত্যেকেই বোবা জনসাধারণের তরফ থেকে একটা অনুমোদন পেতে চান। কারণ, তাঁরা জেনেছেন এই না হলে জাতীয় আন্দোলন কেবলমাত্র মধ্যশ্রেণীর লোকের দ্বারা আর চলবে না। এও তাঁরা বুঝেছিলেন যে জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা না করে তাঁদিগকে জাতীয় কাজে আহ্বান করা নিরাপদ নয়। কেননা, এরূপ আহ্বান করলে লিবারেল ও রাজভক্ত সম্প্রদায়ের সমালোচনার বিষয়ীভূত হতে হয়। কংগ্রেস যখন জনসাধারণের ইকনমিক (অর্থনীতিক) সংগ্রাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল তখন গবর্নমেন্ট তাঁদের মডারেট ও লিবারেল বন্ধুগণের সহযোগিতায়

কতকগুলি কাজ করে শ্রমিক সাধারণের বন্ধু হতে চেষ্টা করেছিলেন। সামাজিক উদ্বেলের আশঙ্কা যদি এতে না থাকত তা হলে গভর্নমেন্ট ধামাধরা জমিদার ও মডারেটদের সাহায্য নিয়ে কতকগুলি ভূমি সংক্রান্ত ও শ্রমিক সংক্রান্ত আইন বিধিবন্ধ করে দেশকে আপাতত শান্ত করার চেষ্টায় কৃতকার্য হতে পারত। এ পথে চলাতে বিপদের আশঙ্কা আছে বলেই বর্তমান সময় অন্য নীতি অবলম্বন করা হয়েছে; কিন্তু, এদিক দিয়ে কোনো নীতিই বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে না। জনসাধারণের অর্থনীতিক অবস্থা দিন দিন এত বেশী খারাব হচ্ছে যে কোনো প্রকারের জোড়াতালির দ্বারা, শোষকগণ অনাগত গণ-উদ্বোধন চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না। ভারতের জাতীয় দলের লোকেরা যতই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করুন, আর গবর্নমেন্ট যতই চালাকি করুন, কিছুতেই কিছু হবে না। পিষ্ট শোষিত কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে অসন্তোষ বর্ধিত হতেই থাকবে। শোষকগণ এই যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে, এ অসন্তোষ হতেই দেশে বিপ্লবের সূচনা হবে। শোষকগণ তাদের নিজের হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সকল সরঞ্জাম অনবরত তৈয়ার করছে।

দেশীয় মূলধন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতেও বিদেশী শোষণবাদের কিছু অসুবিধে যে না হচ্ছে তা নয়। এতে বিদেশী শোষণবাদের এক-চেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ তো হবেই, অধিকন্তু তাদের রাজনৈতিক অধিকারও কিছু দুর্বল হয়ে পড়বে। বর্ধমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী গবর্নমেন্টের অধীনে আপনাদিগকে একটা শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত করার সুবিধে পাচ্ছেন না। সে-জন্যে তাঁরা একটা জাতীয় গবর্নমেণ্ট (state) স্থাপন করতে চান। তারপরে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকেরা সোজা কথায় গরীব ভদ্রলোকেরা দিন দিন এত বেশী গরীব হয়ে যাচ্ছেন যে তার প্রতিক্রিয়াতে হয়তো তাঁদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হবে, নতুবা পশুত্বে অবনমিত হয়ে যেতে হবে। এ দু'এর কোনো মধ্যপথ নেই। উপরের কারণগুলির প্রত্যেকটিরই একটু বিশিষ্ট মূল্য আছে এবং প্রত্যেকটিই ইতিহাসে আপনার বিশিষ্ট কার্য করবে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস হতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে দেশীয় ধনিক শ্রেণী বিদেশীয় শোষণবাদের সহিত একটা আপোস-মীমাংসা করে নেবে। শেষোক্ত দুটি শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল বলে তাঁদেরও বিপ্লবস্পৃহা অনেকটা কমে যাবে। যদি কিছু একটা বাকীও থাকে তথাপি তাঁদের কাছ থেকে নন্-কো-অপারেশনের মতো একটা কিছু আশা করা যায় মাত্র, তার বেশী নয়।

জনসাধারণের প্রতি এই যে একটা আকর্ষণ, এটা সত্যিকারই হ'ক, আর তথাকথিতই হ'ক--এটা বোঝা যাচ্ছে যে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিটা অবশ্য প্রসারিত হওয়া উচিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন হিসাবে জাতীয় আন্দোলন কখনো কৃতকার্য হবে না। অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করে পরিবর্তনের এমন একটা কারণ সৃষ্টি হবে যা কোনো আপোস মানবে না, কোনো প্রকারের সংগ্রামে এতটুকুও দমে যাবে না।

আজ সর্বসাধারণের কথা চারদিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, সকলেরই মুখে শোনা যাচ্ছে যে সর্বসাধারণের সাহায্য ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা লাভ হবে না। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও কংগ্রেস বুর্জোয়া অর্থাৎ পরোৎপন্ন-সম্পদ-উপভোগকারী সম্প্রদায়ের সঙ্ঘই হয়ে আছে। বিশেষ করে এবার কংগ্রেসকে খুব বেছে বেছে জমিদার ও ধনিক সম্প্রদায়ের লোকদের বাছাই করতে দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে কংগ্রেস সচেতন বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত হয়েছে। এটা স্থির নিশ্চিত যে বর্তমান কংগ্রেস জাতীয় মুক্তির জন্যে ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণকে কিছুতেই বিপ্লবাত্মক পথে পরিচালিত করতে পারবে না। জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম যে বিত্তশালী ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর লোকেরা চালাতে পারবেন না তা এখন বোঝা গিয়েছে। এজন্য কৃষক ও শ্রমিকগণের সঙ্ঘ গঠন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু. এই কাজ করবে কে? সাম্প্রদায়িক দলাদলি যেরূপ বিশ্রী ভাবে বিষিয়ে উঠেছে তাতে এখানকার কোনো দলই এ কাজ করতে পারবে না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিশূন্য হয়ে একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই এ কাজ করতে পারে, আর কেউ নয়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় ভারতকে কম্যুনিস্টরা ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে প্যারবে না।

মধ্যশ্রেণীর নেতৃগণ যে পরাজিত হয়েছেন তা তাঁরা মেনে নিয়েছেন,—কথায় না মানলেও কাজে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা ব্যতীত আর কেউ একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে জনগণ-চৈতন্য ব্যতীত কোনো সংগ্রামই চলতে পারে না। সকলেই চাইছেন গণের সমর্থন, কিন্তু, গণ-চৈতন্য সৃষ্টি করে একটা সামাজিক বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা কেউ করতে পারছেন না। করতে গেলেই তাঁদের আপন শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি চাগিয়ে উঠে। জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করলেই যে মধ্যশ্রেণীর নেতৃগণের আপন শ্রেণীর সহিত সংঘর্ষ বাধবে একথা মনে করেই তাঁরা শিউরে উঠেন। এই শ্রেণী-প্রীতির জন্যে যাঁদের কোনো কাজ করার ইচ্ছা আছে তাঁরাও কিছু করে উঠতে পারেন না। তারপরে, অনেকে চান শোষক আর শোষিতের মধ্যে সহযোগিতা

স্থাপন করতে। কিন্তু, বিরুদ্ধ স্বার্থের সহযোগ কিছুতেই হতে পারে না। কৃষক ও শ্রমিকগণ আন্দোলনে যোগ দেবে তাদের ভাত-কাপড়ের অভাবে পিষ্ট হয়ে। সে-অভাবের যারা স্রষ্টা তাদের সাথে যোগ-স্থাপন কিছুতেই হতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের খাতিরে যাঁরা বলেন যে কৃষক ও শ্রমিকগণের জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর একযোগে কাজ করা উচিত, তাঁদের জাতীয় স্বার্থ বিন্যস্ত স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রমিক-সাধারণ যখন মাথা তুলবে, বিন্যস্ত স্বার্থের বিরুদ্ধেই তুলবে। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের সহানুভূতি পাচ্ছে তাঁদেরকে ভূমি ঘুষ দিয়ে। কংগ্রেসেরও আকর্ষণ বিত্তশালী লোকের প্রতিই বেশী। কাজেই বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস বিপ্লব আন্দোলন চালানোর দিক থেকে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের চেয়ে এতটুকুও যোগ্যতর সঙ্ঘ নহে।

তবে কি কংগ্রেসের সহিত কোনো সংস্রব আমাদের রাখা উচিত নয়? জাতীয় মুক্তি আমরা সর্বাগ্রে চাই। ভারতকে পরশাসনমুক্ত করতে পারলে তবেই আমরা আমাদের আদর্শের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারব। সেই জন্যে ভিতর ও বাহির থেকে সমালোচনা করে করে কংগ্রেসকে অন্ততঃপক্ষে পূর্ণ জাতীয় মুক্তির পথে চালাতেই হবে। এই এতটুকুর জন্যে আমরা কংগ্রেসের সহিত কাজ করব। কোনো আপোস-মীমাংসার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসের দ্বারে আমরা ধরনা দিতে যাব না। যতটুকু কাজ আমাদের কংগ্রেসের সহিত হতে পারে, ঠিক ততটুকুরই জন্যে আমরা কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করব। কংগ্রেসকে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে গণতান্ত্রিক ভারত (Republican India) সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে বাধ্য করব।

গণবাণী: ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

রাজদ্রোহ

রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা রাজাকে ভারত সাম্রাজ্য হতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে আমাদের দেশের লোকেরা নিগ্রহ নিতান্ত কম ভোগ করেনি। জেলের ঘানি ঘুরানো থেকে আরম্ভ করে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলা পর্যন্ত সবই তাদের ভাগ্যে ঘটেছে। তারপরে ভারতের বাহিরে যাঁরা নির্বাসিত হয়ে আছেন তাঁদেরও সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গ্রেট বৃটেনের যিনি রাজা তিনিই আমাদের ভারতবর্ষের সম্রাট। বিদ্রোহ যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা ষড়যন্ত্র ইত্যাদি যা কিছু করার কথা বলা হয়েছে সবই সেই সমুদ্র-পারের রাজা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে।

গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাট ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসন করেন না। তাঁর নামে ভারতবর্ষ শাসিত হয় মাত্র। তিনি ভাল লোক কি মন্দ লোক সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই আমাদের মনে উঠে না, কেননা, তাঁর সাথে আমাদের কোনো লেন-দেন নেই। গ্রেট বৃটেনে হাউস অব কমন্স নামক একটা সভা আছে। এ সভার সভ্যগণ ভোটে নির্বাচিত হন এবং এরি বিশিষ্ট সভ্যগণ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করে থাকেন। হাউস অব কমন্স গ্রেট বৃটেনের বিন্যস্ত স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকেরই দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকে। কাজেই হাউস অব কমন্স যে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন তা এই বিন্যস্ত স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকদের মুখ চেয়েই করেন। নামে হাউস অব কমন্স জনসাধারণের সভা হলেও সত্যকার ভাবে তার উপরে অসীম ক্ষমতা রয়েছে ইংল্যাণ্ডের ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের। এঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের এঁরাই মালিক। এঁদের ব্যবসায়ের নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করার জন্যেই এঁরা এঁদের শাসন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত করেছেন। ব্যবসায়ের দ্বারা এই যে বিভিন্ন দেশকে শোষণ করা হয় এরি নাম বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ। এ শোষণেরই খাতিরে আমরাও বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমে পদানত হয়ে আছি। আমাদের শাসন ও শোষণ এ দু'এর একটিরও জন্যে ইংলণ্ডের রাজা কিংবা জনসাধারণ এতটুকুও দায়ী নহেন।

বিপ্লব ও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা এদেশে যা কিছু হয়েছিল সবই হয়েছিল এই

বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমেরই বিরুদ্ধে, গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাটের বিরুদ্ধে নয়। এদেশের স্বার্থের হানি গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাটের দ্বারা হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত যাদের দ্বারা স্বার্থের হানি ঘটে তাদেরি বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে, অপরের বিরুদ্ধে নয়। একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজা আজকাল আর জগতের কোনো দেশেও নেই। ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্রের সহিত যখন রাজতন্ত্রের সংঘর্ষ বেধেছিল তখনি সে যথেচ্ছাচারী রাজার অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলোপ হয়ে গেছে, রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের জায়গায় এখন স্থাপিত হয়েছে কিয়ংজন-তন্ত্র। আমাদের সংগ্রাম চলেছে এ কিয়ংজন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাজেই রাজদ্রোহ নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব একেবারেই নেই। ভারতবর্ষ ভারতসম্রাটের নামে শাসিত হয়, কিন্তু, ভারত-সম্রাটের জন্য শাসিত হয় না। ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের জন্য শাসিত হয় না। ভারতবর্ষ শাসিত ও শোষিত হয় গ্রেট বৃটেনের ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের জন্য। এই যে শোষণের জন্যে শাসনপ্রথা, এ প্রথারই বিরুদ্ধে আমাদের যত অভিযোগ, এরি আমূল পরিবর্তন সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলার কথা আমরা জানি। ঠিক বিদেশী শোষণবাদ বা ইম্পিরিয়েলিজমও তাঁদের শোষণের সুবিধে ও স্থায়িত্বের জন্যে সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশেও করেছেন। তাঁরা আমাদের দেশেও এমন কতকগুলি শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন যাঁদের দ্বারা তাঁদের শোষণের যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে। এ শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখা হচ্ছে ঠিক যেন ঘুষ দিয়ে কতকগুলো লোককে আপনাদের দলে টেনে আনা। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা জমিদারদের নাম করব, এ জমিদারী প্রথা বর্তমান আছে বলে স্টেট বা রাষ্ট্রকে রাজস্বের দিক থেকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। তবুও যে এ প্রথা স্থিরতর রাখা হচ্ছে তা কিসের জন্যে? ভূমি হতে যে শস্যোৎ-পাদন করে থাকে সেও বরাবর স্টেটের তহবিলেই তার দেয় রাজস্বের টাকা জমা করে দিতে পারে। অ-শ্রমিক মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের মাঝখানে রেখে দেওয়ার কিছু কি প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন যে নেই একথা খুবই সত্য, কিন্তু, বিনা প্রয়োজনে এ জমিদার শ্রেণীর লোকেরা যে রয়েছে একথাও ঠিক তেমনি সত্য। এ কি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা নয়? এমন আরও বহু আছে। আর সবগুলো আছেও ঠিক এই একই কারণে।

এ সকল বিষয়ে রাজা একেবারেই নির্লিপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আর না করা একই কথা। আমাদের ঝগড়া-কলহ ও সংগ্রাম সবই হচ্ছে বৃটিশ

শোষণবাদ ও ভারতীয় শোষক শ্রেণীর সহিত। আমাদের এ সংগ্রামকে শোষক-দ্রোহ বলা যেতে পারে, রাজদ্রোহ তা একেবারেই নয়। আমার দেহের রক্ত যে শোষণ করে খাবে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার আমার থাকবে। ভারতবর্ষ সর্ববিধ শোষণের হাত হতে মুক্ত হবে, ভারতের সকল কাজ ভারতেরই জনসাধারণের জন্যে পরিচালিত হবে।

গণবাণী : ১২ই অক্টোবর, ১৯২৬

নূতন দল

পুরাতন দল যখন কেবলমাত্র দেশের শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের খাতিরে পরিচালিত হয় তখন জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নূতন দল গড়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে লিবারেল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রভৃতি দল বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণতন্ত্রের সহিত সকল প্রকার বন্ধুত্ব বজায় রেখে আপনাদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই এ সকল দল গঠিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে একবার মাত্র জনগণের সংস্পর্শে এসে পড়েছিল এবং আবার এই গান্ধীরই নেতৃত্বে জনগণ হতে বহুদূরে সরেও পড়েছে।

বিগত যুদ্ধের পর হতে পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। রুশের বিপ্লবের ফলে সমগ্র জগতে একটা গণ-চৈতন্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের যে শক্তি ছিল সে শক্তি আর এখন নেই। ভারতবর্ষের ধনিক-বণিকের সহিত একটা আপোস-নিষ্পত্তি না করে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম কিছুতেই এদেশকে আর শোষণ করতে পারবে না। তারি জন্যে তুলোর শুল্ক উঠে গেছে, লৌহনির্মিত দ্রব্যের আমদানির উপরে শুল্ক বসেছে এবং আরও কত কি পরিবর্তন করা হয়েছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের এই আপোসের ফলে দেশী ধনিক-বণিকের নিকট হতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য পাবার আর কোনো আশা নেই। ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বেদী হতে ওর কয়েকজন সভাপতিই পরে পরে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সংস্রব কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী নন। তাঁরা আর খানিকটা রাজনৈতিক অধিকার বাড়াতে চান মাত্র। উপনিবেশসমূহের সমাধিকার ভারতবর্ষ পেতে পারে না, কারণ ভারতবর্ষ গেট বৃটেনের উপনিবেশ তো নয়ই, পরন্তু ইউরোপের অন্য কোনো স্বাধীন শক্তিরও উপনিবেশ নয়। ঔপনিবেশিক অধিকার পেয়েও ভারতবর্ষের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হতে পারে না। কেননা, সে-অবস্থাতেও ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের হাত এড়াতে পারবে না। অস্ট্রেলিয়া আজো পর্যন্ত ইম্পিরিয়েলিজমের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণতন্ত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনো দেশ যে মুক্তিলাভ করেছে

এমন কথা মেনে নেওয়ার ন্যায় বাতুলতা আর কিছুই হতে পারে না। ধনিক-বৃত্তির শেষ সোপান হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। ধনিকরা প্রথমে নিজেদের দেশের শ্রমিক ও উৎপাদকদিগকে শোষণ আরম্ভ করে থাকে। এইরূপে তাদের কারবার যখন খুব বিস্তৃতি লাভ করে, তাদের নিজেদের দেশে যখন কাঁচা মালের অভাব হয়, তখন তাদেরকে বের হতে হয় নূতন বাজারের সন্ধানে, তাদের উদ্দেশ্য তৈরী মাল চালানো ও কাঁচা মাল সংগ্রহ করা। এইরূপ যে ধনিকের শোষণ হয়ে থাকে, এ শোষণের নাম হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। এরি জন্যে দেশের পর দেশকে ইম্পিরিয়েলিস্ট বা শোষণবাদীরা অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে পদানত করে রেখেছে।

ভারতবর্ষ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে আছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক-বণিককে হাত করে দেশের জনসাধারণকে নির্দয় ভাবে শোষণ করছে। এই শোষণের হাত এড়াবার জন্যে আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কিন্তু, ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রীয় সংঘ ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস তা চায় না, কংগ্রেস ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। তার কারণ এই যে কংগ্রেসের মাথার ওপরে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক যে শ্রেণীর লোকের সহিত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের একটা আপোস-নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কংগ্রেসের গত গৌহাটি অধিবেশনের কার্যাবলীর খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝে থাকবেন যে বর্তমান কংগ্রেস ভারতের জনগণের জন্যে নয়।

কংগ্রেসের সাবজেক্ট কমিটিতে প্রস্তাব উঠেছিল, জমিদার ও ধনিকের সহিত যখন কৃষক ও শ্রমিকের ঝগড়া বাধবে তখন কংগ্রেসকে দাঁড়াতে হবে কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষাবলম্বন করে। বর্তমানে কংগ্রেসের মাথার মণি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তার উত্তরে বলেছেন—'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট বা কম্যুনিস্ট দল নয়।' একথা বলার মতলব এই হচ্ছে যে যারা পরিশ্রম করে সবকিছু উৎপাদন করে থাকে তাদের হয়ে দাঁড়াতে কংগ্রেস কিছুতেই প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত যে নয় তা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এতকাল দেখে এসেছেন। তবুও আরো পরিষ্কার ভাষায় বঙ্গের স্বরাজ্য-দলপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সে-কথাটিই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তাঁদের দলে অনেক জমিদার আছেন, আর জমিদারের সাহায্য না পেলে তাঁদের এত লোক কিছুতেই ব্যবস্থাপক-সভায় যেতে পেতেন না। কাজেই, এহেন জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিছুতেই কৃষকদের সাহায্য করতে পারবেন না। একজন বাঙালী কলেজের

অধ্যাপকও ছিলেন ঐ কমিটিতে। তিনি বললেন—কি সর্বনাশ! এই করলে যে কংগ্রেস একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতে অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক প্রভৃতিকে মিলিয়ে ধরলে শতকরা আটানব্বুই জনের হাতে এসে পড়বে! এ তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না। তাঁর মতে কংগ্রেস জমিদার, ধনিক, কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকগণের সমবেত সংগঠন হবে। কিন্তু, সত্য কি তা কখনো হতে পারে? একথা কোনো দিন কোনো পাগলেও বিশ্বাস করতে পারবে না যে কৃষক আর জমিদারের এবং শ্রমিক ও ধনিকের স্বার্থ অভিন্ন। কৃষক আর শ্রমিকের যা স্বার্থ জমিদার ও ধনিকের পক্ষে তা ধ্বংসের কারণ। একটা হ'ল শোষিতের শ্রেণী, আর একটা হ'ল শোষকের। এ দু'শ্রেণীতে মিলেমিশে সচেতন হয়ে কিছুতেই কাজ করতে পারে না। খেটে, উৎপন্ন করে যারা খেতে পায় না, আর না খেটে, না উৎপন্ন করে যারা প্রচুর খেতে ও জমা করতে পায় তাদের মধ্যে একটা সংগ্রাম বাধবেই বাধবে। এরূপ সংগ্রাম ভারতবর্ষে নেই বলে, এটা ইউরোপ থেকে আমদানি করা বলে, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ধাপ্পাবাজি ও গোঁজামিলের ভিতর দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কতদিন আর তা চলে! তাই, কালের আহ্বানে এবারে যখন দাবি করা হ'ল কংগ্রেসকে দেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে হবে তখন অগত্যা কংগ্রেসের নেতাদের বলে দিতে হয়েছে যে তাঁরা জনগণের দল নন—তাঁরা তাঁদের নিজেদেরই দলে অর্থাৎ ধনিক-বণিক ও জমিদারের দলে।

এই তো গেল ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কথা। তারপরে, অল্ ইন্ডিয়া ট্রেড্স ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা আরো শোচনীয়। এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক-সঙ্ঘগুলো শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশ স্থলেই আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অপদেবতার মতো শ্রমিকদের ঘাড়ে চেপে বসে আছেন। এঁদের অনেকেই কারখানার শ্রমিকদের সাথে মেলামেশা করার চেয়ে মালিকদের সাথেই মেলামেশা করতে বেশী ভালবাসেন। তাঁরা শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে ধর্মঘট করানোর চেয়ে ধর্মঘট ভেঙে দেওয়াটাই বেশী পছন্দ করেন। তাঁরা শ্রমিকদের সাথে যখন মিশতে যান তখন তাদের একজন হয়ে কিছুতেই যেতে পারেন না। তাঁরা বড়, তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর লোক, এ-সব মনে রেখেই দয়া করে শ্রমিকদের উপকার করতে যান মাত্র। এঁদের মধ্যে যাঁরা ভাল লোক তাঁদের কেউ বা লোক-হিতৈষী, কেউ বা শান্তিবাদী—বিপ্লবের ধারণা অল্প লোকেরই আছে, হয়তো তা-ও নেই।

মোটের ওপরে সত্যকারের শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি এদেশে এখনো হয়নি। একটা আমূল পরিবর্তনের ধারণা নেই বলে বর্তমানের শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের বিশেষ কিছু উপকার হচ্ছে না। তাদের হয়ে যাঁরা কাজ করতে যান, তাঁরা তাদের একজন হতে পারেন না, এবং আজকালকার বৈপ্লবিক শ্রমিক-সঙ্ঘবাদের (revolutionary trade unionism-এর) সহিত তাঁদের ভাল পরিচয় নেই বলে, আজো পর্যন্ত তাঁরা শ্রমিকদের ভিতর থেকে শ্রমিক-নেতা গড়ে তুলতে পারেন নি। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন আমাদের শ্রমিক আন্দোলন কিছুতেই মূর্ত হয়ে উঠবে না। সর্বাপেক্ষা বেশী শোষিত হয় বলে, তাদের কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই বলে এবং সর্বোপরি কারখানা প্রথার কল্যাণে তারা খুব সহজে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে বলে, আমাদের শ্রমিকগণই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারে। যারা অগ্রণী হবে তারাই যদি পেছনে পড়ে থাকে তা হলে আমাদের মুক্তির আন্দোলন যে পণ্ডশ্রম মাত্র হবে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

এই সকল কারণে একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দল জনগণের দল। আমরা এর নাম দিয়েছি 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। শোষণের কল্যাণে যারা সর্ব সম্পত্তি হারিয়ে আপনাদের পরিশ্রম ধনিকদের নিকটে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে শুধু যে সেই সর্বহারা (proletariat) এই দলে থাকবে তা নয়, কৃষকরা ও নিম্ন-মধ্য-শ্রেণীর লোকেরাও এতে থাকবে। এই নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকদের যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁরা তাতে ধনিকদের যথেচ্ছাচার দেখে অনেকটা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কেবল নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকদের দিয়ে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন করা চলে না। তাই তাঁদের অনেকেই ঝুঁকে পড়েন ষড়যন্ত্রমূলক ত্রাস-নীতির দিকে। কিন্তু, এটা যে সত্যকারের বিপ্লবের পথ নয় তাঁদের মধ্যে যাঁরা এতটুকু চিন্তাশীল লোক আছেন তাঁরা তা বুঝতে পেরেছেন এবং এখন তাঁদের অনেকের আকর্ষণ হয়েছে জনগণের প্রতি।

শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকদের নিয়ে আমাদের এই নূতন দল। সর্বহারা শ্রমিকগণ ভারতের এই জাতীয় সংগ্রামে অগ্রণী হবে আর কৃষক-সাধারণ তাদের অপরিমিত জনবল নিয়ে তাদের সাথে যোগদান করবে। যেহেতু আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একমাত্র শক্তি ও বিরাট শক্তি কৃষক ও শ্রমিকগণ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর, এই জন্যে নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকগণ তাদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করবে।

গণবাণী : ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৬

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ভারতে জনগণের গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পক্ষে আমাদের তিনটি প্রধান বাধা রয়েছে। যথা :—বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ, (২) দেশীয় ধনিকের শোষণ ও (৩) জমিদারের শোষণ ও অত্যাচার। যতক্ষণ না বৃটিশ শোষণের অবসান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই বলতে পারা যাবে না যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। শোষণবাদ যেখানে আছে স্বাধীনতা সেখানে কিছুতেই থাকতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা চীনের নাম উল্লেখ করতে পারি। স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও চীন আজ স্বাধীনতারই জন্যে লড়ছে। ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ একবার যেখানে ঢুকতে পারে সেখানকার স্বাধীনতা নামে মাত্র স্বাধীনতাতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক হিসাবে সে-দেশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবেও সে-দেশকে তার পদানত হয়ে পড়তে হয়। তারি জন্যে আজ চীনকে স্বাধীনতার সমরে প্রলিপ্ত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, অথচ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত তার সম্বন্ধ কাটবে না—এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

তারপরে দেশীয় ধনিক ও জমিদারগণের শোষণের কথা। জনগণের স্বাধীনতা লাভের জন্যে যেমনি বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের অবসান হওয়া অপরিহার্য আবশ্যক, ঠিক তেমনি আবশ্যক দেশীয় শোষকগণের শোষণের পরিসমাপ্তি হওয়া।

এ নিবন্ধে আমরা জমিদারী প্রথার কথাই বিশেষ করে বলব। সেই পুরাতন ফিউডালিজমের খানিকটা চিহ্ন আজো পর্যন্ত আমাদের জমিদারী প্রথাতে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান শোষণতন্ত্রই এ প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদেরকে যদি একথা মেনে নিতে হয় যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের উদ্দেশ্য ভারতে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, তা হলে এটাও অবধারিত যে জমিদারগণকে তার বিপক্ষে দাঁড়াতেই হবে। উৎপাদনের ক্রমোন্নত শক্তির দ্বারা ফিউডাল অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, আর এ ক্রমোন্নত শক্তির অবাধ উন্নতির দাবি হয়ে থাকে গণতান্ত্রিক শাসন। কাজেই গণতান্ত্রিক শাসনের সমর্থন করে জমিদারগণ কিছুতেই আপনাদের ধ্বংস

কামনা করতে পারে না। বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক শাসন ভারতের জনগণের পক্ষে এ জন্যে ক্ষতিকর যে এ শাসন জনগণের স্বাভাবিক বর্ধনে বাধা দিচ্ছে। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি অবাধে হতে থাকলে ভূম্যভিজাত সম্প্রদায়ের তাতে বিপদের সম্ভাবনা যেমন খুবই বেশী আর বৃটিশ শাসন বজায় থাকলে তেমনি তাদের নিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনাও ষোল আনা থাকে। এ কারণে জমিদারগণ আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পথে অন্তরায়। অবশ্য আমাদের জাতীয় সংগ্রাম যদি চরখা আর খদ্দরের প্রচার মাত্র হয়, তাতে ভূম্যভিজাত সম্প্রদায় কখনো আমাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে না।

জমিদার আর জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণে জনগণের আন্দোলন ভূম্যধিকারীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে না, আর পারে না বলেই ভূম্যধিকারীকে বৃটিশ শাসনের ভক্ত অনুরক্ত হতে হয়। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকারী আর ভূম্যধিকারীতে তফাৎ এই যে প্রথমোক্ত যে জিনিসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে চায়, ঠিক সে জিনিসকেই রক্ষা করতে চায় ভূম্যধিকারী। মোট কথা, বিদেশী শোষণবাদ যেরূপ আমাদের পায়ের বেড়ী হয়ে আছে, ঠিক তেমনিই বেড়ী হয়ে আছে জমিদারগণও। কাজেই জাতীয় আন্দোলনে সফলকাম হবার জন্যে আমাদেরকে 'জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ' দাবী করতেই হবে।

ভারতবর্ষে ভূম্যভিজাত সম্প্রদায় বৃটিশ শোষণতন্ত্র সংরক্ষণের স্তম্ভস্বরূপ হয়ে আছে। এদের কাছ থেকে সর্ববিধ সাহায্য পেয়ে থাকে বলেই ভূম্যধিকারিত্বকে শোষণতন্ত্র আজো বাঁচিয়ে রেখেছে। তা না হলে এ প্রথাকে রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন বৃটিশ শোষণতন্ত্রের ছিল না। জমিদারের মধ্যবর্তিতায় গবর্নমেণ্ট যে রাজস্ব পেয়ে থাকে জমিদার মাঝে না থাকলে তার চেয়ে অনেক বেশী পেতে পারত। বাংলা দেশে ভূমিকরের পরিমাণ এষ্টিমেট করা হয়েছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউন্ড, অথচ গবর্নমেন্টের এস্টিমেটের পরিমাণ ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড মাত্র। এ সত্ত্বেও যে শোষণতান্ত্রিক শাসন ভূম্যধিকারিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার কারণ এই যে ভূম্যধিকারীরা শোষণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে রাখবার জন্যে সর্ববিধ চেষ্টা করছে। কাজেই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যদি আমরা জমিদারী প্রথাকে ধ্বংস করার চেষ্টা না করি তাহলে বুঝতে হবে যে ইম্পিরিয়েলিজমের হাত থেকেও আমরা মুক্ত হতে চাইনে। ইম্পিরিয়েলিজমের বিরুদ্ধে বলা আর ভূম্যধিকারিত্বের বিরুদ্ধে কিছু

না বলার মতো ধাপ্পাবাজি আর কিছুই হতে পারে না। কারণ দুটো প্রথার মধ্যে যখন যোগ রয়েছে তখন একটিকে সমর্থন করতে যাওয়ার মানেই হচ্ছে দুটোকেই সমর্থন করা।

ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অত্যন্ত বেশী মাত্রায় জমিদারগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আছে। কংগ্রেস নেতৃগণের অধিকাংশই জমিদার। গৌহাটি কংগ্রেসে নেতৃগণ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত জমিদারের পক্ষ সমর্থন করেছেন তাতে বোঝা যায় যে কংগ্রেস আন্দোলন সর্বতোভাবে জমিদারের দ্বারা চালিত না হলেও জমিদারেরই জন্যে চালিত হয়ে থাকে।

জমিদার সম্প্রদায় নিতান্তই পরাশ্রিত সম্প্রদায়। কৃষকদের পরিশ্রমে ভাগ বসাবার কোনো অধিকারই তাদের নেই। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে কৃষক সম্প্রদায়কে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হচ্ছে, আর বে-রোজগারের কড়ির দ্বারা জমিদার ভোগ-বিলাসে ডুবে আছে। আমাদের সমাজদেহের এ পরগাছাগুলোকে একান্তই তুলে ফেলা চাই। তা না হলে সমাজ কখনো মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না।

দেশের নানা জায়গায় জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আজকাল হচ্ছে বটে, কিন্তু, এ আন্দোলন কৃষক আন্দোলন মোটেই নয়। অধিকাংশ স্থলেই তালুকদার ও জোতদারগণ এ আন্দোলন চালাচ্ছে। তারা জমিদারের অধিকার খর্ব করে নিজেদের অধিকার বাড়াতে চায়। কৃষকদের ভাল হ'ক, কৃষকরা তাদের শ্রমের মূল্যটা বুঝে নিক, জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা তা মোটেই চায় না। এ-সব আন্দোলন কোথাও কৃষক আন্দোলন নামে পরিচিতও নয়। প্রজা আন্দোলন বা রায়ত আন্দোলন নামেই এ-সব পরিচিত। প্রজা বা রায়ত যে হবে তাকে যে কৃষকও হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। জমিদারের নীচে যাদের স্বত্ব রয়েছে তাদেরকে প্রজা, রায়ত, জোতদার ও তালুকদার প্রভৃতি সবই বলা যেতে পারে। সত্যকারের কৃষকের সহিত যে জমিদারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ একেবারেই নেই এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না, কিন্তু, বেশীর ভাগ জায়গায় কৃষকদিগকে বোঝাপড়া করতে হয় তালুকদার ও জোতদার প্রভৃতির সাথে। এ জোতদার ও তালুকদারগণের নিকট কৃষকের ভূমি কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। তারা নানা ভাবে কৃষকদিগকে শোষণ করে থাকে। অনেক জায়গায় তাদের আয় বড় বড় জমিদারের আয়েরই সমান। জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যেয়ে আমরা যে জোতদার ও তালুকদার প্রভৃতির শোষণকে সমর্থন করব, তা কিছুতেই হতে পারে না। বে-রোজগারের মাল জমিদাররা যেমন ভোগ করে থাকে, ঠিক তেমনি ভোগ করে থাকে

এ শ্রেণীর জোতদার ও তালকুদারগণ। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ বলতে আমরা জমিদারের জমিদারীকে যেমন মনে করেছি, ঠিক তেমন জোতদার ও তালকুদারের ভূমির কেন্দ্রীভূত-করণকেও মনে করেছি।

সরকার ও কৃষকের মধ্যে কোনো মধ্যস্বত্ববান থাকবে না। আমরা চাই ভূমি সোজাসুজি কৃষককেই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। ভূমির মালিক হবে একমাত্র কৃষক, আর কেউ নয়।

যে সকল প্রথা বহুকাল থেকে চলে এসেছে সে সকল যে চিরকালই চলবে তার কোনো মানে নেই। কৃষকগণ, আমাদের সকলের খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদকগণ, নানা দিক থেকে নানা ভাবে শোষিত হয়ে একেবারে সারশূন্য হয়ে পড়েছে। ভূমি যাদের কবলে রয়েছে তারা যে শুধু অতিরিক্ত কর ও নজর ইত্যাদি আদায় করে কৃষকদের শোষণ করে থাকে তা নয়, কৃষকদের নিকটে সুদের ওপরে টাকা লগ্নিও অধিকাংশ জায়গায় তারাই করে থাকে। এ সকল অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্যে দেশের সর্বত্র কৃষক-সঙ্ঘসমূহ স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রজা আন্দোলন ও রায়ত আন্দোলন প্রভৃতি সত্যকারের কৃষক আন্দোলন নয়। সত্যকারের কৃষক আন্দোলন কৃষকরাই চালাবে, যারা কৃষকদের শোষণ করে থাকে তারা নয়।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের তরফ থেকে 'গ্রামে ফিরে যাওয়া' ও 'গ্রামের পুনর্গঠন করা' প্রভৃতি কথা উঠেছে। কিন্তু, এ-সবের দ্বারা কৃষকদের মূল অভিযোগগুলোর কোনো প্রতিকার তাঁরা করতে একটুকুও চেষ্টা করেননি। ভূমির বহুধাবিভক্ত-করণ ও তাতে কৃষকের সংখ্যাধিক্য, উৎপাদনের সেই পুরাতন প্রথা, ঋণ এবং ট্যাক্স ও করভার এ-সবই হচ্ছে কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণ। 'গ্রামে ফিরে যাওয়া' ও 'গ্রামের পুনর্গঠন'কারীর দল এ-সবের প্রতিকার কিসে হতে পারে সেদিকে লক্ষ্যও করে দেখেননি। কলকব্জার প্রতিষ্ঠা হয়ে যখন হস্তশিল্প একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এই হিতৈষীর দল চান হস্তশিল্পের প্রবর্তন করতে। যে পঞ্চায়েতি প্রথা অকেজো হয়ে আপনা হতে লুপ্ত হয়ে গেছে এ'রা চান সে-প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে। অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা অতিরিক্ত মাত্রায় শোষিত হয়ে শ্রমের পূর্ণ মূল্য পাওয়া যখন কৃষকদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে তখন এ'রা তাদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা করেছেন কিনা চরকা আর খদ্দরের, যার কোনো অর্থনীতিক ভিত্তিই নেই! মোট কথা, যে সময়ে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ সুবিধা কৃষকগণ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার

প্রয়োজন সে সময়ে কৃষকদের এ হিতৈষী বন্ধুগণ চান তাদেরকে আরো পাঁচশ' বছর পেছনে ঠেলে দিতে।

কৃষকদের মধ্যে সমস্বার্থ-সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনের জন্যে কৃষক-সঙ্ঘসমূহ গড়ে তুলতেই হবে। নিম্ন মধ্যশ্রেণী দরিদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাঁরা গ্রামে ফিরে যেতে চান তাঁদেরকে এ জন্যেই যেতে হবে। কিন্তু দয়ার শরীর নিয়ে কৃষক-হিতৈষী সেজে গ্রামে কৃষক সংগঠন করার জন্যে তাঁদের গেলে চলবে না। তাঁরা যদি সত্যিই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সৈন্য হন তাঁদেরকে সে-সংগ্রামেরই প্রয়োজনে কৃষক-সঙ্ঘসমূহ গঠন করতে হবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, স্বাধীনতা লাভের জন্যে কৃষক সংগঠন করে তাদেরকে তাদের দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে সচেতন করা একান্তই প্রয়োজন। গ্রামে যেয়ে কৃষকদের দু'টো হিতকথা শুনিয়ে যাঁরা কৃষকদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবেন মনে করেন তাঁদের গ্রামে না যাওয়াই ভাল।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিক মুক্তির জন্যে অনেক শোষণ প্রথার যেমন উচ্ছেদ সাধন করা উচিত তেমনি উচিত সকল প্রকার জমিদারী প্রথারও উচ্ছেদ সাধন করা। কৃষক-সঙ্ঘসমূহ গঠন করার সময় একথাই সকলের আগে মনে করে নিতে হবে। 'ভূমির মালিক কৃষক' একথাই হওয়া উচিত আমাদের সংগ্রামের ধ্বনি।

ভারতের কৃষকগণ তাদের মুক্তি-সমরে জয়যুক্ত হ'ক! আর যারা বে-রোজগারের কড়ি ভোগ করে থাকে তারা নিপাত যাক!!

গণবাণী: ২১শে এপ্রিল, ১৯২৭

অর্থনীতিক অসন্তোষ

বাংলা দেশের নানা স্থানে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বেধে উঠেছে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থনীতিক অসন্তোষের ওপরে। আমরা একাধিকবার একথা বলেছি এবং এখনো আমাদের মতের পরিবর্তন এতটুকুও হয়নি। কিন্তু আমাদের ইংরেজী সহযোগী 'ফরওয়ার্ড' একথা সোজাসুজি কিছুতেই মানতে রাজী নন। ২৩শে এপ্রিলের 'ফরওয়ার্ড'-এ 'পূর্ববঙ্গের অবস্থা'র ওপরে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে যদিও জমিদার ও মহাজনের অধিকাংশই হিন্দু, আর কৃষক অধিকাংশই মুসলমান, তথাপি বিরোধটা সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতিক কারণে ঘটেনি। "অর্থনীতিক কারণে ঘটলে মুসলমান কৃষকরা মুসলমান জমিদারের বাড়ি-ঘরও আক্রমণ করত। কিন্তু, তা করেছে বলে কোনো সংবাদ আজো পর্যন্ত 'ফরওয়ার্ড' পাননি। এই গৃহীত বাক্য হতে 'ফরওয়ার্ড' সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বার্থপর লোকেরা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টির জন্যেই অর্থনীতিক অভিযোগকে উত্তেজিত করছে ও তার সুযোগ নিচ্ছে। মতলববাজ লোকেরা মতলব সিদ্ধির জন্যে যা খুশী করুক না কেন, অর্থনীতিক অভিযোগ যে রয়েছে একথা সহযোগী একটুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

অভিযোগ আছে, অথচ অসন্তোষ নেই, এমন কথা আমরা কখনো শুনিনি। অভিযোগের সাথে সাথে অসন্তোষও ফুটে ওঠে, কিন্তু, কোথায় কি ভাবে যে ওঠে তা কেউ বলতে পারে না।

'ফরওয়ার্ড'-এর লেখা পড়ে আমরা যতটা বুঝতে পেরেছি তাতে তার মানে এই হয় যে অর্থনীতিক অভিযোগটা মুসলমান কৃষকদের আছে সত্য, কিন্তু অসন্তোষটা ছিল না। এটা কতকগুলি মতলববাজ লোক উস্কিয়ে তুলেছে মাত্র। একথা আমরা মেনে নিতে রাজী আছি যে মতলববাজ লোকেরা মতলবের সিদ্ধির জন্যে বাংলার মুসলমান কৃষকদিগকে তাদের অসন্তোষের (কেবলমাত্র অভিযোগের নয়) সুবিধা নিয়ে বিপথে চালিত করছে। কিন্তু, সে দোষটা কার? 'ফরওয়ার্ড' যাঁদের কাগজ তাঁরা তো ত্যাগ, দেশভক্তি, জাতিত্ব (nationalism) ও সর্বোপরি নেতৃত্বের ঠিকা

নিয়ে বসে আছেন। তাঁরা কেন এতকাল কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি? তাই যদি তাঁরা করতেন তা হলে আজ যত সব মতলববাজ লোক এসে কৃষকদের বিপথে চালিত করতে পারত কি?

বাংলা দেশের কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান. আর যারা তাদের সাক্ষাৎ ভাবে শোষণ করে থাকে তাদের অধিকাংশই হিন্দু। শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শোষিত হয় বলে স্বভাবতই একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শ্রেণী-সংগ্রামে। পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে যে ব্যাপার ঘটেছে বা ঘটছে তা-ও শ্রেণী-সংগ্রাম বটে, কিন্তু, বিপথে চালিত শ্রেণী-সংগ্রাম। এটা খুবই সত্য যে নীচমনা মতলববাজ লোকেরা অসন্তুষ্ট মুসলমান কৃষকদের মধ্যে একথা প্রচার করে থাকবে যে হিন্দুরা হিন্দু বলেই, আরো সোজা কথায় বলতে গেলে কেবলমাত্র ধর্মগত বিদ্বেষের বশে মুসলমান কৃষকদের শোষণ করে থাকে। শোষকের সংখ্যা এত বেশী মাত্রায় হিন্দু যে সরলমনা মুসলমান কৃষকদের পক্ষে এমন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়।

মোটের ওপরে পাবনা, বরিশাল ও মাদারীপুর যেখানকার কথাই হ'ক না কেন—সর্বত্রই ব্যাপার হচ্ছে কৃষক-উত্থানের। তাদের চালাবার জন্যে সত্যকারের নেতৃত্ব পাচ্ছে না বলেই তারা নিতান্ত ভুল পথে ছুটেছে। অসন্তোষের আগুন জ্বলে জ্বলে বাষ্প তৈরী হয়েছে, জাহাজও চলেছে, কিন্তু প্রকৃত কর্ণধারের অভাবে ঠিক দিকে চলেনি। কৃষকদের এই শ্রেণী-সংগ্রামকে সত্যকারের পথে পরিচালিত করার জন্যে আজ লোকের দরকার। কিন্তু কোথায় সে লোক?

বলেছি বাংলা দেশের কৃষক অধিকাংশই মুসলমান, আর হিন্দু কৃষক যা আছে তারাও সকলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। জাতীয় আন্দোলনের অংশ যে হিন্দুরা নিয়েছেন, তা কংগ্রেসী দলই হ'ক, বা বিপ্লবী দলই হ'ক—তাঁদের শতকরা নিরানব্বুই জনই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। এঁদের মধ্যে যাঁরা অবস্থাপন্ন লোক তাঁদের স্বার্থ কৃষকদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, কেননা তাঁরা কৃষকদের শোষক। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সমস্বার্থ-সংযোগ কখনো স্থাপিত হতে পারে না। আর যাঁরা অবস্থাপন্ন লোক নন অথচ শিক্ষিত, তাঁরা কৃষকদিগকে বুদ্ধি যুগিয়ে, জ্ঞান বিতরণ করে তাঁদের পরিচালক হতে পারেন। কিন্তু, যদিও তাঁরা সাধারণতঃ আস্থাবানদের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকেন, তথাপি তাঁরা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর বলে তাঁদের সমবেদনাটা হয়ে থাকে উচ্চশ্রেণীর অবস্থাবান

লোকদেরই প্রতি। কৃষকদের প্রতি তাঁদের প্রাণের দরদ নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই, তাঁরাও কৃষক-উত্থানের সত্যকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁরা কত যুগের পুরাতন বুর্জোয়া বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ধকারে ঘুরে মরছেন,—কিছুতেই বোঝেন না যে এটা কৃষক ও শ্রমিক উত্থানের যুগ। তাঁরা মনে করেন বীরের আদর্শটাই সবকিছু, আর গণিতের অংকটা কিছুই নয়। তাই ঐতিহাসিক ভাবে যে জিনিস বাতিল হয়ে গেছে, যা এ যুগের ব্যাপার নয়, তা নিয়েই তাঁরা মেতে ওঠেন। বাড়ির কাছের চীন আজ চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়ে দিচ্ছে তারও কোনো মূল্য নেই তাঁদের কাছে।

নিম্ন মধ্যশ্রেণীর বা সাধারণ কথায় ভদ্রলোক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা আজো কৃষক ও শ্রমিকদিগকে ছোটলোক মনে করে থাকেন, অথচ তাঁরা নিজেরা যে সমাজের পরগাছা হয়ে উঠেছেন একথাটা কিছুতেই ভেবে দেখতে চান না।

অর্থনীতিক শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে আজ বাংলায় কৃষক-উত্থানের সূচনা দেখা দিয়েছে, কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে এ উত্থান ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে না। কৃষকরা সবকিছু উৎপন্ন করেও তাদের শ্রমের ফলে বঞ্চিত হচ্ছে। অত্যাচার আর নির্যাতনে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আছে। তাদের এ অর্থনীতিক অসন্তোষকে যারা আজ মিথ্যা ধর্মের খোলস পরিয়ে দিচ্ছে তারা মানুষ নয়, পশু। গাল আমরা দিচ্ছি বটে, কিন্তু যারা কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামকে বিপথে চালিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, ঠিক বিপথে চালানোই তাদের কাজ। জমিদার আর মহাজন যেমন কৃষকের শোষক, ঠিক তেমনি শোষক বটে এই মিথ্যা ধর্মাচারীর দলও। কৃষকের অর্থনীতিক অসন্তোষকে আজ যারা ভিন্নরূপে পরিস্ফুট করতে চাইছে তারা যে কৃষকের পরম শত্রু একথাটা তাদেরকে বোঝাতে হবে। শোষক শোষকই বটে, হিন্দু কিংবা মুসলমান সে নয়। জমিদার আর মহাজনের বিচার করতে হবে জমিদার আর মহাজন হিসাবে, হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে নয়। মুসলমান জমিদার কিংবা মহাজন কিছু মুসলমান কৃষকদিগকে কম করে শোষণ করে না। পক্ষান্তরে হিন্দু জমিদার ও মহাজনও নমশূদ্র প্রভৃতি হিন্দু কৃষকদিগকে শোষণ করতে এতটুকু কসুর করে না। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে একটা মোকদ্দমার বিচার হয়ে গেছে। মুসলমান কৃষকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বলে মুসলমান জমিদার গুড়া মিঞা তাতে তিন

মাসের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ-সব ব্যাপারগুলো ভাল করে মুসলমান কৃষকদিগকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। গজনবী মিনিস্টার হবেন কি আবদুর রহিম হবেন এই নিয়ে মুসলমান শিক্ষিত যুবকগণ মাথা ঘামিয়ে মরছেন, ওদিকে মুসলমান কৃষকগণের স্বার্থের কত যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাঁরা চেয়েও দেখছেন না। মুসলমানদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, বৈদ্যত্ব বা কায়স্থত্ব যখন নেই তখন শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণের মধ্যে কৃষক সন্তানই যে বেশী তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। জমিদার বা মহাজনের সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যে খুবই নগণ্য। এ সত্ত্বেও মুসলমান যুবকদের এদিকে এতটুকুও লক্ষ্য নেই। ভুল পথে চালিত হয়ে বাংলার কৃষক-উত্থান যদি পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে তা হলে অনেক ক্ষতি দেশের।

শ্রেণী-সংগ্রাম কিছু আমাদের ঘরের তৈরী জিনিস নয়। শোষক আর শোষিত যেখানে আছে শ্রেণী-সংগ্রামও সেখানে আছে। পাবনা আর বরিশালে এ সংগ্রাম যে আকারে প্রকাশ পেয়েছে, চেষ্টা করলে সে আকারটা পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু শোষণ যতদিন বর্তমান আছে ততদিন মূল শ্রেণী-সংগ্রাম নষ্ট হবে না কিছুতেই। এ সংগ্রামে যদিও নমশূদ্র প্রভৃতি শোষিত শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানদের সাথে সমস্বার্থ-সংযোগে একীভূত হবে তথাপি হিন্দু শোষক আর মুসলিম শোষিতের সংখ্যা খুব বেশী বলে স্বার্থপর লোকেরা ভবিষ্যতেও চেষ্টা করবে একে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলে প্রমাণিত করতে। আমাদের দেশের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণের সম্মুখে একটি কঠোর পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়েছে। জানি না এ পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারবেন কিনা।

'ফরওয়ার্ড" যদিও স্বীকার করেছেন যে অর্থনীতিক অভিযোগের সুযোগ নিয়ে মতলববাজ লোকেরা কৃষকদিগকে উত্তেজিত করেছে, তথাপি আবার একথাও বলেছেন যে অর্থনীতিক কারণে বিরোধ ঘটলে মুসলমান কৃষকগণ মুসলমান জমিদার মহাজনের বাড়িও লুণ্ঠন করত। আমাদের মনে হয় 'ফরওয়ার্ড' নিজেই নিজের কথার খণ্ডন করেছেন। একথা বলার ঠিক পর মুহূর্তেই 'ফরওয়ার্ড" যখন অর্থনীতিক অভিযোগের, সুতরাং অসন্তোষেরও কথা মেনে নিচ্ছেন তখন আর এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। তবে এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে কৃষকরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যখন উত্থিত হয় তখন হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য তারা করে না। চৌরি-চৌরার হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ যখন থানায় আগুন

ধরিয়ে থানার লোকগুলিকে পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল তখন তারা চিন্তা করে দেখেনি যে থানার কর্মচারীরা হিন্দু না মুসলমান। তারা তখন পুলিশকেই দেখেছিল তাদের সম্মুখে। মালাবারের কৃষক-বিদ্রোহ যখন ঘটেছিল তখন সেখানে যে সামান্য দু'একজন মুসলমান জমিদার ছিল তারাও রেহাই পায়নি মোপলা কৃষকদের হাত থেকে।

মানুষ নিপীড়িত হয়ে নিপীড়নকারীর বিরুদ্ধে যদি উত্থিত হয়, যদি নিপীড়নকারীর ওপরে সে নিপীড়ন করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে নিপীড়নের ধরন যে কি হবে সে-কথা কেউ বলতে পারে না। এমন কি, যে নির্যাতিত মানুষ নির্যাতনেরই দ্বারা প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হবে সেও পর্যন্ত আগে থেকে বলতে পারবে না কি ভাবে সে নির্যাতন করবে।

কৃষকরা আমাদের সকলেরই অন্নদাতা। জমির মালিক তাদের করে দেওয়া হ'ক, মহাজনের অত্যাচার হতে তাদের বাঁচানো হ'ক এবং সর্বোপরি তাদের সুশিক্ষা দেওয়া হ'ক, তা হলে সকল গোলমালের অবসান হবে।

গণবাণী : ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৭

কৃষক সংগঠন

গত সপ্তাহের গণবাণীতে আমরা জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের বিষয় আলোচনা করেছি। আমাদের পাঠকগণ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে জমিদার বলতে আমরা যে-কোনো প্রকারের বড় ভূমধ্যাধিকারীকেই মনে করছি। কেবলমাত্র বড় জমিদারের উচ্ছেদ আমরা চাইনে। বড় তালুকদার, বড় জোতদার, বড় গাঁতিদার, বড় জাগীরদার, বড় সর্দার, এক কথায় সকল প্রকারের ভূম্যভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনই আমাদের লক্ষ্য। কেন যে এ লক্ষ্য আমরা স্থির করেছি নিতান্ত সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেই যে কেউ তা অনায়াসে বুঝে নিতে পারবেন। ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় সে ফসল খেয়ে আমরা সকলেই জীবন ধারণ করি একথা সত্য বটে, কিন্তু, একথাও খুব সত্য যে আমাদের সকলের সহিত ভূমির কোনো সম্বন্ধ নেই। পরিশ্রম করে ভূমি থেকে যে ফসল উৎপাদন করে সে-ই প্রকৃত ভূমির মালিক। যে জমিদার কখনো কোনো পরিশ্রম করে না, ভূমির কোনো খোঁজখবর রাখে না, সে কেন মিছামিছি ভূমির মালিক হতে যাবে, আর কেনই বা সে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নেবে? লক্ষ লক্ষ কৃষকের নিকটে দু'তিন বিঘার বেশী জমি নেই, আর ওদিকে অল্পসংখ্যক জমিদার দেশের অর্ধেকেরও বেশীর ভাগের মালিক হয়ে বসে আছে। কিন্তু, কিসের খাতিরে? এই জমিদাররা পৃথিবীর যত প্রকারের ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত করবে, পাপের স্রোতে ভেসে যাবে, হাজার রকমের ভ্রষ্টতার সৃষ্টি করবে, আর কৃষকরা কিনা বারোমাস খেটে খেটে তাদের এ-সব কাজের জন্যে উপকরণ যোগাবে! এতটুকুও বিচারবুদ্ধি যার আছে সে কখনো এমন অদ্ভুত নিয়মের সমর্থন করতে পারে না।

জমিদার বলছে সে নিজে কিংবা তার পূর্বপুরুষ অর্থ দিয়ে জমিদারী কিনেছে বলেই জমির ওপরে তার অধিকার জন্মেছে। অর্থোপার্জনের জন্যে পরিশ্রম করা দরকার একথা সকলেই জানেন। কিন্তু জমিদার যখন কখনো কোনো পরিশ্রম করে না তখন অর্থ সে পেল কোথায়? আর পরিশ্রমও সে নিজে কিংবা তার পূর্বপুরুষ যদি জমিদারী লাভের পূর্বে করে থাকে তা হলে সেই বা অগাধ ধনের অধিকারী কেন হ'ল, আর তার মতো অপর শত

শত পরিশ্রমী লোক হ'ল না কেন ? শত সহস্র লোকের শ্রমের ফল বিলুণ্ঠন না করে, মুখের গ্রাস কেড়ে না নিয়ে, কেউই কখনো ধনী হতে পারেনি, পারে না। পল্লীগ্রামে যাঁরা বাস করেন তাঁরা নিশ্চতই দেখেছেন যে গ্রামের এক ঘর লোক যখন বড় হয়ে উঠে ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে দশ ঘর লোক নিঃস্ব হয়ে যায়। অর্থাৎ দশটি পরিবারের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করেই একটি পরিবার বড় হতে পারে। এ লুণ্ঠন সুদের ওপরে টাকা কর্জ দিয়ে ও অন্য নানা উপায়ে করে থাকে। সুতরাং যে উপায়েই লাভ করুক না কেন, জমিতে কোনো শ্রেণীর ভূম্যধিকারীরই কোনো অধিকার নেই। কৃষকের পক্ষে বড় জমিদার যা, বড় তালুকদার, বড় জোতদার ও বড় গাঁতিদার প্রভৃতিও ঠিক তাই। সকলেই অলস-অকর্মণ্য জীব, সকলেই শোষক।

বড় জমিদারী, বড় তালুকদারী, বড় জোতদারী ও বড় গাঁতিদারী প্রভৃতির অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ-সব তুলে দিয়ে যে সব কৃষকের জমি নেই, কিংবা যাদের নিকটে অতি সামান্যমাত্র জমি আছে তাদেরকেই জমি বেঁটে দিতে হবে। এ-সব বণ্টনের ভার দিতে হবে কৃষকদের গ্রাম্য সংগঠনের ওপরে।

জমিদার প্রভৃতির কাছ থেকে জমি বাজেয়াফ্‌ত করে নিলে তার জন্যে তাদেরকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এই ক্ষতিপূরণ করতে গেলে কৃষকদের অবস্থা যেই কে সেই থেকে যাবে, শোচনীয়তর হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কেননা, ক্ষতিপূরণ যদি করতে হয় সরকারকেই করতে হবে। কিন্তু, সরকার টাকা পাবে কোথায় ? এই টাকা কৃষকদের কাছ থেকে নিয়েই তবে জমিদার প্রভৃতিকে সরকারের দিতে হবে। এতে জমিদার প্রভৃতির হবে লাভ, আর কৃষকদের ওপরে হবে জুলুম। কাজেই, ভূমির কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রথাকে উচ্ছেদ করতে হবে। অথচ এই উচ্ছেদ করার জন্যে যারা ভূমি কেন্দ্রীভূত করেছে তাদেরকে কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না।

কেউ কেউ বলবেন, এতকালের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে যদি কোনো ক্ষতিপূরণ করা না হয় তা হলে তো বড় অবিচার করা হবে তাদের ওপরে। কিন্তু, কৃষকদের ওপরে কি সুবিচার করা হচ্ছে এখন ? জমিদাররা কৃষকদের শোষণ করছে, অথচ এরূপ শোষণ করার কোনো অধিকারই নেই তাঁদের, এ অবস্থায় জমিদার প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করে কৃষকদের ভূমি বেঁটে দিলে তাদেরকে তাদের বঞ্চিত অধিকার দেওয়া হবে মাত্র। এটা বিশুদ্ধ অর্থনীতিক প্রশ্ন। সকল ফসলের উৎপাদক কৃষকসম্প্রদায়ের ওপরে সুবিচার করতে হলে যারা অনধিকারে ভূমির ওপরে প্রভুত্ব করছে তাদেরকে বঞ্চিত করতেই হবে।

জমিদারদের ছাড়া আরো অনেকেরই অত্যাচার কৃষকদের ওপরে হয়ে থাকে। সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ীর দালাল, উকিল ও মোল্লা-পুরোহিত— এরা সকলেই কৃষকদের শোষক। এদের সকলের একই উদ্দেশ্য—কৃষকদিগকে তাদের শ্রমের ফল হতে বঞ্চিত করা। এ সকলেরই শোষণ ও অত্যাচার হতে কৃষকদের বাঁচাতে হলে তাদের সংহত ও সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের দ্বারা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়ে সুদখোর মহাজনদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে হবে। সুদের হার শতকরা বার্ষিক সাত টাকার বেশী কিছুতেই ধার্য হতে দেওয়া হবে না।

কৃষকেরা দরিদ্র একথা সকলেই জানেন। তারা ঋণভারে জর্জরিত একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। অতিরিক্ত মাত্রায় শোষণই এর একমাত্র কারণ। সেবার দ্বারা, পল্লী-সংস্কারের দ্বারা কৃষকের কোনো দুঃখই ঘোচাতে কেউ পারবে না। পল্লীর কোনো সংস্কারই হতে পারে না যে পর্যন্ত না পল্লীর পচা অর্থনীতিক প্রথার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। কত যুগ-যুগান্তের অনাহার, অর্ধাহার ও অনুপযোগী আহারের ফলে কৃষকের জীবনীশক্তি কমে গেছে, তার শরীর সর্ববিধ ব্যাধির মন্দির হয়ে পড়েছে, তুমি আমি সেবার দ্বারা তার কি উপকার করতে পারি?

দু'টো পুকুর খুদে দিয়ে, তিনটে চিকিৎসালয় স্থাপন করে কেউই কৃষকের উপকার করতে পারবে না। কৃষকদিগকে শ্রেণীগত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। পল্লীতে যত শ্রেণীর লোক বাস করে তাদের সকলের স্বার্থ কিছু এক নয়। যে পল্লীতে কৃষকরা বাস করে সে পল্লীতে শোষক মহাজন আদিও বাস করে থাকে। কাজেই, পল্লীর সকলকে নিয়ে কোনো সঙ্ঘ গঠিত হতে পারে না। কৃষক-সঙ্ঘ সংগঠন করতে হবে কেবলমাত্র কৃষকদের নিয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তির ওপরে। যতই অশিক্ষিত নিরক্ষর তারা হ'ক না কেন, খাওয়া-পরার ব্যাপার তারা খুব সহজেই বুঝতে পারবে। শোষিতকে শ্রেণীজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়।

শোষিত কৃষককে জীবনের সন্ধান দিতে হবে। খাওয়া-পরা সম্বন্ধে তাকে পরিপূর্ণরূপে সজাগ করে তোলা একান্তই আবশ্যক। ভাল খেতে, ভাল পরতে এবং ভাল ঘরে বাস করতে কৃষককে শেখানো চাই। এ-সব সত্যকারের অভাব কৃষকরা যখন অনুভব করতে শিখবে তখনি তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে যত সব সামাজিক ও অর্থনীতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে।

সংগঠিত কৃষক যখন ভূমির মালিক হতে চাইবে, যখন সে সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে মাথা তুলবে, তখন বর্তমান প্রণালীর গবর্নমেণ্টের সহিতও

তাদের সংঘর্ষ বাধবে। কেননা, যারা বে-রোজগারের ধন খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক গবর্নমেন্ট তাদেরই সমর্থক। বৃটিশ পার্লামেন্টে যে দলের সংখ্যাধিক্য হয়, সে দলেরই শোষণের জন্যে বৃটিশের অধীন দেশগুলো শাসিত হয়। শোষণকারী ধনিক-বণিকেরই জোর এখন পার্লামেন্টে বেশী। তারা এদেশের শোষণকারীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেই এদেশকে শোষণ করে থাকে। কাজেই, কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম একদিক থেকে যেমন সামাজিক ও অর্থনীতিক মুক্তির সংগ্রাম হবে, অন্যদিক থেকে রাষ্ট্রনীতিক মুক্তিরও সংগ্রাম তেমনি তা হবে।

যে সকল শিক্ষিত যুবক দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে চাইছেন তাঁদের উচিত গ্রামে গ্রামে কৃষক-সঙ্ঘসমূহ গঠন করা। সঙ্ঘগুলির মূলমন্ত্র হবে ঃ 'ভূমির মালিক কৃষক আর অন্নের মালিক শ্রমিক'।

মুক্তি-সংগ্রামে কৃষকদের জয় হোক!

কৃষকদের যারা শোষণকারী তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক!!

গণবাণী : ৫ই মে, ১৯২৭

"আসল কথাটা কি ?"

ওপরের লেখা শিরোনামা দিয়ে শ্রীবটুক ভৈরব ৬ই মে তারিখে 'আত্মশক্তি'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ২৮শে এপ্রিল তারিখের 'গণবাণী'তে 'অর্থনীতিক অসন্তোষ' নাম দিয়ে আমরা যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলাম শ্রীবটুক ভৈরবের প্রবন্ধটি তারি সম্বধে লেখা। পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিয়ে ২৩শে এপ্রিলের 'ফরওয়ার্ড" একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করেই আমাদের 'অর্থনীতিক অসন্তোষ' শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। শ্রীবটুক ভৈরব আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন "আসল কথাটা কি ?" এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাদের প্রথমেই বলতে হবে, আসল কথা এই হচ্ছে যে শ্রীবটুক ভৈরব মশায় আমাদের প্রবন্ধটি ভাল করে পড়েননি। এতটুকুও নিরপেক্ষ মন নিয়ে তিনি যদি আমাদের প্রবন্ধটি পড়তেন তা হলে তাঁকে ছদ্মনামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কখনো জিজ্ঞাসা করতে হ'ত না যে আসল কথাটা কি ?

আমাদিগকে সাম্যবাদী বলে বটুকজী সার্টিফিকেট দিয়েছেন। হাঁ, আপনাকে সাম্যবাদী বলে পরিচয় দেবার ধৃষ্টতা এ অধম লেখকের আছে। যিনি কোনো লোককে সাম্যবাদী হওয়ার সার্টিফিকেট দিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই এটুকুও জানেন যে সাম্যবাদীরা কখনো কোনো বিশিষ্ট ধর্মের গণ্ডির ভিতরে দাঁড়িয়ে কোনো কিছুর বিচার করেন না। তাঁরা প্রত্যেক বস্তুরই বিচার বৈজ্ঞানিক ভাবে করেন এবং ধর্মের গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়েই করেন। কিন্তু, এখানেই আমাদের সহিত বটুকজীর একটুকু তফাত রয়েছে। তিনি দু'টো গণ্ডির ভিতরে আপনাকে আবদ্ধ করে রেখে তবে ব্যাপারটিকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে আপনাকে শুধু হিন্দুত্বের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রেখেছেন তা নয়, তাঁর ছদ্মনামের আবরণ ভেদ করে ব্রাহ্মণত্বর গন্ধও বেরুচ্ছে। হিন্দু শুধু তিনি নন, ব্রাহ্মণও বটেন। কাজেই আমাদের দেখার সহিত তাঁর দেখার তফাত হওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

তিনি লিখেছেন—"হিন্দু নেতারা নীরব—সরব হবার কোনো প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু এদিকে দেবদেবীর মন্দির আর স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার সমান বেগেই চলেছে। একটা নূতন থিওরি খাড়া না করলে আর মুখরক্ষা

হয় না। কাজেই আমাদের সাম্যবাদী সহযোগী গণবাণী একটা নূতন থিওরি নিয়ে আসরে নেমেছেন। তিনি বলেছেন—"বাংলা দেশের নানা স্থানে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বেধে উঠেছে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থনীতিক অসন্তোষের ওপরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবদেবীর মন্দির আর স্ত্রীলোকের ওপরে অত্যাচার চলেছে বলে 'গণবাণী'কে নূতন থিওরি কেনই বা খাড়া করতে হবে, আর কেনই বা খাড়া না করলে মুখরক্ষা হবে না একথাটার কোনো জওয়াব শ্রীবটুক ভৈরব মশায় দিতে পারেন কি? 'গণবাণী' সাম্যবাদীদের কাগজ নয়—'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর কাগজ। এ-দল যে প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে তা সাম্যবাদীদের প্রোগ্রাম নয়, একটা উন্নত জাতীয় প্রোগ্রাম মাত্র। অর্থাৎ অন্যান্য জাতীয় দলের প্রোগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রোগ্রাম তা নয়। যাক, আগেই বলেছি এ লেখক একজন সাম্যবাদী (কম্যুনিস্ট) বটে। শ্রীবটুক ভৈরব কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সাম্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও এ লেখক মুসলমানদের সকল অপকর্মের সমর্থন করতে সদাই ব্যস্ত থাকে এবং তারি জন্যে তাদের মন্দির আর স্ত্রীলোক নিয়ে উৎপাত করাকে সমর্থন করার জন্যেই অর্থনীতিক অসন্তোষের থিওরিকে খাড়া করেছে? ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকত্বের ব্যবসায় আমরা কখনো করিনি। আর কিছু দাবী করার আমাদের থাক বা না থাক, এটুকু দাবী করার অহংকার আমাদের আছে। শ্রীবটুক ভৈরব আদতে যে 'ফরওয়ার্ড'-এর হয়ে ওকালতি করতে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন সে 'ফরওয়ার্ড"কে সাম্প্রদায়িকত্ব মাঝে মাঝে অন্ধ করে দিয়ে থাকে। ২৩শে এপ্রিল তারিখের 'ফরওয়ার্ড"-এর লেখার উল্লেখ আমরা আমাদের 'অর্থনীতিক অসন্তোষ'-এ করেছি। ২২শে এপ্রিলের 'ফরওয়ার্ড" বরিশালে মুসলমানদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবার কথা ছেপেছিলেন, অবশ্য সংবাদ হিসাবে। যদি নিরপেক্ষ বিচার করার ক্ষমতা 'ফরওয়ার্ড"-এর থাকত তা হলে ২৩শে এপ্রিলের প্রবন্ধে 'ফরওয়ার্ড" নিশ্চয়ই সে-ব্যাপারটারও আলোচনা করতেন। গত বছরের কলকাতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথাও আমাদের মনে আছে। সে-সময়ে পরস্পরের প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার করার জন্যে স্বধর্মাবলম্বীকে উপদেশ দিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বদমায়েশরা বিজ্ঞাপনী সব প্রচার করেছিল। মুসলমানদের তরফ থেকে যে সকল বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল সেগুলি হাতে পড়লেই 'ফরওয়ার্ড" ছেপে দিতে এতটুকুও কসুর করতেন না। কিন্তু, সেরূপ বিজ্ঞাপন হিন্দুদের তরফ থেকে যেগুলি বণ্টিত হয়েছিল তার একখানিও 'ফরওয়ার্ড" কোনো দিনও ছাপেননি। অলবার্ট হলে হিন্দু

নাগরিকদের রক্ষার জন্যে যে সভা দাঙ্গার সময় হয়েছিল সে সভায় এক বাংলা বিজ্ঞাপন বণ্টিত হয়েছিল। তাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুসলমান মাত্রেরই ওপরে অত্যাচার করার জন্যে হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করা হয়েছিল। 'ফরওয়ার্ড'-এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও সে-বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পর্যন্ত কোনো উচ্চবাচ্য 'ফরওয়ার্ড' করেন নি। শ্রীবটুক ভৈরব দেখিয়ে দিতে পারেন কি যে সাম্প্রদায়িকত্বর দ্বারা এরূপ অন্ধ আমরা কখনো হয়েছি?

আমাদের বিদ্যে বেশী নেই। যেটুকু আছে সেটুকু যে পুঁথির সাহায্যেই আয়ত্ত করতে হয়েছে সে-কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না। শ্রীবটুক ভৈরব কি পুঁথি না পড়েই বিদ্যায়ত্ত করেছেন? হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ভিতর যে অর্থনীতিক অসন্তোষ মোটেই নেই, একথা শ্রীবটুক ভৈরব গায়ের জোরে অস্বীকার করতে পারেন, আমরা কিন্তু তা পারব না। আমাদের একটা বদভ্যাস এই যে, যে জিনিসটি যে ভাবে থাকে ঠিক সে ভাবেই আমরা তাকে দেখতে পারি, অন্য ভাবে পারিনে। দুই-এর সাথে দুই যোগ করলে আমাদের সাদা হিসাবে বরাবর চারই হয়ে থাকে, পাঁচ কখনো হয় না। ফ্রি প্রেস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি পাবনা থেকে এসে যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে পাঠিয়েছিলেন তা আর-সকল কাগজে যেমন ছাপা হয়েছিল, ঠিক তেমনি 'ফরওয়ার্ড'-এও ছাপা হয়েছিল। সে প্রতিনিধিও বলেছিলেন যে বিরোধের মূলে অর্থনীতিক অসন্তোষ রয়েছে। অর্থনীতিক অসন্তোষ যে শ্রেণী-সংগ্রামে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। বর্তমান হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যে শ্রেণী-সংগ্রাম, একথাও ঠিক তেমনি সত্য। আমরা আমাদের 'অর্থনীতিক অসন্তোষ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছি—"পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে যে ব্যাপার ঘটছে বা যা ঘটেছে তা-ও শ্রেণী-সংগ্রাম বটে, কিন্তু বিপথে চালিত শ্রেণী-সংগ্রাম"। কৃষকগণ অর্থনীতিক, রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও ধর্মগত ভাবে শোষিত হয়ে থাকে। তাদের সত্যকারের শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যাহত হচ্ছে এ ধর্মগত শোষণকারীদের দ্বারা। ধর্মের ভিতরে কতকগুলি মিথ্যা সংস্কারের সৃষ্টি করে যারা সরল জনসাধারণকে ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে ও পরকালের নামে শোষণ করে থাকে তারা আর আর শোষণকারীদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ঘৃণ্য জীব নয়। বর্তমান সময়ে বাংলা দেশের কৃষকগণের শ্রেণী-সংগ্রাম এ শ্রেণীর স্বার্থপর শোষণকারীদের দ্বারা বিপথে চালিত হচ্ছে। আমাদের আগেকার প্রবন্ধে একথা আমরা পরিষ্কাররূপে বলে দিয়েছি। তবুও বটুক ভৈরব মশায় ব্যস্ত হয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে এ-সব মোটেই শ্রেণী-সংগ্রাম

নয়। জগতের সর্বত্রই যদি শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে পারে তা হলে বাংলায় বা ভারতে চলবে না কেন? এর চেয়েও অধিকতর শোষিত দেশ জগতের আর কোথাও আছে কি?

আমরা একটা জিনিসের সত্যকারের মূর্তি সকলের চোখের সম্মুখে ধরে দিয়েছিলেম। পরিদৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে বেশী যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি। বটুক ভৈরব আমাদের কথা এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে ব্যাপারটা যদি শ্রেণী-সংগ্রাম হ'ত তা হলে ঝগড়া হ'ত মুসলমান প্রজা আর হিন্দু জমিদারের মধ্যে। কিন্তু, তা না হ'য়ে ঝগড়াটা হচ্ছে মুসলমান প্রজা আর হিন্দু প্রজার মধ্যে। কাজেই শ্রেণী-সংগ্রামের যুক্তিটা মোটেই টিকতে পারে না। যে যুক্তির দ্বারা বটুক ভৈরব আমাদের কথা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর সে যুক্তি আপনা থেকেই উড়ে যাচ্ছে। প্রজা শব্দটা বাংলা দেশে খুবই ব্যাপক। জমিদারের নীচে যার স্বত্ব আছে সেই প্রজা। এমন প্রজাও আছে যার বার্ষিক আয় অনেক বড় জমিদারের চেয়েও বেশী। দু'একজন প্রজা যে রাজা বা নওয়াব উপাধি পর্যন্ত পেয়েছে তা আমরা জানি। প্রজা হলেই যে সে শোষিতও হবে এমন কোনো কথা নেই। বাংলা দেশে অসংখ্য প্রজা আছে যারা উৎপাদক-শ্রেণীভুক্ত নয়। অর্থাৎ জমিদার প্রভৃতির ন্যায় বে-রোজগারের কড়ি ভোগ করে তারাও জীবনধারণ করে। একজন কৃষক প্রজাও হতে পারে, কিন্তু প্রজামাত্রই কৃষক নয়। কাজেই, বর্তমান বিরোধটা মুসলমান প্রজা আর হিন্দু প্রজার মধ্যে নয়। পরন্তু, মুসলমান কৃষক আর হিন্দু প্রজা ও জমিদারের মধ্যে। বটুক ভৈরব শ্রেণী-সংগ্রামটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়েছেন।

তারপরে, বরিশাল জেলার মুসলমান কৃষক আর মুসলমান জমিদার বা তালুকদারের মধ্যে যে বিরোধ নেই, এ খবরটি বটুক ভৈরবকে কে দিলে তা আমরা একবার জানতে পারি কি? বিরোধ যথেষ্টই আছে। মুসলমান জমিদার বা জোতদার-আদি যে মুসলমান কৃষকদিগকেও শোষণ করে থাকে একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর শোষণ যেখানে আছে বিরোধও সেখানে আছে। এটা নূতন থিওরি নয়, অনেক পুরাতন সত্য কথা। কিন্তু, বর্তমান সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিপত্তিতে আপাততঃ মুসলমান জমিদার আর কৃষকের সংগ্রামের কথাটা কেউ লিখবে না। নতুবা আমরা তো বরিশাল জিলার এমন মুসলমান জমিদারের কথা জানি যাকে মুসলমান কৃষকদের ভয়ে পৈতৃক বাসভবন ছেড়ে অন্যত্র পালাতে হয়েছে।

আমরা তো বলেইছি যে প‌ূর্ববঙ্গের কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রাম সত্যকারের নেতৃত্ব পায়নি। বটুক মশায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে আর্থিক বৈষম্যের ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম উপস্থিত হয়ে থাকে। এখানেও যখন আর্থিক বৈষম্য আছে তখন সংগ্রাম থাকবে না কেন? তিনি আরো বলেছেন অর্থই জগতে একমাত্র সত্য বস্তু নয়। কিন্তু অর্থ যে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় সত্য একথাটা তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন? অর্থের ব্যাপার পেছনে না থাকলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কখনো এর‌ূপ ম‌ূর্তি ধারণ করতে পারত না। বটুক ভৈরব নিশ্চয়ই এ-সব খবর কিছ‌ু কিছ‌ু রাখেন।

এদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম নেই বললেই কিছ‌ু শ্রেণী-সংগ্রামটা মিটে যাবে না। ধনিক-বণিকের অন‌ুচর ও প্রসাদভোগী যারা তারা এমন কথা প্রচার করতে পারে। কিন্তু, এর‌ূপ প্রচারের ফলে শ্রেণী-সংগ্রামের বিলোপ হবে না। ব্যাপারটিকে সাম্প্রদায়িক পথে পরিচালিত করে কিছ‌ুদিনের জন্যে ব্যাহত করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, ম‌ূল সংগ্রামের কারণ যখন অত্যন্ত তীব্র ভাবে বর্তমান রয়েছে তখন তা কি কখনো বিলোপ পেতে পারে? যারা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত নয়, যারা ধনিক-বণিক ও জমিদারের কৃপার ভিখারী, তারা এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বাড়াবার জন্যে নানা দিক থেকে নানা ভাবে চেষ্টা করছে। তারা হয়তো মনে করছে যে হিন্দ‌ু-ম‌ুসলিমকে উৎকটর‌ূপে হিন্দ‌ু-ম‌ুসলিম করে দিতে পারলে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা ধামাচাপা পড়ে যাবে। কিন্তু, শ্রেণী-সংগ্রামের কারণ বর্তমান আছে বলেই যে এ সাম্প্রদায়িক বিরোধও তারা বাধাতে সমর্থ হয়েছে এটা তারা কিছ‌ুতেই ব‌ুঝে উঠতে পারছে না।

বটুক ভৈরব জিজ্ঞাসা করেছেন, শ্রেণী-সংগ্রামের কোন্ নিয়মের ফলে ঝগড়াটা এমন বীভৎস ম‌ূর্তি ধারণ করেছে? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প‌ূর্বে আমরা তার উত্তর আমাদের আগেকার প্রবন্ধে দিয়েছি। সংগ্রাম যে বাধবে এটা মান‌ুষ বলে দিতে পারে, কিন্তু, সংগ্রাম কি ম‌ূর্তি পরিগ্রহ করবে এটা কেউ বলে দিতে পারে না। ভাল নেতৃত্ব পেলে সংগ্রাম ঠিক পথে চলে, আর না পেলে বেঠিক পথেও চলে। নারীনিগ্রহের কথা নিয়েই ওপরের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। হিন্দ‌ুতে হিন্দ‌ুতে ঝগড়া বাধলে না কি কোথাও নারীদের ওপরে অত্যাচার হওয়ার কথা শোনা যায় না, আর হিন্দ‌ুতে ম‌ুসলমানে বাধলেই অনেক বেশী শোনা যায়। বটুক ভৈরবের বিশ্বাস নারী-নিগ্রহের কুপ্রব‌ৃত্তিটা ম‌ুসলমান সম্প্রদায়ের একচেটিয়া উত্তরাধিকার। তাঁর মতে আরো খোলাসা ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে কামপ্রব‌ৃত্তিটা কেবলমাত্র ম‌ুসলমানদের মধ্যেই আছে। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যর‌ূপ। আমরা

জানি কামপ্রবৃত্তিটা কেবলমাত্র মুসলমানদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এটা সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই আছে এবং যারা বে-রোজগারের কড়ি খেয়ে অলস জীবন যাপন করে তাদের মধ্যে কিছু বিশ্রী মাত্রায় আছে। নারীকে আমরা যে সামাজিক পদমর্যাদা দিয়ে রেখেছি তাতে তার ওপরে নিগ্রহ না হওয়াটাই আশ্চর্যের কথা। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নারীর ওপরে নিগ্রহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই করে এবং কেউ কারো চেয়ে কম করে না। একই তারিখের কাগজে আমরা হিন্দু কর্তৃক ও মুসলমান কর্তৃক নারীনিগ্রহের কথা পাঠ করে থাকি। হিন্দু কাগজওয়ালারা মুসলমানদের ব্যাপারে শিরোনাম দিয়ে থাকেন—"মুসলমান দুর্বৃত্ত কর্তৃক হিন্দু নারীর উপরে পাশবিক অত্যাচার"। আর হিন্দুর বেলায় দিয়ে থাকেন—"জমিদার হত্যার মোকদ্দমা"। নারীর ওপরে বলাৎকার করতে যেয়েই এ জমিদার বধ হয়েছিল। ক'দিন পূর্বে 'বসুমতী'তে এরূপ একটা খবর আমরা পড়েছিলাম। আর-একটা ঘটনা 'ফরওয়াড' প্রকাশ করেছিলেন। একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানেতে মিলে একটা মেয়েকে চুরি করেছিল। রাধারাণী কি এমন কিছু একটা নাম সে মেয়েটির হবে। শিরোনামে কিন্তু 'ফরওয়াড' ও দোষটা চাপালে মুসলমানেরই ঘাড়ে। রাজকুমারীর ওপরে অত্যাচার কারা করেছিল? নারীলাঞ্ছনার এর চেয়েও ঘৃণিত চিত্র আর কেউ কখনো দেখেছে কি? বটুক ভৈরব যদি অভয় প্রদান করতে পারেন যে আমাদের নামে কোনো মানহানির মোকদ্দমা হবে না তা হলে আমরা হিন্দু কর্তৃক নারীনিগ্রহের অনেক খবর প্রকাশ করতে পারি। অবশ্য আদালতে মোকদ্দমা ওঠেনি কিংবা খবরের কাগজে ছাপা হয়নি—এমন খবরের কথাই আমরা বলছি। তা ছাড়া আদালতে মোকদ্দমা উঠেছে কিংবা কাগজে ছাপা হয়েছে হিন্দুর দ্বারা নারীনিগ্রহের এমন অনেক প্রমাণ আমরা বটুক ভৈরবকে যে-কোনো সময়ে দেখাতে প্রস্তুত আছি। আমরা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একথা বলছিনে, ন্যায় ও সত্যের পক্ষ থেকেই বলছি। যেখানে যত বটুক ভৈরবের দল আছেন তাঁদের সকলকেই আমরা অনুরোধ করছি যে তাঁরা দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করুন। তা হলেই সব বস্তু ঠিক ভাবে দেখতে পাবেন। এখন তাঁরা সব জিনিসেরই একটা দিক দেখছেন মাত্র, অনেক জিনিস আবার দেখেও দেখছেন না।

হাঁ, আর একটা কথা। পুঁথির চাপে আমাদের বুদ্ধি মারা পড়েনি, সাম্প্রদায়িকতার চাপে বটুক ভৈরব মশায় অন্ধ হয়েছেন। সত্যকার লোক যদি মোড়লি গ্রহণ না করে তা হলে খান সাহেবের দল করবে না কেন?

বটুক ভৈরবরা একবার কৃষকদের নিকটে যান না কেন—হিন্দুর রূপে নয়, মানুষের রূপে। তা করার পরে যদি কৃষকেরা তাদের নেতৃত্বের অধীনে না চলে তবেই তিনি আমাদের বলতে পারেন যে পুঁথির চাপে আমরা মরেছি। কিন্তু তা তাঁরা করতে যাবেন কেন? তাঁদের সহানুভূতি যে ধনিক-বণিক ও জমিদারের প্রতিই বেশী। উৎপাদনের উপায় বেশী হাতে নেই বলে কিংবা মোটেই নেই বলে তাঁরা জনগণকে খুব বেশীরূপ শোষণ করতে পারেন না বটে, কিন্তু, আসলে তাঁরা শোষক শ্রেণীর লোক, অন্ততঃ বর্তমানে পরগাছা তো বটেনই।

ধর্মশিক্ষার মধ্যে গোড়ায় যেখানে গলদ রয়েছে সেটা দূর করতে বটুক ভৈরব আমাদের অনুরোধ করেছেন। আমাদের মতে ধর্মশিক্ষার কেবলমাত্র গোড়ায় গলদ নেই, ওর আগাগোড়াই গলদ। একথাটা কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্মের সম্বন্ধে আমরা বলছিনে। পৃথিবীর সকল ধর্মেরই এ দুর্দশা হয়েছে। মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধ করে মুসলমানরা যেমন মিথ্যা ধর্মভক্তির পরিচয় দিচ্ছে ঠিক তেমনি পূজো ও সংকীর্তনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে হিন্দুরাও ঠিক অনুরূপ ধর্মভক্তির পরিচয় দিতে ছাড়ছে না। ধর্মের বিধান সকল দেশে সকল কালেই রাজা বা শাসনকর্তার মুখের দিকে চেয়ে রচিত হয়েছে। প্রথমে যে মূর্তিতে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে সে মূর্তি তার কিছুকাল পরেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে রাজা-বাদশার প্রয়োজনে। শোষণ-যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে ধর্মকে নিতান্তই অধর্মে পরিণত করা হয়েছে। মোটের ওপরে ধর্মের নামে যত ব্যাপার সংঘটিত হয় তার সমস্তই কিছু ধর্ম নয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নাস্তিক ছিল। অথচ সে-ও চীনে মিশনারি পাঠিয়েছিল ধর্মপ্রচার করার জন্যে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল চীনে শোষণের সুবিধে হতে পারে কিনা তা দেখা। আর্থিক শোষণের পরিসমাপ্তির জন্যে যেরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজন আছে ঠিক সেরূপ প্রয়োজনে ধর্মগত শোষণের বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে।

শেষ কথা, 'শ্রেণী-সংগ্রামের দিন নিকটবর্তী হয়ে আসবে' নয়, যে-দিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি জগতে হয়েছে সেদিন থেকেই এসেছে। পূর্বদিকে আগুন আমরা দেখিনি, সূর্যই দেখেছি। বটুক ভৈরবরা যে টের না পাচ্ছেন তা নয়, তবে হয়কে নয় করতে চাইছেন।

গণবাণী : ১২ই মে, ১৯২৭

মুক্তি-সংগ্রাম

মুক্তিলাভের জন্যে আমাদিগকে অপরিহার্যরূপে সংগ্রাম চালাতে হবে, এ বিষয়ে কোনো প্রকারের মতভেদ থাকতে পারে না। নরমপন্থী, গরমপন্থী ও মধ্যপন্থী—সকলেই সংগ্রামের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। কিন্তু, সংগ্রামের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে পারলেই মুক্তিলাভ হয়ে যাবে। কেউ কেউ মনে করেন যে কেবলমাত্র বাইরেকার বক্তৃতার দ্বারা কিছুই হবে না, বিভিন্ন ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ করে সরকারের কোনো কোনো কাজে বাধা প্রদান করলেই মুক্তি আপনা থেকে আমাদের ঘরের দুয়ারে এসে উপস্থিত হবে। আবার কারো কারো মতে গুপ্ত ত্রাস-নীতি অবলম্বন করাই সত্যকারের মুক্তির পথ।

ওপরের কোনো দলেরই অবলম্বিত নীতি সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রাম তো নয়ই, পরন্তু, অনেক দলের প্রচেষ্টা হচ্ছে সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রামকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা।

বন্ধন-মুক্ত হবার জন্যে হাত পা নাড়ার পূর্বেই আমাদিগকে জেনে নিতে হবে বন্ধনটা কিসের। বন্ধনের স্বরূপ না চিনে তা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা আর আঁধারে ঢু মারা একই কথা।

জাতীয় স্বাধীনতা সব সময়ে সত্যকারের স্বাধীনতা নয়। চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাধীন দেশ হলেও অর্থনীতিক ও সামাজিক ভাবে চীন বড় বেশী পদানত হয়ে আছে। প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে বন্ধনের যন্ত্রণা অনুভব করে করে চীনের জনগণ ভাল করে বুঝে নিয়েছে কিসের বন্ধনে তারা জর্জরিত হয়ে আছে। তাই, আজ স্বাধীন চীনকেও মুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রাম তো করতে হবেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনীতিক মুক্তির জন্যেও তাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে।

সারা বিশ্বে বন্ধনের একটি মাত্র সূত্র রয়েছে। সে-সূত্র হচ্ছে বুর্জুয়াজগণের বন্ধনের সূত্র। উৎপাদনের উপায়সমূহকে করতলগত করে যারা জনগণকে শোষণ করে থাকে তাদেরকেই বুর্জুয়াজি বলা হয়। এই

বুর্জোয়াজিগণ যখন আপন আপন দেশের উৎপাদকগণকে শোষণ করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় ধনিক। (আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা ভারতবর্ষের জমিদার ও কারখানার মালিক প্রভৃতি শোষকগণকে ধনিক নামেই অভিহিত করব)। ধনিকদের কারবার যখন খুব বিস্তৃতি লাভ করে তখন তারা কাঁচা মাল পাওয়ার জন্যে ও পাকা মাল চালাবার জন্যে অন্য দেশেও তাদের কারবারকে প্রসারিত করে থাকে। তখন তাদের উদ্দেশ্য হয় সে-দেশকে অর্থনীতিক হিসাবে পদানত করে শোষণ করা। বৃহৎ মূলধনকে কেন্দ্রীভূত করে এই যে ভিন্ন দেশকে অর্থনীতিক হিসাবে পদানত করে শোষণ করা হয় এরি নাম হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। বাংলায় আমরা শোষণবাদই বলব। এখানে একটি কথা বলে রাখা আমরা আবশ্যক মনে করছি। জগতের শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখেন না বলে আমাদের দেশে অনেকেই 'ইম্পিরিয়েলিজম'-এর মানে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁরা মনে করে থাকেন যে সাম্রাজ্যের বিস্তারকেই ইম্পিরিয়েলিজম বলা হয়। আমাদের অধিকাংশ বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা 'ইম্পিরিয়েলিজম' শব্দের বাংলায় তরজমা করে থাকেন 'সাম্রাজ্যবাদ'। কানপুরে কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা যখন হচ্ছিল তখন অনেক চেষ্টা করেও আমরা বিবাদী পক্ষের দু'জন ব্যবহারজীবকে 'ইম্পিরিয়েলিজম'-এর মানে বোঝাতে পারিনি। তারাও বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে বৃটিশ সাম্রাজ্যই ধরে নিয়েছিলেন। উক্ত মোকদ্দমার অভিযুক্তগণ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু, তাঁদের ব্যবহারজীবরা সেটাকে ধরে নিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্য। ফলে, আসামীগণকে চার বছরের কারাবাসের হুকুম দিতে জজকে এতটুকুও বেগ পেতে হ'ল না। ইম্পিরিয়েলিজম আর এম্পায়ার (সাম্রাজ্য) এক কথা নয়। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর হতে বের হয়ে গেলেও ভারতবর্ষে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম থাকতে পারে। চীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম চীনে অত্যন্ত তীব্র ভাবে বর্তমান রয়েছে।

ভারতবর্ষে শুধু যে বৃটিশ শোষণবাদ বিদ্যমান রয়েছে তা নয়, এদেশে বৃটিশের শোষণতান্ত্রিক গবর্নমেন্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম আগে একান্ত ভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করার পক্ষপাতী ছিল। ভারতে শিল্পানুষ্ঠান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এটা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম পূর্বে কিছুতেই পসন্দ করেনি। কিন্তু যুদ্ধের সময় হতে ইম্পিরিয়েলিজম সে-নীতির পরিবর্তন করেছে। রুশে শ্রমিকগণের গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকল দেশের ইম্পিরিয়েলিজমই তাদের নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম শুধু যে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানপূর্ণ করে তুলছে তা নয়, পরন্তু, ভারতের ধনিকগণকেও আপনাদের দলে টেনে নিয়েছে। ভারতে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম-এর বর্তমান নীতি হচ্ছে ভারতের ধনিকগণের সহিত ভাগাভাগি করে ভারতের জনগণকে শোষণ করা।

কাজে কাজেই, ভারতের জনগণের বন্ধন হচ্ছে বৃটিশ শোষণবাদ ও দেশীয় ধনিকবাদের বন্ধন। ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণ ঘরে-বাইরে উভয় দিক থেকেই শোষিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম একদিকে কাঁচা মালের ব্যাপারে কৃষকদিগকে শোষণ করছে, আর একদিক থেকে এদেশে কারখানা স্থাপিত করে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে তাদের শ্রমলব্ধ ধন থেকে বঞ্চিত করছে। শুধু কি তাই? ভারতীয় শ্রমিকগণকে পশুত্বে অবনমিত করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মতো জীবন তারা যাপন করতে পারছে না। শ্রমিকদিগের এমন হীনাবস্থা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। যে ঘরে তারা বাস করে সে ঘর মনুষ্যজাতির বাসোপযোগী একেবারেই নয়। যে খাদ্য তারা খায় তা মানুষের খাদ্য নয়, আর যে পোশাক তারা পরতে পায় তা-ও মানুষের পোশাক নয়। দেশীয় ধনিকেরাও কারখানার মালিকরূপে, ভূমির মালিকরূপে ও সুদের ওপরে টাকা লগ্নিকারী মহাজন-রূপে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছে।

মোটামুটি ভাবে ধরতে গেলে সমাজে এখন দুটি পক্ষ বর্তমান। এক পক্ষ হচ্ছে শোষকের আর এক পক্ষ হচ্ছে শোষিতের। একপক্ষে উৎপাদনের উপায়সমূহের মুষ্টিমেয় অধিকারিগণ, আর একপক্ষে অগণিত শোষিত উৎপাদকের দল। এই দু'শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলে এসেছে সে সংগ্রামই হচ্ছে সত্যিকারের মুক্তি-সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রাম নামে এ সংগ্রাম অভিহিত হয়ে থাকে। সমাজের সর্ববিধ বিপ্লব ও বিবর্তন শ্রেণী-সংগ্রামেরই ভিতর দিয়ে সাধিত হয়ে থাকে।

ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন কোনো দৃঢ়ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃগণ আমলাতন্ত্রকেই যত গালি দিয়ে থাকে, কিন্তু, আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়ী 'ইম্পিরিয়েলিজম'-এর সম্বন্ধে কোনো কথাই তাঁরা উচ্চারণ করেন না। দেশীয় শোষণকারীদের বিরুদ্ধেও তাঁরা কোনো কথা বলেন না। তার কারণ এই হচ্ছে যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃগণের কেউ কেউ শোষক শ্রেণীর আশ্রিত লোক। কাজেই, তাঁরা কোনো প্রকারেই শ্রেণী-সংগ্রামে জনগণের পক্ষাবলম্বন করতে পারেন না।

গান্ধী স্বয়ং সব সময়ে আহ্‌মদাবাদের কলের মালিকগণের সাহায্যের ভিখারী হয়ে থাকেন। কলওয়ালাদের সাহায্য না পেলে তাঁর প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণ করা চলে না। কলের মালিকরা যতই শ্রমিকদিগকে শোষণ করুক না কেন, গান্ধীর মতে তারা শ্রমিকগণের মনিব। মনিবের সাথে কোনো প্রকারের ঝগড়া না করে সদ্ভাব স্থাপন করাই হচ্ছে তাঁর মতে শ্রমিকের কর্তব্য। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশও শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষে শ্রেণী-সংগ্রাম নামক কোনো জিনিসের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। শ্রেণী-সংগ্রাম ঐতিহাসিক সত্য, এবং সকল দেশের জন্যেই সত্য, এ কথা যে চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় উচ্চ-শিক্ষিত লোক বুঝতেন না এমন কথা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নই। তিনি সবই বুঝতেন, তবে তাঁকে তাঁর দলের কাজ চালাবার জন্যে সময়ে অসময়ে টাকার জন্যে ধনিকদের নিকটে হাত পাততে হ'ত বলে তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি প্রকাশ্যে মেনে নিতে পারতেন না। লাহোর ট্রেড্‌স্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন সে বক্তৃতা একবার সকলকে প'ড়ে দেখতে আমরা অনুরোধ করছি। তাঁর সে-বক্তৃতা শ্রেণী-সংগ্রামের নীতির ওপরেই তিনি প্রদান করেছিলেন।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাইরে নয়। পৃথিবীর আর সব জায়গায় যেমন জনগণ শোষিত হচ্ছে ভারতবর্ষে কৃষক ও শ্রমিকগণ তার চেয়ে অনেক বেশী শোষিত হচ্ছে। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের কোনো মূল্যই নেই যদি সে-সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে চালিত না হয়। শাসন-সংস্কারের দ্বারা আরো অধিক সংখ্যক সরকারী চাকুরি ভারতবাসীরা পেলে, এমন কি ভারতের লোক লাট-বেলাট পর্যন্ত হলেও ভারতের মুক্তি সাধিত হতে পারে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করেও ভারতবর্ষ পরাধীনই থেকে যাবে। এ প্রকারের পরিবর্তনের দ্বারা ভারতের শোষক শ্রেণীর লোকেরই সুবিধা হবে, কিন্তু, জনগণের অবস্থা হবে আরো অধিকতর শোচনীয়। এমন কি ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেও চলে যায়, অথচ ভারতীয় ধনিকগণের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ভারতে বর্তমান থাকে, সে-অবস্থাতেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বলা যেতে পারে না। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ও ভারতীয় ধনিকবাদের শোষণ হতে ভারতের জনগণ সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হলেই ভারতবর্ষ সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করবে। সমাজের উচ্চস্তরের লোকগণের সুবিধার জন্যে যদি কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় সে-পরিবর্তনকে স্বাধীনতা কিছুতেই বলা যেতে পারে না।

শ্রেণী-সংগ্রামই সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রাম। মানবজাতির ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাসকে ধামাচাপা দেওয়ার কোনো শক্তি কারো নেই। উৎপাদনের বৃহৎ উপায়গুলিকে হস্তগত করে দেশের ধনসম্পদকে কতিপয় লোক আপনাদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। এই কারণে দিনের পর দিন যারা আপনাদের পরিশ্রমের কড়ি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই জনগণের সংগ্রামই সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রাম আর তাদের অভ্যুত্থানই সত্যকারের বিপ্লব।

গণবাণী : ২৬শে মে, ১৯২৭

একখানা পত্র

ভাই·····,

পত্র তোমার পেয়েছি। তুমি আর তোমার বন্ধুরা সবাই মিলে কী যে হতে চলেছ যে বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করছি ততই আমার বুকের ভিতরে বেদনারাশি স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। চিন্তা আর বিচারের রাজ্যে মানুষ কি করে যে এত বেশী দেউলিয়া হতে পারে তা আমার ধারণাতেই আসছে না। ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে তোমরা সর্বত্যাগী হয়েছ, সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টকে তোমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছ। তোমরা না পাচ্ছ ভাল করে খেতে আর পরতে, না আছে তোমাদের কোথাও ভাল বাসের জায়গা। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে যে, যে স্বাধীনতার নামে তোমরা সব কিছু ছেড়ে এসেছ তোমরা সবাই সে স্বাধীনতারই পরিপন্থী হতে চলেছ। হয়তো তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতসারেই পরিপন্থী আর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছ। কিন্তু, হয়ে যে উঠেছ তাতে একটুকুও সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতা লাভের জন্যে যে বদ্ধপরিকর হবে নিজের চরিত্রকেও সে স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তুলবে। যদি আমরা দেখতে পাই যে তা না করে সে নিজের চারিদিকে নিজের হাতে কেবলি দাসত্বের জাল বুনে যাচ্ছে তা হলে আমরা তাকে পরিপন্থী আর প্রতিক্রিয়াশীল না বলে কি আর বলব? বীর-পূজার মতো ঘৃণিত দাসত্ব আর কিছুই নেই। তোমরা স্বাধীনতার সেবকরা প্রথমেই বীর-পূজার দাসত্বশৃঙ্খল গলে পরিধান করে নিয়ে তবে প্রলিপ্ত হতে চাও স্বাধীনতার সংগ্রামে, জান না এক হাতে দাসত্বকে বরণ করে নিয়ে আর-এক হাতে যে তাকে কোনো দিনও এড়ানো যায় না। বীর-পূজার প্রভাবে মানুষের ভিতরে চিন্তাশক্তির কর্ষণ কিছুতেই হতে পারে না, মানুষের মনুষ্যত্বের যে সত্তা আছে সে সত্তা চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। যত রাজ্যের মহাত্মা, ধর্মাত্মা, পুণ্যাত্মা আর দাদা কোম্পানির পাল্লায় পড়ে তোমরা কেবলি শোষিত হচ্ছ, স্বাধীন সত্তা বলে কোনো জিনিস আর তোমাদের ভিতরে নেই। তোমাদের বীরেরা দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার যদি পঞ্চাশ রকমের স্ববিরোধী কথাও বলে ফেলেন তথাপি একটি

বারও সাহস করে তোমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পার না কেন তাঁরা এমন করে ডিগবাজি খাচ্ছেন। কবে কোন্ এক প্রতিক্রিয়াশীল উপদেষ্টা বলে গেছে—"ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" যার ক্রিয়া তোমাদের ভিতরে এত বেশি হয়েছে যে তর্ক করা তোমরা ভুলেই গেছ। মনে করে বসে আছ এক দাসত্বকে বরণ করে নিয়ে আর-এক দাসত্বের অপনোদন তোমরা করবে।

স্বাধীনতার নামে তোমরা তোমাদের বীরদের মুখের অনেক বাঁধা-বুলিই আওড়াচ্ছ বটে, কিন্তু, কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমাদের অধীনতার গোড়ার কথাটা কি? তোমাদের বীরপুঙ্গবগণ কতটুকু স্বাধীনতার প্রয়াসী তা কি তোমরা কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ? যদি এতটুকুও করার সামর্থ্য ও সাহস তোমাদের নেই তা হলে কেনই বা ভূতের বেগার খেটে মরতে আসা?

বন্ধু, স্বাধীনতা লাভ করতে হলে অধীনতাটা কিসের তা ভাল করে বুঝতে হবে। বৃটিশ ভারতবর্ষকে শোষণের জন্যেই শাসন করছে, একথা তোমরা সবাই জান। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের অধিবাসী মাত্রেই যে আমাদের শোষক একথা মনে করো না। গ্রেট বৃটেনের জনগণের জন্যে ও জনগণের দ্বারা ভারতবর্ষ শোষিত ও শাসিত হয় না। আমাদের শাসক ও শোষক হচ্ছে ওখানকার ধনিক সম্প্রদায়। গ্রেট বৃটেন একটা শিল্প-প্রধান দেশ। অনেক কারখানা ওদেশে রয়েছে। এ-সব কারখানায় মাল তৈরী করার জন্যে যত কাঁচা মালের দরকার তত কাঁচা মাল গ্রেট বৃটেনে পাওয়া যায় না। সেজন্যে প্রচুর কাঁচা মাল পাওয়া যায় এমন দেশের তাদের প্রয়োজন। আবার বৃটিশের কারখানায় যত মাল তৈরী হয় তত মাল বৃটেনে ব্যবহৃত হতে পারে না। কাজেই পাকা মাল চালাবার জন্যে বাজার চাই। তারপরে ক্রমশ কারবার এত বেশী প্রসারিত হয়ে পড়ছে যে দেশের ভিতরে দেশের শ্রমিকগণকে তাদের শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত করে বৃটিশ ধনিকগণের লোভ আর কিছুতেই চরিতার্থ হচ্ছে না। তাই, তাদের প্রয়োজন হয়েছে বিদেশে মূলধন রফ্তানি করে, সস্তায় বিদেশী শ্রমিক নিযুক্ত করে অতিরিক্ত পরিমাণে লাভ করার। এই তিন কারণে বৃটিশ বিভিন্ন দেশকে কোনো না কোনো প্রকারে পদানত করেছে। অর্থাৎ কোনো দেশকে কেবলমাত্র অর্থনীতিক ভাবে পদানত করেছে, আবার কোনো দেশকে অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক উভয় ভাবেই পদানত করেছে। আমাদের ভারতবর্ষ দু'দিক থেকেই বৃটিশের পদানত হয়ে আছে। এই যে বৃটিশের পদানত হওয়া, তা সব দিক থেকেই হ'ক, কিংবা একদিক থেকেই হ'ক,—একেই বলা হয় বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম।

তোমরা মনে করছ ইংরেজ মাত্রই আমাদের শাসন আর শোষণের জন্যে দায়ী। তাই, আমাকে এতগুলি কথা বলতে হ'ল। আমি আশা করি, তোমরা নিশ্চয়ই চিন্তা করে বুঝে নেবে যে কেবলমাত্র গণিতসংখ্যক বৃটিশ ধনিকের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যেই আমাদিগকে এবং আমাদের মতো আরো অনেক দেশকে গ্রেট বৃটেনের পদানত হতে হয়েছে।

ভারতে পাকা মাল চালিয়ে ও ভারত থেকে কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন ও শোষণ করাই ছিল বৃটিশ ধনিকগণের পুরাতন নীতি। বিগত যুদ্ধের সময় থেকে কিন্তু এ নীতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভারতে বৃটিশ ধনিকবাদের এখনকার নীতি হচ্ছে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানপূর্ণ করে তোলা। এই নীতিতে কৃতকার্য হওয়ার জন্যে ভারতীয় ধনিকগণের সাহায্য পাওয়া তাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই, গভর্নমেণ্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ও ট্যারিফ অ্যাক্ট প্রভৃতি পাস করে ভারতীয় ধনিকগণকে (জমিদার প্রভৃতিকেও আমি ধনিক বলে ধরে নিচ্ছি।) অনেক সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এখন ভারতের অধীনতার জন্যে বৃটিশ ধনিকগণ যতটুকু দায়ী ভারতের ধনিকগণও ঠিক ততটুকুই দায়ী। পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে আমাদিগকে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অধীনতাশৃঙ্খল যেমন ছিন্ন করতে হবে ঠিক তেমনি ভারতীয় ধনিকগণের বন্ধুত্ব এড়াতে হবে।

আমি আশা করি আমাদের অধীনতার গোড়ার কথা তুমি এখন বুঝে নিয়েছ। কংগ্রেসের ধনিক ও ধনিকাশ্রিত নেতৃগণ পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবী কেন যে পেশ করতে চান না তা-ও আশা করি তুমি এখন খুব সহজেই বুঝে নেবে। আমার অনুরোধ, তোমরা কেবলমাত্র নেতৃভক্তিতে অন্ধ হয়ে না থেকে, হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে, ব্যাপারটাকে একটুখানি তলিয়ে দেখতে শেখ। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হ'ক, এ প্রস্তাব যখন গৌহাটি কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়েছিল তখন গান্ধী বলেছিলেন কংগ্রেস যদি এ প্রস্তাব পাস করে নেয় তা হলে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন। কাজেই গান্ধী যে স্বাধীনতার পরিপন্থী একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এর পরেও যদি তোমরা গান্ধীর নীতির প্রতি ভক্তিমান থাক তা হলে তোমাদিগকেও স্বাধীনতার পরিপন্থী বললে কি কিছু অন্যায় বলা হবে ?

আমাদের এ যুগটা হচ্ছে জনগণের উত্থানের যুগ। কেননা, আর কারও উত্থান হতে এখন আর বাকী নেই। পুরাতন ফিউডালিজম

বা জায়গীরদার প্রথার ধ্বংস হয়ে বুর্জোয়াজিগণই এখন জগতের সর্বত্র প্রবল হয়েছে। বুর্জোয়াজি বলা হয় আধুনিক ধনিকগণকে। উৎপাদনের উপায়সমূহকে করায়ত্ত করে এই ধনিকগণ পরিশ্রমী লোকদিগকে তাদের শ্রমের ধন থেকে বঞ্চিত করছে। বুর্জোয়াজিগণের ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলেই সমাজে প্রোলেটারিয়েট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। শোষিত ও বিলুণ্ঠিত হয়ে হয়ে যারা উৎপাদনের উপায়সমূহ হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং বেঁচে থাকার জন্যে আপনাদের পরিশ্রমকে ভাড়ায় খাটাতে বাধ্য হচ্ছে তারাই প্রোলেটারিয়েট। আমাদের দেশে প্রোলেটারিয়েটের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। গ্রামের কৃষক সম্পত্তিহীন হয়ে ক্রমশই শহরের কারখানাতে ভর্তি হচ্ছে। কারখানার শ্রমিকেরা অধিকাংশই প্রোলেটারিয়েট, কৃষিক্ষেত্রেও প্রোলেটারিয়েটের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আর যে সকল কৃষক এখনো সম্পত্তিহীন হয়নি তারাও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে শোষিত হচ্ছে। উৎপাদনের উপায় তাদের হাতে কিছু আছে বলে উৎপাদন তারা করছে বটে, কিন্তু, শোষণের নানা পরিবৃত্তির ভিতর থেকে তারা উৎপন্ন দ্রব্য হতেই বঞ্চিত হচ্ছে। এদেশের কৃষকগণ সাক্ষাৎ ভাবে প্রোলেটারিয়েট না হলেও তারা পরোক্ষ ভাবে প্রোলেটারিয়েট হয়ে ভূতের বেগার খেটে মরছে। কৃষক একখানা হাতে যেখানে উৎপন্ন করছে সেখানে ঠিক পাঁচখানা হাত উদ্যত হয়ে আছে তাকে শোষণ করার জন্যে। জমিদার তাকে শোষণ করছে, সুদখোর মহাজন তাকে শোষণ করছে, ব্যবসায়ী মহাজন ও তার দালাল তাকে শোষণ করছে। মোল্লা-পুরোহিত ও ডাক্তার-উকিল সবাই তাকে শোষণ করছে। এমনকি আজকের দিনে খবরের কাগজওয়ালারা পর্যন্ত তাকে শোষণ করতে ছাড়ছে না। বর্তমান সময়ে দেশময় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে এরও মূলে শোষণেরই কারণ বর্তমান রয়েছে। তারপরে ভদ্রলোক শ্রেণী বলে যে একটা অদ্ভুত শ্রেণী আমাদের দেশে আছে এ শ্রেণীর মধ্যেও প্রোলেটারিয়েটের সংখ্যা কম নয়। বিষয়-সম্পত্তি যাদের নেই. বাঁচবার জন্যে ভাড়ায় যারা খাটে তারাই তো প্রোলেটারিয়েট। ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে এমন লোকের বাহুল্য তো তুমি তোমার চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু, এ শ্রেণীটি যেমন অদ্ভুত, ঠিক এ শ্রেণীর লোকগুলোও তেমনি অদ্ভুত। যারা তাদের শোষণ করে থাকে তাদেরই প্রতি একটা সামাজিক আকর্ষণ এঁদের রয়েছে। সর্বহারা হয়েও এঁদের প্রত্যেকে এখনো মনে করে থাকেন যে তিনি সম্পত্তির মালিক ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হবেন। জন কয়েকের হাতে কেন্দ্রীভূত সম্পত্তি যে

তাঁদের সকলের নিকটে কি করে আসবে সে-কথাটাই তাঁরা শিক্ষিত হয়েও বুঝতে চান না। সর্বহারা হয়েও এঁরা বুর্জোয়াজিগণের আদর্শকে আপনাদের আদর্শ করে রেখেছেন। কিন্তু, এঁদের এ তাসের ঘর ভেঙে যাবার সময় এসেছে। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রোলেটারিয়েটগণও যে কারখানার শ্রমিক হতে বাধ্য হবেন, সেদিন খুব ঘনিয়ে এসেছে। আর কারখানায় ঢোকার পরই এঁরা আপনাদের স্বরূপ ভাল করে চিনতে পারবেন।

দেশীয় ও বিদেশী বুর্জোয়াজিগণ যে দিনের পর দিন দেশের জনগণকে, বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিকগণকে লুণ্ঠন ও শোষণ করছে এর দ্বারা তারা নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের কারণও সৃষ্টি করছে। তারা জেনে-শুনেই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আমি যদি তোমাকে ক্রমাগতই শোষণ করতে থাকি, তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াই যদি আমার একমাত্র কাজ হয়, তা হলে তুমি কখনো আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বুকে চেপে ধরবে না। আমার প্রতি বিরোধের ভাব তোমার মনে আসবেই আসবে। বুর্জোয়াজিগণ জানে যে তাদের বিরুদ্ধে তারা বিরাট বিশাল অসন্তুষ্ট জনগণের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, তা জানা সত্ত্বেও তারা জনগণকে শোষণ করছে। কেননা, শোষণ করাই তাদের পেশা। বুর্জোয়াজিগণের বিরুদ্ধে যে গণ-উত্থান হবে, এ উত্থানের মূল নষ্ট করে দেবার কোনো উপায়ই তাদের হাতে নেই। এই উত্থানকে চেপে রাখাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কাজ। তারা অনবরত এই চেষ্টাই করতে থাকবে, যাতে কোনো প্রকারে কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার না হতে পারে। এজন্যে ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বিরোধের আগুন যদি দেশময় জ্বেলে দেবার প্রয়োজন হয় তা তারা করতে এতটুকুও পেছপাও হবে না। মোল্লা-পুরোহিত ও নেতা প্রভৃতির দ্বারা তারা অনবরত কৃষক ও শ্রমিকগণের সচেতন হওয়াতে বাধা প্রদান করে যাচ্ছে। এর ওপরে আমলাতন্ত্রের অত্যাচারও আছে।

একটা পক্ষ আর-একটা পক্ষকে যে পদানত করে রাখে তারি নাম হচ্ছে অধীনতা। পদানতকারীর সহিত পদানতের যে একটা দ্বন্দ্ব বেধে ওঠে তারি নাম হচ্ছে স্বাধীনতা-সংগ্রাম। আজকের দিনে পৃথিবীর সর্বত্রই স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বরূপ হচ্ছে একপক্ষে গণিতসংখ্যক বুর্জোয়াজিগণ এবং আর একপক্ষে অগণিত শোষিত ও বিলুণ্ঠিত জনগণ। একটা নির্মম সত্যকথা আমাকে এখানে বলতে হবে। গুপ্ত ষড়যন্ত্রমূলক ত্রাস-নীতি

স্বাধীনতার সংগ্রাম মোটেই নয়। ইংরেজ মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হওয়া যেমন দেশপ্রেম নয়, তেমনি ধনিকতন্ত্রের দু'চার জন আমলাকে হত্যা করাও স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, তা মনের ভিতরে স্বাধীনতার প্রেরণা যতই আসুক না কেন। জ্বরের রোগীকে জ্বরেরই ঔষধ খাওয়াতে হয়। তা না খাইয়ে যদি তাকে কোনো কবিরাজ কলেরার ঔষধ খাইয়ে দেয় তা হলে সেটা আর যা হ'ক চিকিৎসা করা তা হ'ল না কিছুতেই। পৃথিবী হতে রাজার ক্ষমতা এখন চলে গেছে, ফিউডাল লর্ড বা জায়গীরদারগণের প্রভাবও চিরদিনের তরে ক্ষুন্ন হয়ে গেছে। আজকের দিনে সমস্ত অধিকারকে আয়ত্ত করে রেখেছে বুর্জোয়াজি সম্প্রদায়। তাদের কাছ থেকে সে-অধিকার কেড়ে নেওয়াই হচ্ছে সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করা। কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ জনগণের উত্থানই হবে এ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম। তোমরা যারা সর্বহারা, সর্বত্যাগী হয়ে পথে বসেছ,—তোমাদের উচিত জনগণকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা, তাদের অধিকার বুঝে নেবার সংগ্রামের জন্যে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

আমার অপরাধ নিও না, তোমাদের দুর্বলতা কোথায় তা আমি দেখেছি। বীর-পূজার আওতায় এসে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার শক্তি তোমাদের একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। চিন্তা করা এবং ঘটনা ও তালিকা মিলিয়ে ব্যাপারগুলিকে অধ্যয়ন করার ভার তোমরা অন্য লোকের মাথায় চাপিয়ে নিজেরা গতানুগতিকতায় গা ঢেলে দিয়েছ। তাই, যে জিনিসটা বোঝার জন্যে একটুকু মাথা খরচ করার প্রয়োজন আছে তার ত্রিসীমার ভিতরে কোথাও তোমাদের পাবার উপায় নেই। তোমার বীরদের কেউ কেউ বলে গেছেন বোমা আর পিস্তলের দ্বারা দেশোদ্ধার হবে। তাই, তোমাদের অনেকে বোমা আর পিস্তলের সন্ধানে ছুটেছে। তারা মনে করেছে দেশোদ্ধারের যে দায়িত্ব তারা আপনাদের স্কন্ধে নিয়েছে সে দায়িত্বের উদ্‌যাপন এরি দ্বারা হবে। গান্ধী বলেছেন চরখা আর খদ্দরের দ্বারা দেশোদ্ধার হবে। তাই, তোমরা অনেকে চরখা আর খদ্দর ধরেই বসে আছ। এতটুকুও চিন্তা করে দেখবার শক্তি তোমাদের নেই যে, সত্যসত্যই বোমা-পিস্তলকে ভিত্তি করে ষড়যন্ত্রমূলক গুপ্ত-সমিতি গঠন করলে কিংবা চরখা ও খদ্দরের প্রচলন করলে দেশে স্বাধীনতা আসতে পারে কি না। রুশিয়ার চেয়ে ভাল গুপ্ত-সমিতি আমাদের দেশে কখনও গঠিত হয়নি। রুশিয়ার নিহিলিস্টগণ ও সোস্যাল রিভোলিউশনারি

দলের চেয়েও উৎকৃষ্ট ত্রাস-নীতি আমাদের দেশের ত্রাস-নীতিবাদীরা কখনো প্রদর্শন করতে পারেনি। তারা রুশিয়ার জারকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল। কিন্তু, জারের সিংহাসন তাতে খালি পড়ে থাকেনি। রুশিয়ার শ্রমিকগণের বিদ্রোহের ফলেই রুশিয়া বুর্জোয়াজিগণের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। সোশ্যাল রিভোলিউশনারিগণ শ্রমিক-বিদ্রোহে কোনো সহায়তাও করেই নি। পরন্তু, যখন বৈদেশিক ধনিকশক্তি চারিদিক থেকে রুশিয়াকে ঘিরে ফেলেছিল তখন এই সোশ্যাল রিভোলিউশনারি দল প্রতি-বিদ্রোহ করেছিল দেশে। তোমরা যদি এখনো ঠিক পথ বেছে না নাও তা হলে আমার ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাসে প্রতি-বিপ্লববাদীর অধ্যায়ে তোমাদেরও নাম হয়তো লিখিত হবে। ফ্যাসিস্ট হওয়ার লক্ষণ তো এখনি তোমাদের অনেকের মধ্যে সূচিত হচ্ছে।

বন্ধু, বিপ্লববাদীরা দরকার হলে গুপ্ত-সমিতি হয়তো গঠন করতে পারে, কিন্তু, গুপ্ত-সমিতির সভ্য না হলে যে বিপ্লববাদী হওয়া যায় না. এমন বিশ্বাস কিছুতেই মনে স্থান দিও না। আমি দেখেছি অনেকেই নিজেদের বিপ্লববাদী মনে করে না এই কারণে যে তারা কোনো গুপ্ত বিপ্লব-সমিতির সভ্য নয়। আমূল-পরিবর্তন-প্রয়াসী যে হবে সে-ই বিপ্লববাদী। অধিকাংশ স্থলে গুপ্ত-সমিতির সভ্যগণ তথাকথিত বিপ্লববাদী হয়ে পড়ে। আমি কতবার তোমাকে বলেছি এ যুগে বুর্জোয়াজিগণের বিরুদ্ধে জনগণের উত্থানই সত্যকারের বিপ্লব।

বন্ধু, শরীরের স্নায়ুগুলিকে আর একটুকু শক্ত করতে চেষ্টা কর। হিন্দুতে মুসলমানে এতটুকু ঝগড়া বাধলেই যে কোনো দিকে আর কিছু হবে না বলে নিরাশ হয়ে পড়া, এর চেয়ে কাপুরুষতা আর কিছুই নেই। দৃষ্টিকে অনেক বেশী প্রসারিত করা দরকার। তাতে ছোট-খাটো সংকীর্ণতাগুলো আর থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যদৃষ্টিকে প্রসারিত করতে না পারছ ততক্ষণ প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজেরই উপযোগী তুমি হতে পারবে না।

পত্রখানা অনেক বড় হয়ে গেল। আমার যত কথা বলবার আছে সবই তোমায় পরে পরে বলব।*

তোমার—মুজফ্ফর আহ্মদ

গণবাণী : ২রা জুন, ১৯২৭

* পত্রখানা কোন এক বন্ধুকে লিখিত হয়েছে।—সম্পাদক, 'গণবাণী'।

ইস্‌পার কি উস্‌পার

সময় এসেছে যখন আমাদের স্থির করে নিতে হবে ইস্‌পার যেতে হবে কি উস্‌পার। ভারতবর্ষের সকল আন্দোলন এত বিভিন্ন সত্তাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে আজকের দিনে নিছক গোঁজামিল দিয়ে কোনো কাজই চলতে পারে না। একটা নির্দিষ্ট পথ ঠিক করে নিয়ে তবেই আমাদিগকে পথ-চলা আরম্ভ করতে হবে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিতরে বর্তমান সময়ে ইণ্ডিপেন্ডেন্ট কংগ্রেস দল, রেস্‌পন্‌সিভিস্ট দল এবং স্বরাজ্য-দল রয়েছে। এই তিন দলের কর্মধারাতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও তিনটি দলই বুর্জোয়াজি সম্প্রদায়ের দল এবং তিনটি দলেরই উদ্দেশ্য ভারতের জন্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Dominion Status) লাভ করা। অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরে একটা পেটি বুর্জোয়াজি-মণ্ডলীও আছে। (পেটি বুর্জোয়াজি বলতে আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর লোক, ক্ষুদ্র দোকানদার প্রভৃতিকেই মনে করেছি।) এঁদের কেউ কেউ বা স্বরাজ্য-দলের অন্তর্ভুক্ত, আবার কেউ বা গান্ধীর পুরাতন নীতির সমর্থক, যদিও গান্ধী নিজে তাঁর নীতির সমর্থন আর করেন না। এঁরা ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা (বৃটিশ সাম্রাজ্য ও শোষণতন্ত্রের বাহিরে) লাভ করতে চান না। মোটের ওপরে কংগ্রেসের আন্দোলন আজকের দিনে নেতৃত্বের আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই নেতাগণ বুর্জোয়াজি সম্প্রদায়ের লোক। দেশের জনগণকে শোষণ করে তাঁদের শ্রেণীগত স্বার্থের সংরক্ষণই হচ্ছে তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন তাঁরা পেতে চান এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

বর্তমানে কংগ্রেস আন্দোলন জনগণের আন্দোলন তো নয়ই, পরন্তু, জনগণকে আরো অধিকতর পদানত করে বর্তমান কংগ্রেসের নেতৃগণ যাতে তাঁদের আপন শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখতে পারেন সেই চেষ্টাতে ব্রতী হয়েছেন। শ্রেণী হিসাবে তাঁরা বেঁচে থাকতে চান। ভারতে যদি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তা হলে তাঁদের পক্ষে সেরূপ ভাবে বেঁচে থাকাটা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সেই হেতু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত তাঁদের সম্বন্ধটাকে আরো বেশী করে পাকাপাকি করে

নিতে চান। এখানে একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করলে আমাদের একথাটা বোঝার পক্ষে অনেক সুবিধে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছেন। ইচ্ছা যদি তাঁরা করেন তা হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেও তাঁরা যেতে পারেন। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা দক্ষিণ আফ্রিকা আজো পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। তার কারণ এই যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিজ আফ্রিকার অধিবাসী লোকেরা তো রয়েছেন, তা ছাড়া ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণও আছেন। এই ঔপনিবেশিকগণ সংখ্যায় নগণ্য হলেও দেশের প্রভুত্ব তাঁদেরই হাতে রয়েছে। তাঁরা বৃটিশ শোষণবাদীদের সহিত একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়ে যুক্ত ভাবে আফ্রিকার অধিবাসিগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে তা হলে ওদেশের জনগণ আপনাদের হাতে দেশের ক্ষমতা নেবেন, আর যদি সেরূপ ক্ষমতা জনগণ দখল করে বসেন তা হলে শ্বেত ঔপনিবেশিকগণের লুণ্ঠনের সুবিধে আর থাকবে না। ভারতের সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা খাটবে। ভারতের জনগণ যদি দেশের সকল ক্ষমতা নিজেরা অধিকার ক'রে নিতে পারেন তা হলে ভারতীয় ধনিক ও জমিদারগণ নির্বিরোধে দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণকে যদৃচ্ছা শোষণ করতে পারবেন না। শোষণ করতে না পারার মানেই হচ্ছে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। বৃটিশ শোষণবাদের কবল থেকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারলে যে ভারতীয় জনগণ ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠবেই তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ধনিক-বণিক ও ভূম্যভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃগণ কিছুতেই এমন জিনিসের জন্যে দাবী করতে পারেন না যদ্দ্বারা তাঁদের বিন্যস্ত স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যেই তাঁরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়ে আপনাদের ভিত্তিকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আহ্মদাবাদ হতে আরম্ভ করে গৌহাটি পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে নেতৃগণের কর্মপদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সকলে বুঝে নিতে পারবেন যে কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা আমরা প্রদান করছিনে। গান্ধী বারে বারে আধ্যাত্মিকতার ভিতরে স্বরাজের স্বরূপকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা করেও শেষে বলেছেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন মঞ্জুর করা হলে তিনি সর্বপ্রথমে বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করবেন। চিত্তরঞ্জন দাশ হাজার বার বলেছেন যে 'স্বরাজ' স্বরাজই বটে, তার কোনো সংজ্ঞানির্ণয় হতে পারে না। কিন্তু,

ফরিদপুরের প্রাদেশিক সম্মিলনে তিনিই আবার ঘোষণা করে গেছেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই আমাদের স্বরাজের স্বরূপ। বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিরূপে গান্ধী স্বাধীনতার কথা তুলতেই দেননি। গৌহাটি কংগ্রেসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে দেওয়া হয়েছিল বলে গান্ধী সভাপতি আয়েঙ্গারকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বিগত মার্চ মাসে দিল্লীতে অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভা ঘোষণা করেও তা স্থগিত রাখা হয়েছিল। কারণ ছিল সাক্‌লাৎওয়ালার উপস্থিতি, সাক্‌লাৎওয়ালার প্রতিপত্তির দ্বারা কংগ্রেসে কোনো প্রকার জনগণের প্রোগ্রাম স্থান লাভ করতে পারে এই ভয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃগণ করেছিলেন।

এই অবস্থায় দেশের যুবকগণকে স্থির করে নিতে হবে ইস্‌পার কি উস্‌পার ? একদিকে রয়েছে স্বার্থপর বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের আন্দোলন এবং আর একদিকে দেশের অগণিত জনগণের স্বার্থ। একপক্ষ তাঁদের অবলম্বন করতেই হবে। দুপক্ষে তো তাঁরা থাকতে পারবেনই না, মাঝামাঝিও তাঁদের থাকা চলবে না।

ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান নয়। বর্তমানে কংগ্রেসের ওপরে যাঁদের প্রভুত্ব রয়েছে তাঁরা কিছুতেই চান না যে কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান হ'ক। তাঁরা যতদিন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানে বসে আছেন ততদিন জনগণের কোনো দাবী কংগ্রেসের কার্যতালিকায় কিছুতেই স্থান পাবে না। এখন হয়তো কংগ্রেস হতে এই বুর্জোয়াজি নেতৃগণকে বিতাড়িত করে কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, কিংবা জনগণকে আপনাদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে নিতে হবে। কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্যেও জনগণের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে নেওয়া আবশ্যক হবে। কেননা, সংহত হওয়ার জন্যে একটা জায়গা জনগণের জন্যে চাই। বোম্বে ও বাংলার জনগণের দল (The Workers' and Peasants' Party of Bombay and The Peasants' and Workers' Party of Bengal) কিছুকাল পূর্বে গঠিত হয়েও গেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশসমূহেও অচিরে জনগণের দল-সমূহ গঠিত হবে। এই সকল দল সর্বত্র গঠিত হয়ে সময়ে একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে।

দেশের ও দশের কথা ভেবে থাকেন, মুক্তিকে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছেন—এমন শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে এখন সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আপনাদিগকে বুর্জোয়াজি সম্প্রদায়ের নেতৃগণের আওতা হতে বিমুক্ত করা।

একটুকু চিন্তা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা যে সকল নেতার উদ্দেশ্য রয়েছে সে-সকল নেতা ভারতবর্ষ বলতে কেবলমাত্র তাঁদের শ্রেণীকেই বুঝে থাকেন। তাঁরা যা কিছু চান তাঁদের নিজেদের জন্যেই চেয়ে থাকেন। মুক্তিকামী শিক্ষিত যুবকগণ যদি এ সকল নেতার আওতায় থাকেন তা হলে তাঁদেরকে মুক্তির পরিপন্থী হতেই হবে।

দেশ বলতে দেশের উৎপাদকগণ, এক কথায় দেশের জনগণকেই বোঝায়। জনগণের জন্যে কাজ করাই প্রকৃত দেশের কাজ। দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারাই লাভ হবে। এই জনগণকে. বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের মধ্যে সমস্বার্থজ্ঞান জাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে মুক্তিকামী যুবকগণের সম্মুখে এখন একমাত্র কাজ। মুক্তি-সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে হলে আপনার তথাকথিত 'ভদ্রতা' নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে চলবে না। কারখানার মজুরি নিয়ে মজুরদিগকে তাঁদের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। কৃষকদিগের সহিত তাদের মিশতে হবে—মিশে কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে কৃষকদিগকে চৈতন্যসম্পন্ন করে তুলতে হবে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত যুবকগণ সত্যিকারের মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে পারেন কিনা সে পরীক্ষা ফাঁসির মঞ্চে কিংবা কারাগারের অন্ধকার গৃহে চুকে যায় নি ;—তাঁদের প্রকৃত পরীক্ষা হবে ধনিকের কারখানায় ও কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে। ফাঁসির কিংবা কারাগৃহের পরীক্ষায় যিনি পাস করতে পারবেন তিনি যদি কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষায় পাস করতে না পারেন তা হলে বুঝতে হবে যে মুক্তি-সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই। তিনি সে-অবস্থায় কেবলমাত্র স্বাধীনতার পরিপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লববাদী মাত্র হতে পারেন।

শ্রমিক ও কৃষকগণের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখকে উন্নত করতে না পারলে, অন্তত উন্নত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রাণে জাগিয়ে দিতে না পারলে এদেশে কোনো প্রকারের আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভবপর হবে না। যে সকল মুক্তিকামী যুবক কারখানায় কিংবা কৃষকদিগের মধ্যে কাজ করতে যাবেন তাঁরা আপনাদের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখকে কমাতে যাবেন না, তাঁরা যাবেন কৃষক ও শ্রমিকগণের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখকে বাড়াবার জন্যে। আজ সত্যই তাঁদের সম্মুখে একটা খুব বড় পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়ার দ্বারা আমাদের জাতীয় প্রশ্নের একটা দিকের সমাধান হয়ে যাবে।

গণবাণী : ৯ই জুন, ১৯২৭

ভদ্রশ্রেণীর মানবিকতা

পৃথিবীকে মন্থন করে যে ক্ষীর পাওয়া যায় সে ক্ষীর যুগের পর যুগ একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করে আসছে। দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মন্থন যারা করেছে সেই জনগণ হয়ে আসছে চিরবঞ্চিত, আর কোনো পরিশ্রম যারা কখনো করছে না তারাই ভোগ করছে সবকিছু। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনগণ আজ সমবেত ভাবে যখন উত্থানের জন্যে প্রস্তুত হতে চলেছে তখন জনগণের এই উত্থানকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে তাদের শোষক শ্রেণীর লোকেরাও বদ্ধপরিকর হয়েছে। ইটালিতে শোষক শ্রেণীর এই প্রচেষ্টা ফ্যাসিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। সিনর মুসোলিনি এ আন্দোলনের নেতা। জনগণের আন্দোলনের নেতৃগণকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ভাবে মুসোলিনি হত্যা করেছে, তাদের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যে কোনো প্রকারের হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে মুসোলিনি বাকি রাখেনি। আজকের দিনে মুসোলিনির ন্যায় অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী শাসক জগতের আর কোথাও নেই। ইটালিতে মুসোলিনির মুখের কথাই আইন। তার কথার ওপরে কথা বলাই হচ্ছে মৃত্যুকে আপনার হাতে বরণ করে নেওয়া। শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় এহেন মুসোলিনির একখানা জীবন-চরিত বাংলায় রচনা করেছেন। বইখানা পড়ার সুযোগ আমরা এখনো পাইনি। কাজেই, বই-এর লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করার অধিকার আমাদের নেই। গত রবিবারের (১২ই জুন, ১৯২৭) 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এ বইএর একটা সমালোচনা বের করেছেন। এ সমালোচনা সম্বন্ধেই দু'চার কথা আমরা এখানে বলব। 'অমৃতবাজার' পঞ্চমুখে মুসোলিনির প্রশংসা করেছেন, আর এই প্রশংসাতে যে কত প্রাণের দরদ মাখানো আছে 'অমৃতবাজার'-এর মূল সমালোচনা যাঁরা পড়বেন তাঁরা তা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। 'অমৃতবাজার'-এর মতে মুসোলিনি ইটালির রক্ষক এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থাপয়িতা। তাঁর সম্মুখে কামাল ও টুস্কি কিছুই নয় ইত্যাদি। মোটের ওপরে হৃদয়ের দ্বার প্রশস্ত ভাবে উন্মুক্ত করে দিয়ে 'অমৃতবাজার' মুসোলিনির প্রশংসা করেছেন।

আজকের দিনে জগতের মধ্যে মুসোলিনি সম্ভবত ঘৃণ্যতম জীব। 'জন'-এর স্বার্থের খাতিরে 'গণ'কে সে শুধু যে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করেছে তা নয়, নির্মম ভাবে কত লোকের হত্যাকর্মও যে সাধন করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। 'অমৃতবাজার'-এর মতে মুসোলিনিই নাকি আবার দেশ-প্রাণতার অবতার! তারানাথ বাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে এর ভূমিকা-লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নাকি মত ঠিক তাই, অর্থাৎ দেশ-প্রাণতার অবতার বলে তিনিও মুসোলিনিকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। দেশের জনগণের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করা, জনগণের নেতৃগণকে কেবলমাত্র জনগণের নেতা হওয়ার অপরাধেই হত্যা করা ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাই কি দেশ-প্রাণতার পরিচয়? দেশ-প্রাণতার এই আদর্শ নিয়েই কি উপেন্দ্রনাথ আন্দামানে বারো বছর ঘানি ঘুরিয়ে এসেছেন? দেশ-প্রাণতার এই আদর্শই কি তিনি দেশের যুবকগণের সম্মুখে বারবার স্থাপন করে আসছেন? কয়েক বছর পূর্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে উপেন্দ্রনাথ 'বাংলার কথা' নামক দৈনিক কাগজের সম্পাদনা করেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মুসোলিনির যথেচ্ছাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ সেই 'বাংলার কথা'তেই লিখেছিলেন। নিজের চোখে দেখে এসে দিলীপকুমার মুসোলিনির যে পরিচয় এ প্রবন্ধগুলিতে দিয়েছিলেন তাতে আর যা হ'ক দেশ-প্রাণ তাকে কোনো বিচারশীল ব্যক্তিই বলতে পারেন না। যতই বেশী ক্ষমতা মুসোলিনির থাকুক না কেন, তার নিজের শ্রেণীর লোকদের ছাড়া আর কারো কাছ থেকে সম্মান সে পেতে পারে না। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়াই হচ্ছে যে ব্যক্তির জীবনের ব্রত, তার চেয়ে বেশী ঘৃণিত জীব কেউ কি হতে পারে?

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদনা করে থাকেন। তাঁরা এদেশের শ্রমিক-নেতাও বটেন। আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে তাঁদের সম্পাদিত কাগজে কি করে মুসোলিনি এত উচ্চ-প্রশংসিত হতে পারে? শ্রমিক-নেতা হিসেবে একটা কিছু আদর্শ তো তাঁদের নিশ্চিতই আছে। কি সে আদর্শ? তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণের হাতে মুসোলিনির জীবনী দেবার জন্যে এত ব্যস্তই বা কেন হয়েছেন, আর কি করেই বা মুসোলিনির আদর্শের দ্বারা আমাদের যুবকগণের দৃষ্টির প্রসারতা বাড়বে, এর কোনো সদুত্তর তাঁরা আমাদের দিতে পারেন কি? আমরা সহজ বুদ্ধি দিয়ে যতটা বুঝতে

পারি তাতে মুসোলিনির আদর্শের দ্বারা দৃষ্টির প্রসারতা খুব কমতে পারে বটে, কিন্তু, বাড়তে তো পারে না কিছুতেই।

আমরা আগে আরো অনেকবার বলেছি যে আমাদের দেশের ভদ্রলোক শ্রেণী বাস্তবিকই একটা অদ্ভুত শ্রেণী-বিশেষ। ফাঁসির রশিতে হাসতে হাসতে ঝুলে-পড়া এই ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, কিন্তু ভদ্রলোকত্বের সংকীর্ণ সীমা ডিঙানো তাঁদের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তাঁদের দেশাত্মবোধ তাঁদের শ্রেণীর সীমা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। এ জন্যেই লেনিনের আদর্শের চেয়ে মুসোলিনির আদর্শই তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠে, তা সে মুসোলিনি যতই অত্যাচারী আর স্বেচ্ছাচারী হ'ক না কেন। এক কথায় ভদ্রলোক শ্রেণীর দেশ-প্রাণতা যে আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই, ঠিক তেমনি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই তাঁদের দেশ-প্রাণতা নিতান্তই একপেশে, অর্থাৎ তাঁদের দেশ-প্রাণতার মধ্যেও ভদ্র-অভদ্রের বিচার আছে।

আর সকল দেশে যেমন হচ্ছে এদেশেও ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক ভাবেই জনগণের অভ্যুত্থান হবে। যতই চেপে রাখার প্রচেষ্টা চলুক না কেন, এ অভ্যুত্থানে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই। এদেশের ধনিক-বণিকেরা কখনো এ অভ্যুত্থানকে ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, এ অভ্যুত্থান দেশী ও বিদেশীয় উভয় শ্রেণীর শোষকগণের বিরুদ্ধেই হবে। তবে ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেরা, যাঁরা ধনিক-বণিক শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত নন—তাঁরা এ অভ্যুত্থানকে কি ভাবে নেবেন সেটাই হচ্ছে ভাবনার বিষয়। যদি এ যুগেও তাঁরা ভদ্রত্বের মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করতে না পারেন তা হলে তাঁরা গণ-আন্দোলনের পরিপন্থী হয়ে উঠবেন। দেশ-প্রাণতার নামে যে আন্দোলন তাঁরা চালাবেন সেটা হবে ফ্যাসিস্ট-আন্দোলন। আর যদি ভদ্রলোক শ্রেণীর যুবকগণ তাঁদের তথাকথিত ভদ্রত্বের মায়া ত্যাগ করে কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে পারেন তা হলে তাঁরাই হবেন ভারতের গণ-অভ্যুত্থানের নেতা।

গণবাণী : ১৬ই জুন, ১৯২৭

কি করা চাই ?

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বুর্জোয়া কংগ্রেস হয়ে পড়েছে। যে সকল লোক বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত একটা আপোস-নিষ্পত্তি করে নিয়ে আপনাদের স্বার্থের খাতিরে ভারতের জনগণের ওপরে প্রভুত্ব জমিয়ে বসতে চান তাঁরাই হয়েছেন আজকের দিনে কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা। ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করুক, ভারতের জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা ভারতের সকল কার্য পরিচালিত হ'ক, এমন আশা গান্ধী হতে আরম্ভ করে মতিলাল নেহরু পর্যন্ত কংগ্রেসের বিধাতৃপুরুষগণ ভুলেও কোনোদিন হৃদয়ে পোষণ করেননি। তাঁদের সকলেই চান ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। ভাবতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের খোলাসা মানে হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকে, বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত একটা রফা বন্দোবস্ত করে ভারতে ভারতীয় বুর্জুয়াজিগণের, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপরে যাঁরা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে বসে আছেন—তাঁদের শাসন প্রবর্তন করা। এরূপ শাসন-প্রণালীর প্রবর্তনের দ্বারা ভারতের জনগণের এতটুকুও হিতসাধন হবে না, পক্ষান্তরে কৃষক ও শ্রমিকগণ আরো অধিকতর কঠোরতার সহিত শোষিত ও বিলুণ্ঠিত হতে থাকবে।

ভারত যদি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, আর সেই স্বাধীনতা যদি জনগণের অভ্যুত্থানের দ্বারা লাভ হয় তা হলে কংগ্রেসের বর্তমান বুর্জোয়া নেতৃগণের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আজকের দিনে কৃষক ও শ্রমিক-গণের বুকের রক্ত পান করে করে এই যে তাঁদের উদরগুলো ভূধরের সমান উঁচু হয়ে উঠেছে—সেইটুকু জনগণের দ্বারা অধিকৃত স্বাধীন ভারতে কিছুতেই চলবে না, আর না চলার মানেই হচ্ছে শ্রেণী হিসেবে বুর্জুয়াজিগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। কাজে কাজেই, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্যে কংগ্রেসের বর্তমান বুর্জোয়া নেতৃগণ যে সংগ্রাম করছে তা হচ্ছে তাঁদের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখার সংগ্রাম। এটা কিছু আমাদের মনগড়া কথা নয়। বুর্জোয়া নেতৃগণ ইত্যাকার মনোভাবের পরিচয় বারে বারে দিয়ে এসেছেন।

সত্যকার ভাবে দেশের স্বাধীনতা যাঁরা চান তাঁরা এই বুর্জোয়া নেতৃগণের সহিত এক হয়ে যে কাজ করতে পারবেন না তা স্থির নিশ্চিত। এই তথাকথিত নেতৃগণের সহিত এক হয়ে কাজ করা আর আপনাদের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা একই কথা।

এখন কংগ্রেসকে যদি দেশের জনগণের সত্যকারের প্রতিনিধিসভাতে পরিণত করতে হয় তা হলে আমাদের সর্বপ্রধান কাজ হবে বুর্জোয়া নেতৃগণের দুষ্ট আওতা হতে কংগ্রেসকে বিমুক্ত করা। এই বিমুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন প্রোগ্রাম কংগ্রেসে গ্রহণ করা যা কিছুতেই বুর্জোয়া নেতৃগণ মায় গান্ধী সহ্য করে উঠতে পারবেন না। মাদ্রাজ কংগ্রেসের দিন ক্রমশই নিকটতর হয়ে আসছে। প্রকৃত স্বাধীনতাকামী যাঁরা আছেন তাঁদের এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কংগ্রেসকে নূতন ভাবে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। কংগ্রেসের বর্তমান উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করাই হবে আমাদের প্রথম দাবী। ভুয়ো স্বরাজ্য লাভ করার দাবী আমাদের দাবী নয়। আমাদের দাবী হচ্ছে ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করলেও চলবে না, বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের (লুণ্ঠনের) কবল থেকেও ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে হবে। কেননা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বাধীনতা লাভ করা আমাদের যেমন উদ্দেশ্য হবে, ঠিক তেমনি উদ্দেশ্য হবে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত ভারতের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা। মাদ্রাজ কংগ্রেস যদি কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তা হলে অনেক বুর্জোয়া নেতা তখনি কংগ্রেস ছেড়ে পলায়ন করবেন। এই পলায়নকারীদের অগ্রণী হবেন মিঃ গান্ধী। স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হলে তিনি যে কংগ্রেস ছেড়ে প্রথমেই পালাবেন সে-কথা তিনি গৌহাটী কংগ্রেসে নিজেই বলেছেন। গুজরাতের বুর্জোয়া বণিক শ্রেণীর তিনি লোক। তাঁর শ্রেণীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার শক্তি তাঁর একেবারেই নেই। তাঁর ব্যবহার থেকে সে-পরিচয় অনেকবারই পাওয়া গেছে। গান্ধী যদি কংগ্রেস ছেড়ে যান তা হলে তাঁর ভক্তবৃন্দের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন। এতে বাস্তবিকই কংগ্রেসের একটা নবজীবনের সঞ্চার হবে। গান্ধীর প্রতিপত্তি এড়ানো সত্য সত্যই আমাদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। "মহাত্মা"-গিরির খোলস পরে দেশের যে ক্ষতি তিনি করছেন তার পরিপূরণ করতে আমাদেরকে অনেক বেগ পেতে হবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে মহাত্মা-পুণ্যাত্মার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চাই সাহসী ও সচেতন মানুষ।

আমাদের প্রোগ্রাম আমরা ইতোপূর্বেই দেশের সম্মুখে পেশ করেছি। (১৪ই এপ্রিল তারিখের গণবাণী দ্রষ্টব্য।)

নিম্নে আবারো আমরা আমাদের দাবীগুলোর পুনরুল্লেখ করছি :—

(ক) রাষ্ট্রীয় দাবীসমূহ
(Political Demands)

১। আঠার বছর ও তার বেশী বয়সের নারী ও পুরুষ মাত্রকেই ভোটের অধিকার দেওয়া।

২। জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য (racial discrimination and caste distinctions) বিদূরিত করা।

৩। প্রেসের, বক্তৃতার ও সমিতি গঠনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা।

৪। ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিক-সংঘ)-সমূহের ওপর হতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করা এবং আইনের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে উন্নত দেশসমূহের সমান অধিকার প্রদান করানো।

(খ) অর্থনৈতিক দাবীসমূহ
(Economic Demands)

১। যথাসম্ভব পরোক্ষ ভাবে ট্যাক্স গ্রহণ প্রথা তুলে দেওয়া ও ক্রমবর্ধিত হারে মাসিক ২০০ টাকা হতে তদধিক আয়ের ওপরে ইন্‌কাম ট্যাক্স ধার্য করা।

২। সকল প্রকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৩। চাষের উপযুক্ত ভূমিসমূহ সরকারের দ্বারা কেবলমাত্র চাষীদিগকেই বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান করা।

৪। ভূমির উৎপন্ন ফসলের তারতম্য অনুসারে নিম্নতম হারে ভূমিকর ধার্য করা ও কোনো অবস্থাতেই সে-কর উৎপন্ন ফসলের শতকরা দশ ভাগের বেশী না হতে দেওয়া।

৫। কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়ার জন্য সরকারের দ্বারা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করানো। এই ব্যাঙ্কের সুদের হার

শতকরা বার্ষিক সাত টাকার বেশী হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে যারা সুদের ওপর টাকা খাটিয়ে থাকে তাদেরও সুদের হার শতকরা বার্ষিক সাত টাকা আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করে দিতে হবে।

৬। ঋণের টাকা শোধ না দিতে পারার জন্যে চাষীর চাষের জমি হস্তান্তর হতে না দেওয়া।

৭। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাতে চাষীদিগকে কৃষিকর্মে শিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা।

৮। কারখানার শ্রমিকগণের জন্যে আইনের দ্বারা আট ঘণ্টার দিন ও সাড়ে পাঁচ দিনে সপ্তাহ নির্ধারিত করে দেওয়া। নারী ও বালক শ্রমিকগণের জন্যে আরো কম সময় নির্ধারিত করা।

৯। আইনের দ্বারা কারখানার শ্রমিকগণের জন্যে নিম্নতম বেতনের হার নির্ধারিত করে দেওয়া। এই হার ধার্য করার সময় শ্রমিকগণের মানুষের মতো খাওয়া-পরার জন্যে যা প্রয়োজন হয় তারও ওপরে শতকরা তেত্রিশ টাকা অধিক ধার্য করা।

১০। সকল প্রকার কারবারেই শ্রমিকগণের জন্যে বার্ধক্য, রোগ ও কর্মহীনতার ইন্সিউরেন্স যাতে হয় তার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করে দেওয়া।

১১। শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ (compensation) ও মালিকগণের দায়িত্ব (liabilities) সম্বন্ধে যে আইন আছে তার প্রসার আরো বৃদ্ধি করা এবং সে আইন যাতে কার্যে পরিণত হতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

১২। খনি ও কারখানাসমূহে শ্রমিকগণকে বিপদ হতে বাঁচানোর জন্যে বর্তমানে যে সকল উন্নত উপায়সমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে সে সমুদায়ের ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করিয়ে নেওয়া।

১৩। শ্রমিকগণকে সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(গ) সামাজিক দাবীসমূহ
(Social Demands)

১। জনসাধারণের নিরক্ষরতাকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা। (সাক্ষর হওয়ার মানে আপন আপন আপন মাতৃভাষায় পত্র লিখতে ও পড়তে পারা।)

২। শ্রমিক ও কৃষকগণের জন্যে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সমূহ স্থাপন করা এবং নারীদের গর্ভাবস্থার জন্যে সেবা-সদন স্থাপন করা।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়সমূহ শিক্ষা দেওয়া।

৪। কারখানার মালিকগণকে দিয়ে শ্রমিকগণের জন্যে যথোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করানো এবং এ সকল বাসগৃহের ভাড়া যাতে শ্রমিকের ক্ষমতার বাইরে ধার্য না হয় তার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

৫। নারী ও বালক শ্রমিককে যাতে কোনো প্রকার বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত না করা হয় আইনের দ্বারা তার ব্যবস্থা করা।

৬। চোদ্দ বছরের কম বয়সের বালককে যাতে কোনো কারখানার কাজে নিযুক্ত না করা হয় আইনের দ্বারা তার ব্যবস্থা করা।

এই দাবীগুলোকে সম্মুখে রেখে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করে নিতে হবে। অবশ্য বর্তমান ধনিক-বণিক শ্রেণীর নেতৃগণ এ-সকল দাবীর যে সমর্থন করবেন না তা আমরা আগেই বলেছি। তাঁদেরকে বাদ দিয়ে কাজ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দেশের সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করার ইচ্ছে যে-সকল কংগ্রেস কর্মীর আছে, তাঁদের উচিত অবিলম্বে এ সকল দাবী কার্যে পরিণত করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগা। শুধু তা নয়, জনগণের হয়ে যাঁরা কাজ করছেন, অথচ আজো কংগ্রেসে যোগদান করেননি তাঁদের উচিত এ-সকল দাবী নিয়ে অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা। যেমন করে হ'ক, কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠান করে তুলতেই হবে। তা যদি আমরা না করতে পারি তা হলে এ কংগ্রেস আমাদের সত্যকারের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে পর্বত-প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসকে ধনিক-বণিকগণের আওতা হতে যেমন উদ্ধার করতে হবে, ঠিক তেমনি একে ধনিক-বণিকগণের সহায়ক সাম্প্রদায়িকত্বের প্রচারক কর্মী ও নেতৃগণের প্রভাব হতেও বিমুক্ত করতে হবে। শুদ্ধি, তব্‌লীগ, হিন্দু সভা ও হিন্দু সংগঠনের যারা লোক তাদেরকে কিছুতেই কংগ্রেসে আসতে দেওয়া সঙ্গত হবে না। খিলাফৎ কমিটি, জমিয়ৎ-ই-উলামা, এমন কি অল্-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সভ্যগণকেও কিছুতেই কংগ্রেসে আসতে দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস অ-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হবে এবং জনগণের অনুষ্ঠান হবে।

গণবাণী : ৩০শে জুন, ১৯২৭

খোলা চিঠির জওয়াব

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

৪ঠা শ্রাবণ তারিখের 'বীরভূমবাণী' কাগজে আমাদের নামে লেখা আপনার খোলা চিঠিখানা পড়েছি। আপনি যে 'গণবাণী' "যত্নের সহিত পাঠ করিয়া" থাকেন তার জন্যে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকি বলেই তার বিপক্ষে আমাদেরকে দাঁড়াতে হয়েছে। আমরা বেশ পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছি যে দেশের জনসাধারণের অর্থনীতিক দাসত্বকে সুদৃঢ় করার জন্যেই ধনিকগণ ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের সর্বত্র ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। আমরা জানি, ধনিকদের কাছ থেকে রীতিমত অর্থসাহায্য পাচ্ছে বলেই কয়েকখানা কাগজ অনবরত ধর্মগত বিদ্বেষ প্রচার করছে। এ বিদ্বেষ যখন জমাট বেঁধে উঠেছে তখন অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরেও বিদ্বেষ প্রচারে ব্রতী হয়েছে। এমন অনেক উকীল-মোখ্‌তার রয়েছে যারা শুধু এই কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে থাকে যে তার দ্বারা তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের মোকদ্দমাগুলি তাদের পেতে সুবিধা হয়। এ-সব কারণে আমরা ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকি। আমরা জানি দেশের জনগণকে অচেতন রেখে মিথ্যা দ্বন্দ্বের ভিতরে ঠেলে দিয়ে তাদেরকে লুণ্ঠন করাই হচ্ছে এ সাম্প্রদায়িকতার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করাই হচ্ছে 'গণবাণী'র এবং 'গণবাণী' যে দলের কাগজ সেই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'গণবাণী'র মিশন হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণপ্রথাকে তিরোহিত করা। এই কারণেই 'গণবাণী'র মধ্যে মতবাদমূলক সাম্প্রদায়িকতা আছে। সমাজের যে স্তরে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি তাতে অল্পসংখ্যক লোক বেশী-সংখ্যক লোককে লুণ্ঠন করে যাচ্ছে। তাই, এই শোষক ও শোষিতের মধ্যে একটা সংগ্রাম চলে এসেছে এবং এ সংগ্রামে আমরা শোষিতের পক্ষ অবলম্বন করেছি। কাজেই, শোষকদের পক্ষাবলম্বনকারিগণের সম্বন্ধে কোনো তীব্র মন্তব্য যদি আমরা প্রকাশ করে থাকি তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে?

আপনি জমিদার, মহাজন প্রভৃতির হয়ে কিংবা তাদের দালাল হয়ে যদি কারো বুকের রক্ত শোষণ করতে থাকেন তা হলে সে আপনাকে বুকে চেপে ধরবে এমন আশা কি আপনি করতে পারেন? নিতান্ত অন্ধ ভাবে কারো "উক্তি" মেনে চলার মতো নম্রতা আমাদের একেবারেই নেই, আর থাকাটাকে আমরা নিতান্তই মূর্খতা ও নপুংসকত্বের পরিচয় বলে মনে করে থাকি। কারো মতবাদ যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল হয় তা হলে আমরা পাঁচ হাজার বার তার সম্বন্ধে কটূক্তি ও বিদ্রূপোক্তি করব, তা সে মতবাদের প্রচারকারী গান্ধীই হউন আর দাশই হউন, তাতে কিছুই যায় আসে না। আমরা যদি জনগণের স্বার্থের সমর্থন করে থাকি, আর মিঃ গান্ধী ও দাশ সাহেব যদি সে-স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন, তা হলে আমরা তাঁদের মতের সমালোচনা না করে চুপ করে থাকব, এই কি আপনি আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন?

আপনি লিখেছেন ভদ্রলোক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের ক্রোধ খুব বেশী। আপনি আবো লিখেছেন "যাঁহাদের প্রতি (শিক্ষিত ও ভদ্রলোকগণের প্রতি) ক্রোধ এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তীব্র শ্লেষময় প্রবন্ধ লিখিয়া 'গণবাণী' প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেই কি "গণবাণী"র পনের আনা পাঠক নাই? যদি আপনি মনে করিয়া থাকেন শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত যুবকদের দ্বারাই গণের উপকার সাধিত হইবে, তাহা হইলে কি মিত্রভাবে তাহাদিগকে নিজের মতে আনা ঠিক অথবা আঘাত দিয়া দূরে সরাইবার চেষ্টা করা ঠিক?" যে-সকল শিক্ষিত ও ভদ্রলোক দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণকে 'ছোট লোক' ব'লে অশ্রদ্ধা করে থাকেন তাঁদের প্রতি আমাদের এতটুকুও শ্রদ্ধা নেই। ভদ্রলোক-নামক একটা পৃথক শ্রেণীই এদেশে গঠিত হয়ে গেছে। এমন অদ্ভুত শ্রেণী কিন্তু আর কোনো দেশের সমাজে নেই। একটা মাত্র বিশিষ্ট শ্রেণীকে ভদ্রলোক মেনে নেওয়ার মানেই হচ্ছে তাদের ছাড়া আর সকলকে অভদ্র বলে স্বীকার করা। এ জন্যে আমরা মানুষের এই তথাকথিত ভদ্রত্বর দাবীকে এতটুকুও স্বীকার করিনে। যে সকল শিক্ষিত যুবকের নিকট ভদ্রত্বই সবকিছু, আর মনুষ্যত্ব কিছুই নয়, তাঁদের প্রতি ক্রোধ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে কিছু কি অন্যায় করা হয়? আমাদের সমাজের নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা খুব দরিদ্র এবং অনেক স্থলে একেবারেই নিঃস্ব। শ্রমিক ও কৃষকগণ যেরূপ শোষিত হয়ে থাকে তাঁরাও সেরূপই শোষিত হন। কিন্তু তথাপি তাঁরা কখনো শ্রমিক ও কৃষকগণের সহিত সমবেত হয়ে শোষকগণের বিরুদ্ধে উত্থান করতে রাজি তো হনই না, পরন্তু শ্রমিক-কৃষকের উত্থানের পরিপন্থীও তাঁরাই

হয়ে থাকেন। সমাজের উচ্চস্তরের লোকগণের দ্বারা শোষিত হওয়া সত্ত্বেও এঁদের মনের টান উচ্চস্তরের লোকদের প্রতিই বেশী। কারণ, উচ্চস্তরের লোকেরা এঁদের মধ্যে একটা ভদ্রত্বর মোহ সৃষ্টি করে রেখেছে। এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে কিছুমাত্র অন্যায় কাজ আমরা করিনি। এর জন্যে কেউ যদি রাগ করে আমাদের কাগজ না পড়েন তাহলে আমরা নাচার। আমরা কখনো মনে করি না যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণের দ্বারা গণের কোনো উপকার সাধিত হতে পারে। যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক বর্তমান সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণের সহিত সম্মিলিত হবেন তখন তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডি কাটিয়েই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক আপনাকে সেই শ্রেণীর গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রেখে জনগণের উত্থানের জন্যে কখনো কোনো কাজ করতে পারেন না। কেননা, তখন তাঁর স্বার্থ হবে জনগণের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ জনগণের শোষণ করা। যে শ্রেণীকে আমি শোষণ করব সে শ্রেণীর উত্থানের জন্যে চেষ্টাও আমিই করব, এমন পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার কখনো কি ঘটতে পারে? নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোকগণের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটবে। তাঁরা যদি আপনাদিগকে 'ভদ্রলোক' মনে করেন এবং চাষী-মজুরদিগকে 'ছোটলোক' বলে ভাবেন তা হলে তাঁরাও চাষী-মজুরের উত্থানের জন্যে কোনো কাজই করতে পারবেন না। তাঁদের এই ভদ্রলোকত্বর মানসিকতা চাষীমজুর ও তাঁদের মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখবে। জনগণের সহিত একটা সমস্বার্থবোধ না নিয়ে তাদের উত্থানের জন্যে কোনো কাজই করা যেতে পারে না। নিছক লোক-হিতৈষণার প্রবণতা নিয়ে জনগণের 'উপকার' করতে যাওয়ার কোনোই মূল্য নেই। শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে একটি পক্ষই আমাদিগকে অবলম্বন করতে হবে। দু'নৌকায় পা-ও রাখব অথচ কোনো অঘটনও ঘটবে না, এমনটা মনে করাটা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ হতে পারে কি? অথচ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ছোট বড় সকল নেতাই বাহাত দেখিয়ে আসছেন যে তাঁরা দু'কূলই রক্ষা করছেন, কার্যত কিন্তু তাঁদের একটি কূলই রক্ষা হয়েছে বরাবর অর্থাৎ শোষক সম্প্রদায়ের কূল। এই কারণে আমরা যদি মিঃ গান্ধী, দাশ সাহেব ও আর আর নেতৃগণের কার্যের সমালোচনা করি এবং সে-সমালোচনা যদি কারো প্রাণে বাজে, তা হলে তার মাথায় কর্তার ভূত চেপে আছে বললে কিছু কি অন্যায় বলা হয়? বাড়ীর কর্তা মরে যাওয়া সত্ত্বেও বাড়ীর বউ তাঁর অন্যায় বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলেন এই ভয়ে যে কর্তার ভূতটি হয়তো তাঁর ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এটা হচ্ছে বীর-পূজার অত্যন্ত

খারাব পরিণাম, একেবারে দাসত্বের শামিল। চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, পরীক্ষার কষ্টি-পাথরের যাচাইতে একটা মতবাদ উত্তীর্ণ হতে পারেনি, অথচ তা সত্ত্বেও বার বার যদি তারই দোহাই দেওয়া হয় তা হলে সেটাকে ভূতাবিষ্টের লক্ষণ না বলে আর কি বলব ?

আপনি বলেছেন 'গণবাণী' আপনি আগ্রহের সহিত পাঠ করেন, তাই যদি হয়, তবে দশম সংখ্যক 'গণবাণী'তে প্রকাশিত আমাদের প্রোগ্রাম আপনি দেখেননি কেন ?

আপনার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কম্যুনিস্ট নেতা বলে যাঁরা খ্যাত তাঁরা শিক্ষিত ও ভদ্রলোক কিনা ? হাঁ, কম্যুনিস্ট নেতারা শিক্ষিত হতে পারেন বটে, কিন্তু, তার জন্যে তাঁরা সমাজের উৎপাদক শ্রেণীকে 'ছোটলোক'ও বলেন না, অশ্রদ্ধার চোখেও দেখেন না। আর, ভদ্র-শূদ্রের পার্থক্য তো তাঁরা করতেই পারেন না।

আর বেশী কিছু লিখার দরকার আমরা মনে করিনে। অনুগ্রহপূর্বক এ উত্তরটি আপনার 'বীরভূমবাণী'তেও প্রকাশ করবেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
'গণবাণী'র অন্যতর সম্পাদক

গণবাণী : ২৮শে জুলাই, ১৯২৭

নিবেদন

[শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লেখকগণের প্রতি]

বর্তমান সময়ে দেশময় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষের কথাটাই আর সকল কথার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, সত্য কথা বলতে গেলে শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের খাতিরে একথাটাকে বড় করে তোলা হয়েছে। যে সকল কথার কোনো মানে নেই সে সকল কথা নিয়ে ঝগড়া-কলহ, এমন কি মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত করা যেন ভারতবর্ষের হিন্দু আর মুসলমানগণের একমাত্র ধর্ম হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে ধর্মের ভাবটা খুবই বেশী। একথাটাকে আরো খোলাসা করে বলতে গেলে এই বলতে হবে যে ধর্মের নাম করে ভারতের লোক-দিগকে, বিশেষ করে ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে যত বেশী ঠকানো যায় এমনটা জগতের আর কোনো দেশেই পারা যায় না। জগতে এমন সব লোক রয়েছে যারা শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত ভাবে আপন আপন শ্রেণীর বা কেবল আপনার লাভ লোকসান ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তাদের ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবীটা রসাতলেও যদি যায় তাতেও তারা মনে করে যে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেরা কোন মেহনত করে না, পরের মেহনত লুঠ করে খাওয়াই তাদের রীতি ও অভ্যাস। জমিদার, মহাজন, কারখানার মালিক, মোল্লা-পুরোহিত, সন্ন্যাসী-ফকির প্রভৃতি কি কখনো কোনো পরিশ্রম করে? পৃথিবীর কোনো কাজই বিনা মেহনতে হতে পারে না, একথা সকলেই বোঝে। অথচ যারা মেহনত করে না তাদেরই দিন কাটে আরামে আর বিলাসে। আর যারা রাতদিন খেটে খেটে মরে যাচ্ছে তাদের সকল দিকেই অভাব, তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো শেষ নেই। একটানা অভাবের ভিতর দিয়ে কেবলমাত্র খেটে মরার জন্যেই যেন তাদের জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধনে ধান্যে ভরা পৃথিবীতে যারা সে-সবের উৎপাদক তারাই থাকলো সব কিছু হতে বঞ্চিত হয়ে, আর যারা কখনো কিছু উৎপাদন করলে না সেই সামান্য ক'জন লোক, শতকরা পাঁচ জনও নয়, হ'ল কিনা উৎপন্ন করবার সকল উপায়ের মালিক। পরম বিচারক আল্লা-ভগবানের রাজ্যে এমন অবিচার কেন হয় তা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়

তা হলে মোল্লা-পুরোহিত, সন্ন্যাসী-ফকির প্রভৃতি একযোগে বলে ওঠে যে এ হচ্ছে পূর্বজন্মের কর্মফল আর নসীবের লেখা।

ভারতের চাষী-মজুর ও নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকেরা চিরকালই কি এমনি ভাবে পূর্বজন্ম ও নসীবের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে লুণ্ঠিত হতে থাকবে? কৃষকগণ যাবতীয় খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল পয়দা করে থাকে। শ্রমিকগণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুই তৈয়ার করে। সব কিছুর উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা এত বেশী খারাব কেন হয় সেটা বিচার করে দেখার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কৃষক খাবার জিনিস উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু, তার ঘরে খাবার থাকে না। ভাল পোশাক সে পায় না, ভাল ঘরে বাস করা কখনো তার ভাগ্যে ঘটে উঠে না। মজুরদের অবস্থা আরো খারাপ। দিনে দশ, এগারো, কোথাও বা ষোলো ঘণ্টা পর্যন্ত খেটেও তারা যা খেতে পায় তা মানুষের খাদ্য মোটেই নয়। ঘরের নামে দুর্গন্ধ-ভরা যে অন্ধকূপগুলিতে তারা বাস করে থাকে সেগুলি মানুষের তো দূরের কথা, কোনো পশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপযোগী নয়। আবার এ নরককুণ্ডগুলির ভাড়া শোধ দিতে না পারলে মালিকগণের জুলুমের কোনো সীমা থাকে না। পাথর ভেঙে, মাটি কেটে সুন্দর সুন্দর রাস্তা যারা তৈরী করেছে, শহরের পর শহর যারা পত্তন করেছে, বড় বড় পাকা ইমারতগুলি যাদের হাতের তৈরী তাদেরকে কিনা বাস করতে হয় কাদা, পচাজল ও দুর্গন্ধে ভরা পরিত্যক্ত পল্লীগুলিতে, অসুখ-বিসুখ হলে পথ্যের ও ঔষধের অভাবে তাদের কোলের বাছারা কোলেই মরে যায়। কেউ তাদের প্রতি চেয়েও দেখে না, আর ধনীর বাড়ীতে যদি কারো সামান্য অসুখও হয় তো হলে সেখানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড বেধে যায়। এ ডাক্তার সে ডাক্তারের আগমনে, এর ওর তার হায় আফসোসে সমস্ত পাড়া মুখরিত হয়ে উঠে। কৃষকের থালায় যখন ডাল-ভাতও পড়ে না তখন জমিদারের ঘরের রকমারি খাদ্যের সুগন্ধে পাড়া ছেয়ে ফেলে। কিন্তু, জমিদার কি কখনো কিছু উৎপন্ন করেছে তার নিজের হাতে?

নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকেরা অফিস, আদালত ও দফতরগুলোকে রাতদিন খেটে খেটে দাঁড় করিয়ে রাখে, আর মজা লুঠে তাদেরই ভাই বেরাদর বড় বড় অফিসারেরা। তাদেরই মধ্য থেকে যারা ডাক্তার উকিল প্রভৃতি হয়ে বের হয় তারা তাদের প্রতি চেয়েও দেখে না। তাদের লোকদের দিয়ে তাদের শোষণ করানো হয়। অফিসে-আদালতে মাইনে

যখন বাড়ে, তখন বেশী-মাইনেওয়ালাদেরই বাড়ে। কথায় কথায় কাজ থেকে কম-মাইনেওয়ালারাই অপসারিত হয়ে থাকে। এরূপ ভাবে প্রতিনিয়তই তারা অবহেলিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। তাদেরও ঘরগুলি দুঃখ-কষ্ট ও দৈন্যে ভরা। কিন্তু, চাষী ও মজুরদের চেয়ে অধিকতর সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তারা চাষী ও মজুরের সহযোগে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় না। তার কারণ এই হচ্ছে যে সমাজে উচ্চস্তরের লোকেরা নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটা ভদ্রত্বর মোহ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাদেরকে বলা হয়ে থাকে যে "তোমরা চাষী-মজুরদের মতো ছোটলোক নও, তোমরা ভদ্রলোক। তোমাদের পেটে অন্ন যাক আর না যাক, আমাদের সাথে মিশবার, ওঠা-বসা করবার অধিকার তোমাদের আমরা দিচ্ছি।" এই মিথ্যা ভদ্রত্বের মোহতে আবিষ্ট হয়ে আমাদের নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকেরা কৃষক ও শ্রমিকদিগের থেকে দূরে দূরে সরে থাকে।

কিন্তু সমাজের এ-সব বৈষম্য দূর করতে না পারলে দেশের জনগণের দুঃখ-কষ্টের অবসান কিছুতেই হবে না। অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা বিরাট বিশাল গণশক্তি যে প্রতিনিয়ত শোষিত, পদদলিত হচ্ছে তার শেষ না করলেই নয়। এর জন্যে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকদিগের একই স্বার্থবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। চারদিক থেকে কিভাবে তারা শোষিত হচ্ছে সেটা তাদের বিশেষ করে তলিয়ে বোঝা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

জমিদার জমির জন্যে কিছু করে না। জমির উন্নতি বিধান করছে কৃষক, জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করছে কৃষক, অথচ সেই কৃষকের ঘরে অন্নের জন্যে হাহাকার লেগেই আছে। কারখানাতে খেটে মরছে মজুর আর মজা লুটছে কারখানার তথাকথিত মালিকরা। মালিক যে মূলধন কারখানায় ঢালছে তার পাঁচগুণ তুলে নেবার পরও সে কারখানার মালিক থেকে যায়। মজুরদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ওপরে দস্যুপনা করেই মালিকেরা মজা করে যাচ্ছে, মজুর যেখানে পাঁচ টাকা রোজগার করছে সেখানে তাকে দেওয়া হয় মাত্র এক টাকা কি দেড় টাকা। মজুরদের অতিরিক্ত পরিশ্রমটা অপহরণ করে বলেই পুঁজি পাঁচগুণ তুলে নেওয়া সত্ত্বেও কারখানা চলে এবং খুব জোরে জোরে চলে।

কিন্তু, সামাজিক ও অর্থনীতিক বৈষম্য এ ভাবে কতকাল চলতে থাকবে? কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণীর লোকগণ এক জায়গায় জমায়েত হয়ে এ-সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করুক। সমাজদেহে পরগাছাস্বরূপ হয়ে

যারা সমাজের দেহের রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদেরকে নিপাত না করতে পারলে দেশের মঙ্গল কিছুতেই হবে না। আমাদের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার কানাকড়িরও মূল্যও থাকবে না যদি সে-স্বাধীনতার ভিত্তি সামাজিক ও অর্থনীতিক স্বাধীনতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ইংল্যান্ডের ধনীদের পরিবর্তে ভারতের ধনীদের আমাদের সর্বময় কর্তা করলে আমাদের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হবে না। তখনই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে যখন দেশের জনসাধারণের হাতে দেশের সকল ক্ষমতা আসবে। কিন্তু, যতক্ষণ সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনীতিক উৎপীড়ন থাকবে ততক্ষণ কিছুতেই দেশের জনসাধারণের হাতে কোনো ক্ষমতাই আসতে পারে না।

আমাদের সমাজের নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকগণ আপনাদিগকে কৃষক ও শ্রমিকগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করে আসছে। তারা যদি এমনি ভাবে আপনাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখে তা হলে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে। যারা তাদের শোষক তাদের সহিত তাদের স্বার্থ কখনো এক হতে পারে না। শোষিত মাত্রকেই একপতাকাতলে দণ্ডায়মান হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তাই, নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকগণ, তোমাদের ভদ্রত্বর অহংকার তোমরা পরিহার কর। একটুকু চিন্তা করে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এ অহংকার তোমাদের পায়ের বেড়ি হয়ে আছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামে তোমরা হবে জ্ঞানের যোগাড়িয়া, শ্রমিকেরা হবে অগ্রগামী সৈন্যদল, আর কৃষকেরা হবে বিশাল রক্ষিত সৈন্য। সমস্বার্থবোধের দ্বারা, তিন দলের সমবেত সংগ্রামের দ্বারা আমরা যা লাভ করব সে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে তা নয়, সামাজিক স্বাধীনতাও তা হবে।

শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর ভাইগণ, দেশে যে একটা ধর্মগত সাম্প্রদায়িক কলহের বান ডেকেছে এ বান থেকে তোমরা আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রেখো। ধর্ম রক্ষার জন্যে এ সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করা হয়নি, এ হয়েছে তোমাদের সর্বনাশ সাধনের জন্যে। এ কলহের পেছনে ধনীদের হাত কাজ করছে। তারা চায় কোনো কিছুর দ্বারা তোমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে। তোমরা সকলে এক স্বার্থবোধের দ্বারা একীভূত হলে ধনিক-বণিক ও জমিদারের সর্বনাশ হবে। তারি জন্যে তারা এ সর্বনেশে বিরোধ দেশে বাধিয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তোমাদের অনেক আপন লোকই এ বিরোধাগ্নিতে কাঠ ও কয়লা যোগাচ্ছে। কেউ সস্তা দামের খবরের কাগজ বার করে দিয়েছে। কাগজ বিক্রীর পয়সাতে

তার পকেট ভরে উঠেছে। আবার কেউ বা প্রচারক সেজে তোমাদেরকে উত্তেজিত করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছ থেকে আদায় করে দু'পয়সা তার নিজের পকেটেও ফেলছে। এই শেষ বস্তুটি তার প্রকৃত লক্ষ্য, ধর্মটা উপলক্ষ মাত্র। এ সকল লোকের খর্পরে পড়ে তোমরা নিজেদের সর্বনাশ করছ।

ভ্রাতৃগণ! ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস তোমাদের প্রতিষ্ঠান না হয়ে বড়লোকদের প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে। সে জন্যে কংগ্রেস তোমাদের স্বত্ব-স্বামিত্বের জন্যে কোনো চেষ্টাই করেনি। বাংলা ও বোম্বেতে কৃষক ও শ্রমিক দল (The Workers' and Peasants' Parties) গঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ দল সমগ্র ভারতময় গঠিত হবে। এ দলের উদ্দেশ্য ভারতের জনসাধারণের জন্যে জনসাধারণেরই দ্বারা পরিচালিত শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। তোমরা সকলে এসে এ দলের পতাকাতলে সমবেত হও। এ দলের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসকেও তোমরা অধিকার করে নিতে পারবে।

গণবাণী : ১৪ই আগস্ট, ১৯২৭

কৃষক ও শ্রমিক
এবং
শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়*

বন্ধুগণ,

কৃষক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিবার জন্য আপনারা আপনাদের লোক ভাবিয়া আমাকে যে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহাতে আমি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এই কৌলিন্য, আভিজাত্য ও বীর-পূজার ভারতবর্ষে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রশ্ন অধ্যয়নে আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাস্তবিবই প্রাণে অনেক আশার সঞ্চার হয়। ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আমাদের যুবকগণের উপরে কত বেশি দায়িত্ব যে চাপানো রহিয়াছে এবং এ সংগ্রামে দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণের স্থান যে কত অধিক উচ্চে অবস্থিত তাহা আমরা যুবকেরা যে দিন সত্যকার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব সে দিনই আমাদের জাতীয় সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। আজ আমি এখানে দাঁড়াইয়া এই কথাটিকে কেন্দ্র করিয়াই আমার বক্তব্যটুকু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছুকাল ধরিয়া বাংলা দেশের নানা স্থানে যুবক সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। ভারতের অন্যত্রও এরূপ সম্মেলনের অধিবেশন যে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু, এ প্রকারের সম্মিলনের ফলে যে জিনিসটি মূর্ত হইয়া উঠা উচিত ছিল তাহার এতটুকু লক্ষণও কোনো দিকে আজো প্রকাশ পায় নাই। আমি সমগ্র ভারতময় একটা যুব আন্দোলনের কথাই বলিতেছি। একটা আমূল সংস্কারের ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া কেবলমাত্র বাংলা দেশেও আজ পর্যন্ত যুব আন্দোলন মাথা তুলিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে যে সকল যুবক সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে সে সকলের পশ্চাতে কোনো প্রকারের সুসংহত যুবক-শক্তি বিদ্যমান নাই।

---

* ঢাকা জেলার বিশেষ যুব-সম্মিলনে শ্রমিক ও কৃষক বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।

ভারতের যুবক আন্দোলন শুধু যে নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ভাবে চলিতেছে তাহা নহে, ইহাতে জীবন ও যৌবন এ উভয় জিনিসেরই একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। পৃথিবীর আর আর দেশে যুবকেরা যখন নূতনকে জয় করার জন্য অভিযান করিতেছে তখন আমরা ভারতের যুবকগণ পুরাতন গতানুগতিকতার ভিতরে কেবলই ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছি। আমরা কোনো বড় আদর্শকে আমাদের সম্মুখে খাড়া করিতে পারি নাই, স্বাধীন ভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারেও আমরা ব্রতী হই নাই। বীর-পূজার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পূতিগন্ধময় প্রচলিত প্রথার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া এবং বর্তমান কালের অনুপযোগী হাজার হাজার বছরের জীর্ণ দর্শনকে অভ্রান্ত সত্য মনে করিয়া আমরা নূতনকে বরণ করিবার প্রবৃত্তি একেবারেই হারাইয়া বসিয়াছি। দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন করিব মনে করিয়া আমরা দাসত্বকেই গলার হার করিয়া লইয়েছি।

যুবকেরা দেশের সর্ববিধ কাজের অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহেন এরূপ একটা ধারণা এদেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমরা বেশীর ভাগ জায়গায় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে সেবা-ধর্ম পালন করাই যুবক সংগঠনের একমাত্র কাজ বলিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে যুবক সংগঠনসমূহ সেবা-ধর্মের কাজ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু, তাহাই সংগঠন-সমূহের প্রধান ও একমাত্র কাজ কিছুতেই হইতে পারে না। তারপরে, ধর্মের নামে এমন কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে সবের প্রতিপালনে সাহায্য করিয়া সেবা-ধর্মের পালন করা তো উচিতই নয়, পরন্তু, সে সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাই যুবক সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্থলে স্নান-পর্বসমূহের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নদী, নালা ও পুকুরসমূহে স্নান করিতে যাইয়া থাকে। এ সকল কুসংস্কারের কাজে কোনো প্রকারের সহায়তা না করিয়া যাহাতে সে-সকল কাজ হইতে দেশের লোকগণ বিরত হয় সর্বতোভাবে সে চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এমন আরো অনেক কুসংস্কার ব্রতের নাম করা যাইতে পারে। আমি এমন যুবক-সঙ্ঘ দেখিয়াছি যাহাতে এরূপ সব কাজে সহায়তা করাই বৃহত্তম কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমরা যুবকেরা বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তি লইয়াই সকল কাজ করিব এবং দেশের ছোট বড় সকল কাজেই শুধু অংশ গ্রহণ করিলেই আমাদের চলিবে না, বিশিষ্ট অংশই

আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের জাতীয় মুক্তি-লাভের সংগ্রামে আমাদের দায়িত্ব যে বৃদ্ধদের চেয়ে ঢের বেশী একথা আমাদিগকে মনে-প্রাণে বুঝিয়া লইতে হইবে।

মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা আমরা বলিতেছি, আর সকলকে বলিতে শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের বন্ধন যে কোথায় তাহা আমরা অনুভব করিবার চেষ্টা আদৌ করিতেছি না। আমাদের মুক্তির স্বরূপই বা কি হইবে তাহারও কোনো পরিষ্কার মূর্তি আমাদের চোখের সম্মুখে নাই। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ভারতের যুবকগণ, বিশেষ করিয়া বাংলার যুবকগণ, দেশের মুক্তির জন্য জীবন পর্যন্ত মূল্য প্রদান করিয়াছেন, আর দুঃখ-কষ্ট যে কত সহিয়াছেন ও আজো সহিতেছেন তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু, তাঁহারা যে ঠিক পথে চলিয়াছেন তাহা তো আমার মনে হয় না। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আন্দোলনকে বাদ দিয়াও বিদেশী শাসনের হাত হইতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্যে দুইটি চরম আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে মাথা তুলিয়াছিল। কর্ম-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও দুইটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য একই ধরনের ছিল এবং দুইটি আন্দোলনেরই অল্প-বিস্তর জের আজো পর্যন্ত চলিতেছে। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে ওহাবী আন্দোলন মাথা তুলিয়াছিল, আর এ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাথা তুলিয়াছিল ত্রাস-নীতি-মূলক বিপ্লবান্দোলন এবং বাংলা দেশ গ্রহণ করিয়াছিল এ আন্দোলনের নেতৃত্ব। মুসলমানদের মধ্যে একটা শাখাকে ওহাবী বলা হয়। এই ওহাবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ও পাঞ্জাবের শিখ নরপতি রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিখগণের অত্যাচার হইতে পাঞ্জাবের মুসলমানগণকে বিমুক্ত করা এবং ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া পুনরায় মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। ওহাবীদের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই এ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে যে ত্রাস-নীতি-মূলক বিপ্লব মাথা তুলিয়াছিল তাহাতে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণই যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দু-রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দুইটি বিপ্লবী দলই ধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ওহাবী মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কোর্-আন্ ও হাদিস্ হইতে আর হিন্দু যুবকগণ তাঁহাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন গীতা ও

উপনিষদ্ হইতে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দমন-নীতির ঝড় উভয় দলেরই মাথার উপর দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে বহিয়া গিয়াছে। অবশ্য মুসলমান-দিগকেই এ ঝড়ের বেগটা কিছু বেশী মাত্রায় সহিতে হইয়াছে। কেননা, তাঁহারা প্রকাশ্য উত্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। দুইটি বিপ্লবেরই প্রদমনে একই চরম ঔষধ কাজ করিয়াছিল, আর সে ঔষধ ছিল বিপ্লবপন্থীদিগকে রাজবন্দী করিয়া রাখিয়া দেওয়া। ১৮৬৮ সন ও তাহার পরবর্তী সময়ে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বহু মুসলমানকে রাজবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। গভর্নমেণ্টের মতে ইহারই দ্বারা ওহাবী আন্দোলন মিলিয়া গিয়াছিল। ১৯০৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৯ সন পর্যন্ত ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন ও যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী শত শত হিন্দু যুবককে বন্দী করিয়া ত্রাস-নীতি-মূলক আন্দোলনকে গবর্নমেণ্ট প্রদমিত করিয়াছে। একথা বলা বাহুল্য হইবে যে নিতান্ত সংকীর্ণ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই উপরি-উক্ত দুইটি আন্দোলনের সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং সংকীর্ণতারই জন্য দুইটি আন্দোলনই অকৃতকার্য হইয়াছে। সত্যকারের বিপ্লবের ভিত্তি কোনো প্রকারের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তারপরে ধর্মের নামে বিপ্লব সাধন করার যুগ বহুকাল পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম-সম্প্রদায় পৃথিবীতে অনেকই রহিয়াছে। কিন্তু, ইহার একটিও আপনার সংকীর্ণ গণ্ডি লইয়া আজিকার দিনে আর কিছুতেই পরিতুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। বিশিষ্ট গণ্ডির ভিতরে সন্তুষ্ট থাকার জন্য ধর্ম বরাবরই উচ্চ প্রাচীর খাড়া করিয়াছে বটে, কিন্তু, অর্থনীতিক শক্তি সে-প্রাচীরকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রভৃতি কোনো সম্প্রদায়ই শুধু আপন আপন সম্প্রদায়কে লইয়াই জীবনযাত্রা কিছুতেই আর নির্বাহ করিতে পারিতেছে না, অপর সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিবার জন্য অর্থনীতিক শক্তি প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই বাধ্য করিতেছে। কাজে কাজেই, কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়কে লইয়া কোনো একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়েরই জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো বাতুলতা আজিকার দিনে আর কিছুই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষকে আজ আমরা স্বাধীন ও মুক্ত করিতে চাই, কিন্তু, কাহার কবল হইতে? একথা সকলেই জানেন যে বৃটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের যিনি রাজা তিনি ভারতের সম্রাটও বটেন এবং এই সম্রাটেরই নামে ভারতবর্ষ শাসিত হইয়া থাকে। সম্রাট নিজে যেমন

ভারতবর্ষ শাসন করেন না, ঠিক তেমনি তাঁহার জন্যও ভারতবর্ষ শাসিত হয় না। ভারতশাসনের কলকাঠি যাহারা ঘুরাইয়া থাকে তাহারা হইতেছে গ্রেট বৃটেনের ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়। ইহারা ইহাদের অর্থনীতিক ও সামাজিক শক্তিকে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও আপনার সম্পূর্ণ কবলগত করিয়া রাখিয়াছে। এই ত্রিশক্তির জোরে বৃটিশ ধনিক-বণিকগণ বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের এই বিশ্বজয়ী শক্তিই বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধনিকবাদের উন্নততম আকারকেই ইম্পিরিয়েলিজম বলা হয়। আপন দেশের শ্রমিকগণের শোষণের ভিতর দিয়াই প্রথমে ধনিকবাদের কার্যারম্ভ হয়। কিন্তু, ইহার ব্যবসায়ের প্রসার যতই বিস্তৃত হইতে থাকে ততই ইহাকে নূতন বাজারের ও কাঁচা মালের উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। অর্থাৎ ধনিকদের কারখানা যখন বিস্তৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন কল-কব্জা তাহাতে বসানো হয় তখন উহার মাল উৎপন্ন করিবার ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। এই অত্যধিক উৎপন্ন মাল ধনিকদের আপন দেশ ব্যবহার করিয়া কিছুতেই শেষ করিতে পারে না। কাজেই প্রয়োজন হইয়া পড়ে অন্য দেশে নূতন বাজারের। অত্যধিক উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে অত্যধিক কাঁচা মালেরও দরকার হয়। তত বেশী কাঁচা মাল ধনিকগণের নিজেদের দেশে পাওয়া যায় না এবং কোথাও কোথাও মোটেই পাওয়া যায় না। এই কারণে, কাঁচা মালের উৎপত্তিস্থল-সমূহের সন্ধানও ধনিকদিগকে করিতে হয়। অনেক সময় কাঁচা মাল উৎপত্তির দেশেই সস্তা কাঁচা মাল ও সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়া এবং রক্ষণ-শুল্ক ইত্যাদিকে এড়াইবার সুবিধা হয় বলিয়া ধনিকগণ কারখানাও স্থাপন করিয়া বসে। ধনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই এ সকল কাজ সম্ভব হইয়া থাকে। অপর দেশসমূহকে এইরূপে শোষণ করিবার জন্য ধনিকগণ সর্বদাই আপনাদের করতলগত রাষ্ট্রীয় শক্তিকে শুধু যে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নয়, যদৃচ্ছা ব্যবহারই করিয়া থাকে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা অপর দেশকে রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক ভাবে কিংবা শুধু অর্থনীতিক ভাবে পদানত করিয়া থাকে। এই যে পদানতকরণ, ইহারই নাম হইতেছে ইম্পিরিয়েলিজম।

আমরা ভারতবাসীরা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দ্বারা সকল দিক হইতেই পদানত হইয়া আছি। ইম্পিরিয়েলিজমের শাসন শোষণেরই জন্য হইয়া থাকে, এবং ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণ যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে শোষিত হইয়া থাকে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শুধু কৃষক

ও শ্রমিকগণ শোষিত হয়, একথা আমি এজন্য বলিয়াছি যে যাবতীয় ধন ও সম্পদ কেবলমাত্র তাহারাই হস্তের ও মস্তিষ্কের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষে দুই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাতন ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষের শৈল্পিক উন্নতির পরিপন্থী ছিল। উন্নত কল-কব্জার সংযোগে ভারতে মাল তৈয়ার হয় এমন নীতির পক্ষপাতী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ছিল না। এ কারণে, মেশিনের উপরে খুব চড়া আমদানি শুল্ক বসানো হইয়াছিল। এদেশে মেশিনে প্রস্তুত মালের উপরেও আবগারী শুল্ক বসিয়াছিল। কিন্তু, বিগত যুদ্ধের দ্বারা অবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে। ভারতে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের বর্তমান নীতি হইতেছে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় করিয়া তোলা এবং ভারতের ধনিকগণকে আপনার অধীন অংশীদাররূপে গ্রহণ করা। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে উহার বর্তমান নীতি অবলম্বন করিতে জগতের অবস্থাই বাধ্য করিয়াছে। ভারতের ধনিক-বণিকগণ অত্যন্ত পরিতুষ্টির সহিত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অধীনে অংশীদার হইয়াছে। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের প্রাথমিক দিকটা ব্যতীত আর সকল সময়েই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ধনিক-বণিকগণের,—জনগণের নয়,—অবস্থার উন্নতি সাধন করা। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোনো জাতীয় আন্দোলন জনগণের ভালর জন্য কোনো দাবী কখনো পেশ করে নাই। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনও উহার দাবী পরে তুলিয়া লইয়াছিল। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বুঝিয়াছে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করার জন্য ভারতীয় ধনিক-বণিক ও অভিজাত শ্রেণীর সহিত আপোস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কেননা, রাশিয়ার বিপ্লব জগতের ইম্পিরিয়েলিজম-সমূহের জন্য অনেক সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। এদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়েল কমিশন ও মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের দ্বারা যতটুকু অধিকার ভারতীয় ধনিক-বণিক ও উচ্চ-মধ্য শ্রেণীর লোকেরা পাইয়াছে তাহাতে তাহারা এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের এই অধীন অংশীদারত্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা একদিন সমান অংশীদারত্বে পরিণত হইবে। সমগ্র জগতের শ্রমিক ও কৃষকগণ যখন ধনিক ও জমিদারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে তখন ভারতের ধনিক-বণিক ও ভূম্যধিকারিগণও আপনাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহারা জানে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃটিশ ধনিকগণের সহিত ভাগাভাগি করিয়া ভারতীয় জনগণকে, বিশেষ করিয়া ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণকে তাহারা মনের সুখে লুণ্ঠন করিতে পারিবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আন্দোলন হইতেছে ভারতের উৎপাদক শ্রেণীর দাসত্বকে সুদৃঢ় করার আন্দোলন।

আজিকার দিনে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে এবং যে বিপ্লব সংঘটিত হইবে তাহা কখনো ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েলের বিপ্লব কিংবা ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লবের মতো হইবে না। এই দুইটি বিপ্লবে ফিউডাল ও অভিজাত শ্রেণীর সহিত ক্ষমতা-প্রয়াসী ধনিকগণের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। জগতের সে-অবস্থা এখন আর নাই। জগতে এখন ধনিকগণেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শোষিত জনগণ এখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে ধনিকগণের প্রভুত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে। পুরাতন প্রথাকে ধ্বংস করিয়া তাহার জায়গায় নূতনের প্রবর্তন করার নামই হইতেছে বিপ্লব বা রিভোলিউশন। ধনিক-শোষণ-প্রণালীকে ধ্বংস করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ শোষিত জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী চেষ্টাই আজিকার দিনে বিপ্লব বা রিভোলিউশন নামে আখ্যাত হইতে পারে। এই হিসাবে ভারতের ত্রাস-নীতি-মূলক গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা আন্দোলনকে বিপ্লব বলা যাইতে পারে কিনা তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা, ত্রাস-নীতিবাদিগণ যে কখনো শোষিত জনগণের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকেই আপনাদের আদর্শে পরিণত করিয়াছিলেন এ সংবাদ তাঁহাদের আত্ম-বিবৃতি হইতে আমরা কখনো জানিতে পারি নাই।

আমাদের রিভোলিউশন বা বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইবে কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ জনগণের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা আর তাহার কার্য হইবে কৃষক ও শ্রমিকগণের উত্থান। এই একটিমাত্র পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা এই কাজ না করিয়া যদি আর কিছু করি তবে আমারা বিপ্লব-বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইব।

স্বাধীনতা যদি যুবকগণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধনাভিজাত্য, জ্ঞানাভিজাত্য, ভূম্যাভিজাত্য ও বর্ণাভিজাত্য প্রভৃতি পরিহার করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের ভিতরে তাহাদেরই লোক হইয়া কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। কৃষকগণের নিরক্ষরতা তিরোহিত করিবার জন্য চীনে চল্লিশ হাজার যুবক আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিরক্ষরত্বকে বিদূরিত করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণকে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চীনের ছাত্রগণ ও চীনের যুবকগণ

অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। গোটা চীনের আবহাওয়াই তাঁহারা পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন ও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নূতন বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার দ্বারা তাঁহারা সমস্ত চীনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বহু সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বহু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কোনোটিরই উদ্দেশ্য হাজার হাজার বছরের পুরাতন ভাবধারাকে আজিকার জীবনের সহিত খাপ খাওয়ানো নহে—সব কয়টিরই উদ্দেশ্য পূতিগন্ধময় পুরাতনের বহিষ্করণ এবং নূতনের বরণ। চীনের যুবকান্দোলন হইতে ভারতীয় যুবকগণের কিছুই কি শিখিবার নাই? চীনের যুবকগণ যখন নূতন আলোকরাশির দ্বারা তাহাদের দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন তখন ভারতের যুবকগণ করিতেছেন কিনা পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ! জানি না, আমাদের শালীনতাবোধ কোথায় গিয়াছে।

হীন-সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকত্বকে ঘৃণাভরে পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বকে বরণ করিয়া লইতে না পারিলে আমরা ভারতের যুবকগণ কোনো কাজেই আসিব না।

আমরা চেষ্টা করিলেই অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমাদের কাজের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিবন্ধক হইতেছে আমাদের অভিজাত মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তিকে দূর করিতে না পারিলে আমরা কোনো কাজই করিতে পারিব না। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের একটা বিশিষ্ট শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদিগকেই গড়িয়া লইতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিশিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে, কারখানায় প্রবেশ করিয়া মজুরের জীবনের সহিত আমাদিগকে মিশিয়া যাইতে হইবে। চাষী আর মজুরদিগের হৃদয়ে ভাল খাওয়ার জন্য, ভাল পোশাক পরার জন্য এবং সর্বোপরি ভাল ভাবে ভাল জায়গায় বাস করার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে না পাইয়াও মানুষের জীবনকে অভাবহীন করিয়া গড়ার ন্যায় অভিশাপ পৃথিবীতে আর কিছুই হইতে পারে না।

আমাদের কৃষকগণ, শ্রমিকগণ, এক কথায় জনগণ সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক ভাবে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ না করিলে ভারতবর্ষ কখনো স্বাধীন হইবে না, ইংরেজ চলিয়া গেলেও না। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের জনগণের দ্বারা এবং জনগণেরই জন্য পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে।

যে মুক্তি-সংগ্রামে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি শ্রেণী-সংগ্রাম তাহার একটা রূপ। সমাজে যেদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে সেদিনই

সম্পত্তির অধিকারীর সহিত সম্পত্তিহীনের সংঘাতও বাধিয়াছে। উৎপাদনের যাবতীয় উপায়সমূহের উপর যাহারা প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে তাহাদের সহিত শোষিত উৎপাদকগণের সংঘাত ও সংগ্রাম অনিবার্য রূপেই চলিয়াছে এবং যতদিন না সম্পত্তিশালীদের শোষণপ্রথা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ততদিন চলিতেও থাকিবে। আমাদের দেশের অনেক ধনিক নেতা ও ধনিকের প্রসাদ-প্রয়াসী নেতা শ্রেণী-সংগ্রামের নামে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কেননা, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থের হানি হইবে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামের নামে আপত্তির বেলায় তাঁহারা স্বার্থহানির কথা উচ্চারণও করেন না। তাঁহারা বলেন,—"এ-সব পাশ্চাত্যের জিনিস, প্রাচ্যের আবহাওয়াতে কিছুতেই সহিবে না।" পাশ্চাত্যের নিকট হইতে প্রাচ্য কত কিছু গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিনিয়ত করিতেছে—তাহাতে এ-সব নেতার আপত্তি কখনো হয় না। তাঁহারা নিজেরা যে রাতদিন পাশ্চাত্যের হীনতম ভাবে মশগুল হইয়া থাকেন তাহাতেও প্রাচ্যের কোনো ক্ষতি হয় না! প্রাচ্যের ক্ষতি হয় শুধু না কি শ্রেণী-সংগ্রামের বেলায় যাহা কোনো দেশের বিশিষ্ট বস্তু মোটেই নয়। ধন-বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি সকল দেশেই হইয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা সকল দেশেই সমাজের নানাবিধ বিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। এক কথায়, মানব-সমাজের ইতিহাসই হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামও নিছক শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম এবং উহার অংশীদার ভারতীয় ধনিকবাদ ও ভূম্যাভিজাত্য আমাদের দাসত্ব ও অধীনতার মূলীভূত কারণ। এই শক্তিগুলি আমাদের দেশের উৎপাদকগণকে অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকগণকে দুই হাতে শোষণ করিতেছে। কৃষক ও শ্রমিকগণ উত্থান করিয়া যদি এই শোষণকারী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে তবেই আমরা সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব, অন্য কোনো উপায়ে নহে। ভারতময় সংহত যুবক-শক্তি কৃষক ও শ্রমিক উত্থানের কাজে আপনাদিগকে মনে প্রাণে নিয়োজিত করুক।

গণবাণী ১৯শে আগস্ট, ১৯২৭

কৃষক ও শ্রমিক দল

কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য-তালিকা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে বুঝে উঠতে পারছেন না যে এ দলটা কি জিনিস। গবর্নমেন্টের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের অনেক লোক, বিশেষ করে শিক্ষিত লোকও এ দলকে কম্যুনিস্ট দল বলে মনে করে থাকেন। তাঁদের এরূপ মনে করার পক্ষে কি যে যুক্তি রয়েছে তা অবশ্য আমরা জানিনে, তবে আমাদের মনে হয় যে, দু-একজন কম্যুনিস্ট এ দলের ভিতরে রয়েছেন বলেই হয়তো অনেকে একে কম্যুনিস্ট দল বলে মনে করে থাকেন। 'কম্যুনিজম' কি জিনিস আর কম্যুনিস্ট দলই বা কেমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিত তা অনেকের জানা না থাকাই হচ্ছে এরূপ ভুল ধারণার আর-এক কারণ। মানবতার চরমোৎকর্ষ সাধন করার পক্ষে 'কম্যুনিজম'-এর চেয়ে সেরা মতবাদ আর কিছুই হতে পারে না। কৃষক ও শ্রমিক দল যদি সত্য সত্যই কম্যুনিস্ট দল হত তা হলে এর পক্ষে তা অগৌরবের বিষয় কিছুই হত না। কিন্তু, প্রকৃতই যখন কৃষক ও শ্রমিক দল কম্যুনিস্ট দল নয় তখন একে মিছামিছি কম্যুনিস্ট দল নামে আখ্যাত করে সত্যকারের কম্যুনিস্ট দলের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

কৃষক ও শ্রমিক দল কি ?

ভারতবর্ষে যতগুলি রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক দল ছিল সেগুলোর অকৃতকার্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই কৃষক ও শ্রমিক দলের উদ্ভব হয়েছে। এ দল আপনা হতে সৃষ্টি হয়নি, সমাজের বাস্তব অবস্থাসমূহ (material conditions of the society) এ দলকে সৃজন করেছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে একবার মাত্র জনগণের সংস্পর্শে এসেছিল। জনগণ যখন কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠেছিল তখনই কংগ্রেস জনগণের কার্য-তালিকা পরিহার করে বসলো। ১৯২২ সনে বারদৌলিতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করে যতগুলো শর্ত কংগ্রেসের কর্ম-তালিকায় স্থান পেয়েছিল সে-সবই বাতিল করে দেওয়া হল। মিস্টার

গান্ধী যখন কংগ্রেসের কর্ম-তালিকায় জনগণের, বিশেষ করে কৃষকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের শর্তগুলির স্থান প্রদান করেছিলেন তখন বোধ হয় তিনি ভেবে দেখবার অবসর পেয়েছিলেন না যে এর পরিণতি কি হতে পারে। গুজরাতের বেনেদের শ্রেণীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। বেনেদের, ধনীদের প্রতি যে তাঁর একটা স্বাভাবিক মমত্ববোধ আছে সেটা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে কিনা তা-ও সে সময়ে তিনি ভেবে দেখেননি। কিন্তু, মালাবার, চৌরিচৌরা, রায়বেরিলি ও আর আর জায়গায় যখন তিনি কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব চৈতন্যের সঞ্চার দেখতে পেলেন তখনি তিনি এক মুহূর্তে বুঝে নিলেন যে দেশের জনসাধারণের যা হবার তা হ'ক, ধনিকদের ও জমিদারদের সম্বন্ধ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এইটে বুঝে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বারদৌলিতে তিনি আপন মূর্তিতে দেখা দিলেন। কংগ্রেসের কর্ম-তালিকা থেকে জনগণের স্বার্থ-সংরক্ষণ-মূলক শর্তগুলোকে বাদ দিতে যেয়ে যেরূপ কঠোর যথেচ্ছাচারীর মূর্তি তিনি পরিগ্রহ করেছিলেন তার সহিত পৃথিবীর যে কোনো যথেচ্ছ চারীর তুলনা করলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হবে না। তারপর থেকে কংগ্রেস জনগণ হতে সম্পূর্ণরূপে সরে পড়ছে। এই সরে পড়ার দরুন জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই এই কৃষক ও শ্রমিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। এই দল উন্নত জাতীয়ত্বর (advanced nationalism-এর) অনুসরণ করে থাকে। জাতীয়ত্ব বা ন্যাশন্যালিজম বলতে আর সকল দল একটা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থকেই বুঝে থাকে। আরো খোলসা কথায়, আর সকল দল কেবলমাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীকেই জাতি বা নেশন বলে গণ্য করে থাকে। কিন্তু, এই দিক থেকে কৃষক ও শ্রমিক দলের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। এ দলের জাতি বা নেশন হচ্ছে সমাজের জনগণ। উন্নত জাতীয় দল হিসাবে কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের দ্বারা, জনগণেরই জন্যে ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কেননা, দেশের শোষিত জনগণ যদি রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভ না করে তা হলে তারা কিছুতেই শোষণের হাত এড়াতে পারবে না। কিন্তু, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলের উদ্দেশ্য তা নয়। সে-সব দল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে বৃটেনের শোষক শ্রেণীর শাসকগণের সমকক্ষ হতে চায়। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কবলগত দলগুলি যে কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর সুখ-সুবিধের জন্যেই সব কিছু করতে চাইবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই। বৃটিশ

সাম্রাজ্যের বাইরে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে, ভিতরে থেকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করাতেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকগণের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। তাতে তারা বৃটিশ শোষকগণের সমকক্ষতা লাভ করে তাদেরি সহযোগে ভারতের জনগণকে শোষণ করার অধিকতর সুবিধা পাবে। জনগণকে শোষণ করাই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকগণের একমাত্র ব্যবসায়, তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ সবই হচ্ছে ব্যাহত শোষক জীবনকে অব্যাহত করার জন্যে। ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস এখন সমাজের উচ্চস্তরের লোকগণের ক্ষমতার ভিতরে এসে পড়েছে। কাজে কাজেই সমাজের উচ্চস্তরের নীতিই বর্তমান সময়ে কংগ্রেসেরও নীতি।

জনগণ কারা?

কৃষক ও শ্রমিক দল ভারতের জনগণের দল। সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন কৃষক, কৃষিক্ষেত্রের মজুর, গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত মজুর, কারখানার মজুর, স্টিমার, নৌকা ও গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের কর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কেরানী, ছাত্র, স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতির সমবায়কেই আমরা জনগণ (the masses) নামে আখ্যাত করে থাকি। ভারতবর্ষে এই জনগণের সংখ্যা প্রায় শতকরা আটানব্বই জন। আর বাকী দুজন হচ্ছে কারখানার মালিক, জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, টাকা-লগ্নীকারী ও দালাল প্রভৃতি। কৃষক ও শ্রমিক দল যেমন বৃটেনের শোষণকারী শাসন হতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চায়, ঠিক তেমনি ভারতের এই শতকরা দুজনের শোষণেরও পরিসমাপ্তি করতে চায়। বর্তমান সময়ে যতগুলি দল আছে তার সবগুলিই এই শতকরা দুজনের স্বার্থ সংরক্ষণেই প্রয়াসী। তবে লিবারেল প্রভৃতি দল খোলাখুলি ভাবে তা স্বীকার করে থাকে, আর 'স্বরাজ্য দল' স্বীকার না করার ভান করে মাত্র। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম অর্থাৎ শোষণকারীদের সহিত এই সকল দলেরও বিরোধ রয়েছে বটে, কিন্তু, সে-বিরোধ ইম্পিরিয়েলিজমকে ধ্বংস করার বিরোধ নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, ভাগে পুষিয়ে নেবার বিরোধ মাত্র। তারপরে, কাউন্সিল প্রভৃতিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার দ্বারা ভোটের অধিকারবিহীন জনগণের সংগ্রাম ও আন্দোলন কিছুতেই চলতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর সদস্যগণ যতই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করুক না কেন, তাঁদের নিজেদের হানি হবে অথচ জনগণের উপকার হতে পারে এমন কোনো ব্যাপারে তাঁরা গবর্নমেন্টের বিরোধ কিছুতেই করবেন না। বাধা দেওয়ার ও ধ্বংস করার যতই পালিসি

তাঁদের থাক না কেন, আপন আপন স্বার্থের বেলায় গবর্নমেন্টের সহিত মিলিত হয়ে ভোট দিতে এতটুকুও পেছপাও তাঁরা হন না। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে 'স্বরাজ্য দল' যে ব্যবহার করেছে তা থেকে আমাদের কথা যে মিথ্যে নয় সকলেই তা বুঝে নিতে পারবেন। এই সকল কারণে জনগণের দল গঠিত হবার আবশ্যক ছিল বলেই তা গঠিত হয়েছে।

দলের নাম 'কৃষক ও শ্রমিক দল' হল কেন?

আমাদের দেশে অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে কেবলমাত্র গতর খাটিয়ে যারা কাজ করে থাকে তারাই শ্রমিক। আমাদের মতে এরূপ মনে করা খুবই ভুল। মাথা ও গতর দু-ই খাটিয়ে মানুষ পরিশ্রম করে থাকে। তা ছাড়া পরিশ্রম করে কারখানার মজুরেরা যেমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না ঠিক তেমনি অফিসের কেরানী প্রভৃতিও পায় না। কাজেই, অবস্থা দুয়েরেই সমান, শোষিত দু-ই হচ্ছে। 'শ্রমিক' পদটাকে আমরা খুব ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস এরূপ করে আমরা কিছুমাত্র ভুল করিনি। একজন কৃষক যদি মাথা খাটিয়ে কোনো কাজ করতে আরম্ভ করে দেয় তা হলে সে আর নিজেকে কৃষক বলে স্বীকার করতে চায় না, এমন কি তখনো যদি তার প্রধান উপজীবিকা কৃষিই হয়, তখনো না। কোনো কৃষকের যদি তালুকী স্বত্বের জমি থাকে তা হলে সে আপনাকে কৃষক বলে পরিচয় না দিয়ে তালুকদার বলে পরিচয় দিতেই গৌরব বোধ করে। শিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত শ্রমিকগণ আপনাদিগকে 'ভদ্রলোক' বলে পরিচয় দিতেই বেশী ভালবাসে। সহায়-সম্পত্তিহীন শিক্ষিত শ্রমিক, যারা তাকে পথে খাড়া করে দিয়ে ছেড়েছে তাদেরই দলে ভিড়তে চায়। তার মতো নিষ্পেষিত, নির্যাতিতদের সঙ্গে মিশতে তার বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু, সত্য সত্যই সে যে শ্রমিক,—ধনিক নয়, শোষিত—শোষক না, একথা সে মানবে না কেন? যারা ধনিক নয়, বড় বণিকও নয়, জমিদারও নয়—তারা কৃষক কিংবা শ্রমিক ছাড়া আর কি হতে পারে?

ন্যাশন্যাল কংগ্রেস সম্বন্ধে কৃষক ও শ্রমিক দলের নীতি কি হবে?

ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস কিংবা অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্য কৃষক ও শ্রমিক দলের নেই। পরন্তু,

কৃষক ও শ্রমিক দল চায় দুটো প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিশালী সংঘ রূপে গড়ে তুলতে। তবে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বর্তমান সময়ে সমাজের শোষক শ্রেণীর কবলগত হয়ে পড়েছে। তাই তাদেরি প্রোগ্রাম কংগ্রেসে স্থান পেয়েছে। কৃষক ও শ্রমিক দলের উদ্দেশ্য ন্যাশন্যাল কংগ্রেসকে সত্যকারের জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্বন্ধেও কৃষক ও শ্রমিক দলের উদ্দেশ্য ঠিক তাই। স্বার্থপর লোকগণের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপত্তি শ্রমিক কংগ্রেস হতে দূর করে দিয়ে কৃষক ও শ্রমিক দল তাকে সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চায়।

গণবাণী ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

সাইমন কমিশন

সাইমন কমিশন যখন আসবে তখন আমরা কি করব? শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য সকলের জন্যে এ প্রশ্নটি এখন খুবই জরুরী প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বুর্জোয়া অর্থাৎ ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর রাজনীতিকগণ আগেই স্থির করে নিয়েছেন যে কি তাঁরা করবেন। অনেকে কমিশনের সম্মুখে হাজির হয়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিংবা আরো যদি তাঁদের কিছু প্রিয়তর দাবী থেকে থাকে তা চাইবেন। অনেকে কমিশন বয়কট বা বর্জন করে সর্বদলসম্মিলন ও সংবাদপত্রের মধ্যবর্তিতায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পেশ করবেন। কিন্তু, কমিশন বয়কট করুক আর না-ই করুক, বয়কটের মূলে কোনো শর্ত থাকা সম্বন্ধে তাঁরা একমত হন আর না-ই হন, একথা সত্য যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পক্ষে তাঁদের প্রায় সকলেই একমত। একথাও তাঁদের প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পথ হচ্ছে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে তা দিতে বলা। 'ফরওয়াড'-এর লণ্ডনের পত্র লেখক সব চেয়ে বেশী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। (এই থেকে অনেক বিখ্যাত কংগ্রেসওয়ালার কার্যকুশলতার ধারা সকলের নিকটে পরিষ্কার হয়ে যাবে।) যে ভাবেই হ'ক না কেন, এ-সব প্রণালী একই পরিণতিতে গিয়ে পেঁছায়। এই পরিণতি হচ্ছে ভারতের জনগণকে শোষণ করার জন্যে বৃটিশ ও ভারতীয় ধনিকগণের মধ্যে একটা আপোস-চুক্তি হওয়া।

তাঁরা তাঁদের নিজেদের কার্য-পদ্ধতি স্থির করে নিয়েছেন। কিন্তু, আমরা জনসাধারণ কি মীমাংসা করব? এটা নিশ্চিত যে আমাদের একটা কিছু করতেই হবে। শোষিত হয়ে হয়ে আমরা হয়রান হয়ে গেছি! দেশময় আমরা এখন ধর্মঘট চালাচ্ছি, শক্তির জলুস আমরা দেখাচ্ছি, ট্যাক্স দিতে আমরা অস্বীকার করছি এবং আরো কত কি করছি। আমাদের এ-সব করার মানেই হচ্ছে যে আমরা শোষণপ্রথার শেষ হওয়া চাই। এ-সব ধর্মঘট থেকে আমরা আর-একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আমাদের বর্তমান শাসন-তন্ত্র কিংবা এর মতো কোনো শাসনতন্ত্র বিদ্যমান থাকলেই আমরা শোষিত

হতেই থাকব। আমরা কাজ করতে চাইলে আমাদের কে মারতে আসে? আমাদের ভিতর থেকে কেউ যদি প্রবঞ্চক হয়ে কাজে যেতে চায় তা হলে তাকে তা থেকে বিরত করার পথে কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়? তা সত্ত্বেও যদি আমরা কাজে যেতে বারণ করি তা হলে কে আমাদের ওপরে গুলি চালিয়ে দেয়? আমাদের কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও কে আমাদের ধরে জেলে পাঠিয়ে দেয় যাতে আমাদের সব তহবিল নিঃশেষ হয়ে যায়? আমাদের বিদেশের বন্ধুদের কাছ থেকে আমাদের দুঃসময়ে আর্থিক সাহায্য আসতে কে বাধা দেয়? সুবিধে পেলেই আমাদের নেতাদের ধরে জেলে পাঠাবার জন্যে কে তাঁদের পেছনে গোয়েন্দা লেলিয়ে দেয়? ধর্মঘটের সময়ে কে আমাদের ঘর থেকে বার করে দেয়, আর কে-ই বা বিনা নোটিসে আমাদের ইউনিয়নসমূহের অফিস-ঘর থেকে বার করে দেবার জন্যে বাড়ীওয়ালাদের প্ররোচিত করে? কে মালিকদের সামান্য মুখের কথাতেই আমাদের বহু লোককে গেরেফ্‌তার করে, আর কে-ই বা মালিকের বিরুদ্ধে আমাদের মারাত্মক রকম অভিযোগও শুনতে চায় না?—শাসনতন্ত্রের এবং এর পুলিশের, ম্যাজিস্ট্রেটের ও গোয়েন্দাদের 'পক্ষপাতশূন্যতা'র কথা লিখতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভর্তি হয়ে যাবে।

আসল কথা হচ্ছে, আমরা সকলেই এখন বুঝতে পারছি যে একটা বিশিষ্ট প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বৈদেশিক শোষণের শেষ হওয়া তো চাই-ই চাই এবং তার সঙ্গে যে শাসনতান্ত্রিক প্রথার দ্বারা এ বৈদেশিক শোষণ বজায় রয়েছে তারও শেষ হওয়া দরকার। পরিষ্কার কথায়, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ আমরা করতে চাই। আমরা বেশ অনুভব করতে পারছি যে শুধু একটা পরিবর্তন আনলেই চলবে না, সে পরিবর্তন অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা শীঘ্রই আনয়ন করা চাই। চারিদিকের শোষণ আমাদের আর একেবারেই সইছে না।

এ যাবৎ আমরা সাইমন কমিশন-এর বয়কট করা সম্বন্ধে বুর্জোয়া অর্থাৎ ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর রাজনীতিকগণের নীতি মেনেই চলেছি। এ বয়কটের সমর্থন করার খাতিরে আমরা হরতাল জানিয়েছি এবং ধর্মঘট চালিয়েছি। অক্টোবর মাসে সাইমন কমিশন যখন আবারো ভারতে আসবে তখনো আমরা হরতাল ও ধর্মঘট করব এবং খুব জোরের সহিতই করব। কিন্তু, সেটা হবে শুধু আমাদের শক্তিপ্রদর্শনের খাতিরে। এতে একটা শক্তি দেখানো ছাড়া আমাদের আর কিছুই লাভ হবে না। কিন্তু, একটা বাস্তব, কার্যকরী নীতিও আমাদের অবলম্বন করতে হবে। কাজ আমাদের

করতেই হবে এবং সাইমন কমিশনের আগমনকে লক্ষ্য করে আমরা কাজ করার একটা অত্যন্ত সুন্দর সুযোগও পাচ্ছি।

দেশে আর-একবার যখন এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল তখন আমরা কংগ্রেস ও মিঃ গান্ধীর ওপরে নির্ভর করেছিলেম। কিন্তু, গান্ধী ও কংগ্রেস অকৃতকার্য হয়েছে অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। এবার আমাদের সে-সবও নেই। কে আজ একথা গভীর ভাবে ভাবতে পারে যে কংগ্রেস (ডাক্তার আনসারী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীনে) জনসাধারণকে স্বাধীনতার পথে—দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির পথে চালাতে পারবে? জনসাধারণকে তাঁদের নিজেদের নেতৃত্ব খাড়া করতে হবে।

গত মার্চ মাসে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর (The Workers' and Peasants' Party of Bengal-এর) বার্ষিক সম্মিলনে এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে ঃ—

"এই যে সংগ্রাম চালানো হবে একে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবী অবশ্যই করতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটের দ্বারা নির্বাচিত একটা কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বা সুসংবদ্ধ সম্মিলন আহ্বান করতে হবে। এ সম্মিলনের দ্বারা জনগণের বিভিন্ন দাবী ও বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হবে এবং তাদের কথাও প্রামাণ্য ভাবে প্রকাশিত হবে। সার্বজনীন ভোটের দ্বারা নির্বাচিত এ সম্মিলন, জনগণকে সম্মিলিত ও সংগ্রামশীল ভাবে পরিচালিত করবে যা সর্বদলসম্মিলন করতে পারেনি। এই সুসংবদ্ধ সম্মিলনই হবে বৃটিশ গবনমেন্ট ও সাইমন কমিশনের প্রকৃত পাল্টা জওয়াব। এরি দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত পন্থা নির্দেশিত হবে এবং তাদের কষ্টদায়ক অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকারও হবে এরি দ্বারা।"

যে উপায় দেখানো হল তাই কিংবা তারি মতো কিছুর যে নিশ্চিত প্রয়োজন রয়েছে এটা বোঝার জন্যে বিশিষ্ট কোনো পাণ্ডিত্যের দরকার নেই। প্রথমে দেশের সর্বত্র সম্মিলনসমূহ আহ্বান করার চেষ্টা আমাদিগকে করতে হবে। কমপক্ষে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে সম্মিলন হওয়া উচিত। এরূপ সম্মিলনের দ্বারা শহর ও জেলার প্রতিনিধিরা, শ্রমিক সঙ্ঘসমূহ ও সে-সবের শাখাসমূহের প্রতিনিধিগণ, কৃষক সমিতিসমূহ, স্থানীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ (অবশ্য যদি যোগদান করতে চায়) কৃষক ও শ্রমিকদলসমূহ, যুব সমিতিসমূহ, হিন্দুস্থানী সেবাদল এবং এরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সুসংবদ্ধ সম্মিলন আহ্বান করবার পথ পরিষ্কার করবে।

এ সকল সম্মিলন স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করবে। কমিটিগুলিতে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যরা থাকবে এবং সে-সবের উদ্দেশ্য হবে ঃ—

(১) সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে জনগণের শক্তির জলুস প্রদর্শন।

(২) প্রচারকার্য চালানো এবং জনগণকে সুসংবদ্ধ সম্মিলন (Constituent Assembly) এর জন্য তৈয়ার করা।

(৩) যে সকল শ্রমিক কিংবা কৃষক ধর্মঘট ঘোষণা করে, কিংবা নিয়োগকর্তা, জমিদার বা গবর্নমেন্টের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় তাদের জন্যে (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর প্রাদেশিক কমিটি ও যথাযোগ্য ইউনিয়ন সহযোগে) সাহায্য সঞ্চয় করা।

(৪) শ্রমিক সঙ্ঘ ও কৃষক সঙ্ঘসমূহ গঠন করা।

(৫) শ্রমিকগণকে সাধারণ ধর্মঘটের জন্যে ও কৃষকগণকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করার জন্যে তৈয়ার করা এবং তা স্বাধীনতার জন্যে রাষ্ট্রনীতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা।

এ-সবই হচ্ছে বর্তমান সময়ে জনগণের সম্মুখে বিশেষ কর্তব্য। সম্প্রতি যে সকল শ্রমিক ধর্মঘট করেছে তারা এবং আরো অনেকে জানে যে একা একা ধর্মঘট করে বিশেষ লাভ নেই। ধর্মঘটের জন্যে জনসাধারণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পথে যতই বাধা থাক না কেন, ধর্মঘট আমাদের করতেই হবে। জনগণের সমস্বার্থবোধই শ্রমিকগণের একমাত্র অস্ত্র। যতটা সম্ভব এ অস্ত্রের ব্যবহার আমাদিগকে অবশ্যই করতে হবে। আমাদের নিয়োগকারিগণের অন্যান্য নিয়োগকারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কলওয়ালাদের সমিতি, চেম্বর অফ্ কমার্স ও আরো কত কিসের মধ্যবর্তিতায় যোগাযোগ রয়েছে। শ্রমিকদের যারা খাটায় তাদের পেছনে গবর্নমেন্ট রয়েছে। কাজেই আমাদের সমস্বার্থবোধ ও সংগঠন অবশ্যই থাকা দরকার।

জনগণের শক্তিকে সাক্ষাৎ ভাবে কাজে লাগাতে পারলেই আমরা নিয়োগকারিগণের ও তাদের গবর্নমেন্টের শাসন হতে চিরদিনের জন্যে মুক্তিলাভ করতে পারব। কংগেসের জন্যে কিংবা সর্বদলসম্মিলনের জন্যে অপেক্ষা করে কিছু মাত্র লাভ নেই। এ-সবের দ্বারা কিছুই হবার নয়। আমাদের এখন থেকে কাজে লেগে যেতে হবে এবং 'সাইমন ও বার্কেনহেড'কে প্রকৃত উত্তর দিতে হবে।

গণবাণী ঃ ৫ই জুলাই, ১৯২৮

গণ-আন্দোলন ও কংগ্রেস

মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর মহারাষ্ট্র অভিভাষণ সম্বন্ধে ডাক্তার তারকনাথ দাস ১১ই জুলাই তারিখের 'ফরওয়ার্ড'-এ "ভারতে শ্রমিক আন্দোলন" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে ডাক্তার দাস নিজের কথা বিশেষ কিছুই বলেননি। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সমর্থনই শুধু করে গেছেন। ডাক্তার দাসের এই সমর্থন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পরিণত হয়েছে বললেও বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। প্রথমেই তিনি মিঃ বসুর অভিভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দিয়ে তঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন। ভারতীয় ন্যাশন্যালিজম—শাদা কথায় ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসকে যে নানা দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে তারি কথা বলতে যেয়ে মিঃ বসু বলেছেন—

"আর-একটা আক্রমণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন কিংবা আন্তর্জাতিক "কম্যুনিজম"-এর দিক থেকে হচ্ছে। এ আক্রমণে কেবল যে সুবিবেচনার পরিচয়ের অভাব আছে তা নয়, এর দ্বারা অজ্ঞাতসারে বিদেশী শাসকদের স্বার্থও সিদ্ধ হচ্ছে। অতি সাধারণ লোকও একথা খুব সহজে বুঝতে পারবে যে সমাজকে নব ভিত্তির ওপরে, তা সে-ভিত্তি সাম্যবাদ-মূলকই হ'ক বা অন্য কিছুর হ'ক—গঠিত করার চেষ্টা করতে যাওয়ার পূর্বে অমোদের হাতে সে-অধিকারটুকু আসা দরকার যার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের অদৃষ্টকে গড়ে তুলতে পারব। যতদিন ভারতবর্ষ বৃটেনের পদানত হয়ে থাকবে ততদিন সে-অধিকার আমরা কিছুতেই পাব না। কাজেই, শুধু ন্যাশন্যালিস্ট বা জাতীয়ত্ববাদীদের নয়—ন্যাশন্যালিজমের বিরোধী কম্যুনিস্টদেরও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে যতটা সম্ভব সত্বর ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি আনয়ন করা। রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভ করার পরেই সামাজিক ও অর্থনীতিক পুনর্গঠনের সমস্যার বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা করবার সময় আসবে। আমি যতটা জানি, অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট কম্যুনিস্টগণেরও এই মত। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে এ সময় যাঁরা প্রকাশ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেন কিংবা তার জন্যে কাজ করেন তাঁরা আমার মতানুযায়ী ন্যাশন্যালিজমের দরবারে গুরুতর অপরাধ করে থাকেন।"

ডাক্তার দাস বলেছেন যে মিঃ বসুর কথা খুবই নির্ভুল। এ সম্বন্ধে কি ন্যাশন্যালিস্ট, কি শ্রমিক-নেতা প্রত্যেকেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া আবশ্যক। তারপরে তিনি বলেছেন —এশিয়ার ন্যাশন্যালিজম বা জনগণের জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট নেতৃগণের কোনো দরদ নেই। তাঁরা যা কিছু করে থাকেন সবই রাশিয়ার সুবিধার জন্যেই করেন। পারস্য, আফগানিস্তান, তুরস্ক ও চীনের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পথ সোভিয়েত রাশিয়া পরিষ্কার করে দিলেও তার মূলে সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিসমূহকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য বিদ্যমান রয়েছে। এ-সব কথা বলার পরে ডাক্তার দাস বলেছেন—"যাঁরা ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানেন তাঁরা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবেন যে ভারতে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচারের ফলে গৃহ-বিরোধ উপস্থিত হবে এবং তার দ্বারা বিদেশী প্রভুগণ ও বৃটিশ লেবর ইম্পিরিয়েলিস্টগণ ছাড়া আর কেউই উপকৃত হবে না। এর দ্বারা ভারতীয় ন্যাশন্যালিজমও প্রতিহত হবে।"

এখন দুটো কথার সংজ্ঞা সর্বপ্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। "ন্যাশন্যালিজম" বলতে মিঃ বসু ও ডাক্তার দাস কি বোঝেন এবং "শ্রেণী-সংগ্রাম" বলতেই বা তাঁরা কি মনে করেন? মিঃ বসু বলেছেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়ত্ববাদকে আক্রমণ করেছে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচারের দ্বারা বিদেশী শাসকগণেরই উপকার হচ্ছে। ডাক্তার দাসও তাঁর পোঁ ধরেছেন। কিন্তু, বর্তমান সময়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন অর্থাৎ ভারতীয় কংগ্রেস আন্দোলনকে ভারতীয় জনগণের আন্দোলন নামে অভিহিত করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। জাতীয় সংগ্রাম বলতে আমরা যা বুঝে থাকি ভারতের উচ্চস্তরের জাতীয়ত্ববাদিগণ তা কখনো বোঝেন না। যে সংগ্রাম দেশের জনগণের আন্দোলনের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র তাকেই আমরা জাতীয় সংগ্রাম নামে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু, বর্তমান সময়ে কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম মোটেই তা নয়। কংগ্রেস আন্দোলন মাত্র, শতকরা সাড়ে সাতানব্বই জনের কোনো প্রতিপত্তি কংগ্রেসে নেই। জাতি বলতে যদি দেশের জনগণকে অর্থাৎ সাড়ে সাতানব্বই জনকে বোঝায় তা হলে বর্তমান কংগ্রেস আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন মোটেই নয়। একে একান্তই যদি জাতীয় আন্দোলন বলতে হয় তা হলে সমাজের উচ্চস্তরের জাতীয় আন্দোলন বলতে হবে। মিঃ বসু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভের পরেই শুধু অর্থনীতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের বিষয়ে ভাবতে রাজি আছেন, কিন্তু,

তিনি যে জাতীয়ত্ববাদের পক্ষ থেকে মুখপাত্র হয়েছেন সেই জাতীয়ত্ববাদই কখনো ভারতের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কামনা করেনি। মাদ্রাজ কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব কংগ্রেসের পূর্ব-বিশ্বাসের (creed-এর) কোনো পরিবর্তনই করতে পারেনি। স্বাধীনতা প্রস্তাব পাস হওয়ার পরেও দিল্লীতে ও বোম্বেতে সর্ব-দলসম্মিলন সম্ভবপর হয়েছে। দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার কাজে কংগ্রেস আজো ব্যাপৃত রয়েছে। এ-সব সত্ত্বেও মিঃ বসু বলেছেন যে তাঁর ন্যাশন্যালিজমের সমালোচনা তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে নারাজ।

ব্যক্তিগতভাবে মিঃ বসু হয়তো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করেন, কিন্তু, তিনি যে কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে কথা বলেন সে কংগ্রেস কখনো তা করে না। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সমালোচনা তিনি করতে পারেন না, সম্ভবতঃ সে-সাহস তাঁর নেই। এদিকে কিন্তু, শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃগণের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে তাঁর কখনো বাধে না।

ভারতে দুটো জাতীয় আন্দোলন রয়েছে। একটা হচ্ছে বুর্জোয়া বা উচ্চস্তরের জাতীয় আন্দোলন, আর একটা জনগণের জাতীয় আন্দোলন (mass nationalist movement)। প্রথম আন্দোলনের বিকাশ হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যবর্তিতায়, আর দ্বিতীয় আন্দোলনের বিকাশ হচ্ছে 'কৃষক ও শ্রমিক দল' (Workers' and Peasants' Party) ও অন্যান্য আমূল-পরিবর্তনকামী (radical) শ্রমিক আন্দোলন।

জনগণের তরফ থেকে যখনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কংগ্রেসে উঠেছে তখনি কংগ্রেস আর-একদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজনীতিক সম্মিলনের বেদী থেকে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে মিঃ বসু যাঁদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁরাই বারে বারে কংগ্রেসের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়েই হয়েছেন।

সামাজিক বৈষম্য যেখানে রয়েছে, একটা ক্ষুদ্র দল যেখানে সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে বিরাট উৎপাদক শ্রেণীকে শোষণ করতে থাকে সেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম আপনা থেকেই সংঘটিত হবে। ঘরে ঘরে বিভেদ সৃষ্টি হবে মনে করে যাঁরা শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা শোষক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই তা করেন। ভারতের জনগণের জাতীয় সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। বুর্জোয়া বা উচ্চস্তরের জাতীয় সংগ্রামও এক প্রকারের শ্রেণী-সংগ্রামই বটে। তাঁদের এ সংগ্রাম হচ্ছে বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর সহিত সংগ্রাম। বৃটিশ ধনিকগণ তাঁদিগকে

আপনাদের অধীন অংশীদার করে রাখতে চান আর আমাদের বুর্জোয়া ন্যাশন্যালিস্টগণ অর্থাৎ ভারতীয় ধনিকগণ হতে চান সমান অংশীদার। উভয় দলের মধ্যে এই যে সংগ্রাম—এ সংগ্রামও একটা শ্রেণী-সংগ্রাম।

শোষক আর শোষিতের সংগ্রামই শ্রেণী-সংগ্রাম। এটা কোনো দেশের বিশিষ্ট সম্পত্তি নয়। ভারতে শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে পারে না কিংবা চালানো উচিত নয় ইত্যাদি কথা যাঁরা বলে বেড়ান তাঁরা যে শোষক শ্রেণীর হয়ে প্রচারকার্য করেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

ভারতের জাতীয় মুক্তির প্রকৃত সংগ্রামে যদি আমাদিগকে প্রবৃত্ত হতে হয় তা হলে শুধু যে বৃটিশ ধনিকগণের সহিত আমাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হবে তা নয়, ভারতীয় ধনিক ও ভারতীয় জমিদারগণের সহিতও আমাদের একটা সংঘর্ষ হবেই হবে। জমিদারগন বিদেশীয় শাসনের দ্বারা সৃষ্ট পরগাছাস্বরূপ। এ পরগাছা সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করতে গেলেই একটা সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়বে। ভারতীয় ধনিক আর বৃটিশ ধনিক যদিও এ যাবৎ এক আসনে আসীন হয়নি, তথাপি তারা ক্রমশই সমস্বার্থে বিজড়িত হয়ে পড়ছে। কাজেই ভারতীয় ধনিকগণও আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে উঠবে। বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থের খাতিরে তাদেরই ইঙ্গিতে ভারতবর্ষ শাসিত হয়ে থাকে। বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ যে অর্থনীতিক, সে-কথা বোধ হয় বোঝাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপেই আমরা তা অনুভব করে থাকি। বৃটিশ ধনিক-গণের অর্থনীতিক স্বার্থ অব্যাহত থাকবে অথচ আমরা রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা লাভ করব, এমনটা কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই, তাদের সহিত সমস্বার্থে জড়িত ভারতীয় ধনিকগণের স্বার্থও আমাদের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দ্বারা বিপন্ন হবে। আর তাদের স্বার্থ বিপন্ন হলে তাদের সহিত সংঘর্ষও না হয়ে যাবে না। মোটকথা, কি শ্রমিক আন্দোলন, কি কৃষক আন্দোলন, এক শ্রেণীর দেশীয় লোকদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হবেই হবে। জনগণের আন্দোলন কখনো এমন একটা শ্রেণী আন্দোলনের (মিঃ বসু ও ডাক্তার দাসের কথায় জাতীয় আন্দোলনের) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না যার দ্বারা জনগণের হাতে না আসবে কোনো রাষ্ট্রনীতিক অধিকার, না হবে তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন।

"ভারতে ক্রমশই গণ-আন্দোলন মূর্ত হয়ে উঠছে। জনগণের মধ্যে ক্রমশই চৈতন্যের সঞ্চার হচ্ছে। তাদের আন্দোলন সম্ভবতঃ এখন আর

দাবিয়ে রাখা যাবে না। এখন একমাত্র প্রশ্ন এই হচ্ছে যে কোন্ পথে এ আন্দোলনের বিকাশ হওয়া উচিত। কংগ্রেস এখন যদি জনগণের স্বার্থকে অবহেলা করে তা হলে শ্রেণী-বিশেষের, সত্য কথা বলতে গেলে জাতীয়ত্বের বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি হবে এবং আমাদের রাষ্ট্রনীতিক মুক্তিলাভের পূর্বেই আমাদের জনগণের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যাবে। আমরা যখন সকলেই ক্রীতদাস তখন আমাদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম আনয়ন করাটা অত্যন্ত বেশী মারাত্মক ব্যাপার হবে। এতে আমাদের সকলের সাধারণ শত্রুরা খুবই আনন্দ পাবে।"

শ্রমিক আন্দোলন যাতে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রাম বাদ দিয়ে, তার সমর্থনের জন্যে ডাক্তার দাস তাঁর প্রবন্ধে মিঃ বসুর বক্তৃতার উল্লিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন। আমরা আশা করি মিঃ বসুর বক্তৃতার এই অংশটুকু সকলেই খুব মনোযোগসহকারে পড়বেন। 'ফরওয়ার্ড'-এর লন্ডনের পত্রলেখক অভিযোগ আনয়ন করেছেন যে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে স্বাধিকারভুক্ত করে নিতে চাইছে আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা। সম্ভবতঃ এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু, এর চেয়েও মারাত্মক অভিযোগ মিঃ বসুর বিরুদ্ধে আনয়ন করতে পারা যায়। তিনি কংগ্রেসের সহিত জনগণের আন্দোলনের যোগ করাতে চান শুধু গণ-আন্দোলনের সংগ্রামটাকে ধ্বংস করার জন্যে, আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে গণ-আন্দোলনকেই ধ্বংস করার জন্যে। গণ-আন্দোলনের মানেই হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের আন্দোলন। যে শ্রেণী জনগণের দাসত্বের মূলীভূত কারণ, দেশীয় হ'ক আর বিদেশীয় হ'ক, তার সহিত সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে গণ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। মিঃ বসু এ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে গণ-আন্দোলনকে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করতে চান। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, আমরা যখন সকলে একই শত্রুর দাস তখন আমাদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ ঘনিয়ে তোলা মোটেই সমীচীন নয়। এ যুক্তি কতটা সত্য সেটা আমরা বিচার করে দেখব। বৃটিশ ধনিকগণই আমাদের সকলকে পদানত করে রেখেছে। শোষণের জন্য তারাই আমাদের শাসন করছে। কাজেই, বৃটিশ ধনিকগণ ভারতের শোষিত জনগণের শত্রু। কিন্তু, ভারতীয় ধনিকগণও কি বৃটিশ ধনিকগণকে শত্রু বলে মনে করে থাকে? দাসত্বের যে বেদনা ভারতের জনগণ অনুভব করে থাকে সে বেদনা কি ভারতের ধনিক ও জমিদারগণও অনুভব করে? কখনো নয়?

আমরা আগেই বলেছি যে বৃটিশ ধনিক আর ভারতীয় ধনিক ক্রমশই একই সূত্রে গ্রথিত হচ্ছে। আর জমিদার তো বৃটিশেরই দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তার একমাত্র উপজীবিকা হচ্ছে ভারতের কৃষক সাধারণকে শোষণ করা। কংগ্রেস এই ধনিক আর জমিদারের মুখ চেয়েই কাজ করছে, তা যদি না হত তা হলে আজ দায়িত্ব-মূলক শাসনের খসড়া না তৈয়ার হয়ে খসড়া তৈয়ার হত গণতন্ত্রের, ডাক্তার দাস ও মিঃ বসু কি একথা অস্বীকার করতে পারেন ?

আমাদের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন যে জনগণের জাতীয় আন্দোলন (mass nationalist movement) একথা আমরা আগেই বলেছি। গণ-জাতীয় আন্দোলনই সত্যকার ভাবে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে চায়, ভারতের কম্যুনিস্টগণও ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী। তার জন্যে তাঁরা সংগ্রামও করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করতে চায় না শুধু ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস। গৌহাটিতে আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস কৃষকের পাশে না দাঁড়িয়ে জমিদারের পাশে দাঁড়াতেই সদা প্রস্তুত। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে দেখা গেছে যে কংগ্রেস সদস্যগণ সম্মিলিত বৃটিশ ও ভারতীয় ধনিকগণকে অর্থ সাহায্য করতে এতটুকুও নারাজ নয়। কিন্তু, শ্রমিকদের জন্যে মজুরির একটা নিম্নতম হার ধার্য করতে তাঁরা ভয়ানক গররাজী। সাইমন কমিশন বয়কটের ব্যাপারেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কংগ্রেস জনগণের তোয়াক্কা একেবারেই রাখে না। কাজেই, বর্তমান কংগ্রেসকে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না। জনগণকে দলে পাওয়ার পূর্বে কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে।

ডাক্তার তারকনাথ দাসের প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে আমাদিগকে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধেই অনেক কিছু লিখতে হয়েছে। কেননা, ডাক্তার দাসের ব্যক্তিত্বের কোনো পরিচয় তাঁর প্রবন্ধে নেই। কম্যুনিস্টগণের ওপরে ও রাশিয়ায় সোভিয়েট গবর্নমেন্টের ওপরে তিনি মোটেই প্রসন্ন নন। তবে তাঁর অপ্রসন্নতার তেমন কিছু মূল্যও নেই। তিনি বিশেষ কোনো মতের অনুসরণকারী নন। কাল যদি তিনি কোনো কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কিছু টাকা পান তা হলে তিনি কম্যুনিস্টদের পক্ষে হয়েই দশটি প্রবন্ধ লিখবেন। তিনি চলেন জোয়ারের আগে আগে আর ভাটার পিছে পিছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সমর্থন তিনি যে-মুখে করেছেন আবার ঠিক সেই মুখেই তিনি সে-আন্দোলনের দোষারোপও করেছেন। সুতরাং তাঁর কথায় আমাদের কান না দিলেও চলে।

গণবাণী : ১৯শে জুলাই, ১৯২৮

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা

'কৃষক ও শ্রমিক দলে'র (Workers' and Peasants' Party') উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কিন্তু, কেন? এটা বোঝানো আবশ্যক যে ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ন্যায় কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতারই খাতিরে 'কৃষক ও শ্রমিক দল' এ উদ্দেশ্য গ্রহণ করেনি। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারা কি বোঝায় তা উপলব্ধি না করেই কংগ্রেস নিতান্ত তুচ্ছতার সহিতই সে-সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পাস করেছে।* যুক্তি-তর্কে'র দিক থেকে এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের (creed-এর) পরিবর্তন হওয়া এবং যারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে কাজ করতে চায় না তাদের কংগ্রেস থেকে বাদ দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু, তা করা হয়নি। পক্ষান্তরে 'কৃষক ও শ্রমিক দল' যখন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে কাজ করার কথা বলে থাকে এ দল সত্যিকার ভাবে ঠিক তা-ই করতে চায়। এই নীতির কোথায় কি মার-পেঁচ আছে সবই এই দল পুরোপুরি উপলব্ধি করতে চায়। কংগ্রেসের পথ এই দলের পথ নয়।

অনেকে, বিশেষ করে কংগ্রেসের এই প্রস্তাব পাস করার পর থেকে, যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, লিবারেল পার্টি, স্বরাজ-পার্টি ও অপর আরো অনেক দলের দিব্য-করা লক্ষ্য 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন'-এর ভিতরে অন্যান্য অনেক জিনিসের ন্যায় পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকারও যখন রয়েছে তখন তা পরিপূর্ণ স্বাধীনতারই মতো উত্তম বস্তু। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ভিতরে পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকার আছে কি নেই তা খুবই সন্দেহজনক—'স্টেটসম্যান' তা অস্বীকার করছে। কিন্তু, যে-কোনো প্রকারে এটা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই হচ্ছে যে যাঁরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাঁদের বুদ্ধি হয়তো গুলিয়ে গেছে, কিংবা তাঁরা জেনেশুনে ও ইচ্ছে করেই প্রতারণা করেছেন। 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' ও 'স্বরাজ' প্রভৃতিকে পরিপূর্ণ-স্বাধীনতার খুব নিকটবর্তী বলে তাঁরা মনে করে থাকেন। 'অমৃত

* সম্ভবতঃ তুচ্ছতার সহিত না-ও হতে পারে। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার লণ্ডন লেখক গত ১লা জুলাই তারিখে লিখেছেন :—"এমন কি যাঁরা ভেবে থাকেন যে ভারতের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন তাঁদেরও পক্ষে এটা বুঝে নেওয়া মোটেই কষ্টকর হবে না যে, যদি ভারতবর্ষ আপনার চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করতে চায় তা হলে বৃটেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্তে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।"

বাজার পত্রিকা' অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতির মধ্যে বড় বেশী পার্থক্য নেই। কাজেই, যাঁরা এ-সবে বিশ্বাস করেন তাঁরা অনায়াসে একত্র হয়ে কাজ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সত্যের অপলাপ এর চেয়ে বেশী কিছু হতেই পারে না। 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' হচ্ছে সেই একমাত্র লক্ষ্য যাতে গঠনের পথে ও নিরুপদ্রব ভাবে পেঁছানো যেতে পারে। এমন কি স্বরাজীরা পর্যন্ত 'গোল টেবিলের বৈঠক'-এর অর্থাৎ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত চুক্তিপত্র করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে এই পথেই 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' প্রতিষ্ঠিত হবে। (অবশ্য এর সঙ্গে যোগ করতে হবে জনগণের তরফ থেকে খানিকটা চাপ যা আবার খুব বিপজ্জনক যেন না হয়। দৃষ্টান্তস্থলে বারদৌলির ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে।) এখন আমাদিগকে সত্যকার ভাবে এটাই কি মনে করে নিতে হবে যে বৃটিশ শোষণবাদ ইচ্ছা করেই ভারতবর্ষকে এমন একটা স্থিতি মঞ্জুর করবে যা স্বাধীনতার 'সমান' কিংবা স্বাধীনতা থেকে মাত্র 'এক ধাপ কম' ? যদি তা করা হয় তা হলে সেই বাকী 'ধাপ'-টাও কি ভারতবর্ষকে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে ? (মিশরের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে।) এই যে অবস্থাটা, তা কত বড় মিথ্যা সেটা মাত্র এই একটা প্রশ্ন থেকেই যে কেউ ভাল করে বুঝে নিতে পারবেন।

'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' তা হলে কি ? কথাটা আজকাল সকলেরই মুখে শোনা যাচ্ছে। লিবারেল, স্বরাজী, হোমরুলবাদী ও পারস্পরিক সহযোগবাদ—সকলেই এই 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' চান। এমন কি অনেক ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞও এর সমর্থন করেছেন। বৃটিশ লেবার পার্টি (শ্রমিক দল) তো অনেকটা প্রতিজ্ঞার মতোই এটাকে গ্রহণ করেছে। কাজেই, বিলম্বে হ'ক কিংবা অবিলম্বে হ'ক, ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে এবং আমাদের মতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণের ও সংবাদপত্রসমূহের কথা খুবই পরিষ্কার। যদিও তাঁদের সকলে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' কথাটা ব্যবহার করেননি তথাপি বৃটিশ ধনিকগণের যে শাখাটার হাতে শাসনভার রয়েছে তাঁদের সকলেই এ প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রায় একমত। বৃটিশ শ্রমিক নেতৃগণেরও সরকারী ভাবে এতে কোনো মতভেদ নেই। তাঁদের সকলেই এ সম্বন্ধে একমত যে ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর থাকতেই হবে। এটা হচ্ছে

একটা খুব বড় প্রশ্ন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকার মানেই হচ্ছে ভারতবর্ষকে বৃটিশ ধনিকগণের শোষণাধীন রাখা। অপরাপর ব্যাপারগুলো এর তুলনায় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমানের সামান্য আরম্ভ থেকে অনেকে 'ক্রমশ-দায়িত্বপূর্ণ শাসন' লাভ করার কথা বলে থাকেন 'গণতন্ত্রের ক্রম প্রসার'-এর কথা। এমন আরো কত কি বলা হয়। এমন কি যাঁরা 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-পাসন' লাভের কথা বলেন তাঁরাও তা এখন দিতে চান না। এ তাঁদের মতে চরম লক্ষ্য, ক্রমান্বয়ে সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। বৃটিশ রাজনীতিক ও শ্রমিক নেতৃগণের সহিত স্বরাজ-পার্টি ও অন্যান্য ভারতীয় দলগুলির ঝগড়ার এটাই হচ্ছে মূল কারণ। বৃটিশ নেতৃগণ 'ক্রমশ'র ওপরে এত জোরই বা দেন কেন? তাঁদের মতে ভারতবাসী 'রাষ্ট্রনীতিক হিসাবে এখনো অপরিণত', 'পার্লামেন্টের ধারা'য় তাদের এখনো শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন আছে এবং অতি অবশ্য তাদের 'দায়িত্বজ্ঞান' অর্জন করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা রাষ্ট্রনীতিক স্তোকবাক্য বলে মনে হলেও খুব সহজেই এর বাস্তব অর্থ বোঝা যেতে পারে। এ-সব কথা বলার মানে এই হচ্ছে যে ভারতীয় ধনিকগণ যতই বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে থাকবেন ততই তাঁদের ওপর শাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকতর ভার দেওয়া হবে। এইরূপ কায়দায় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার উন্নত স্তরই হচ্ছে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন'। এই অবস্থায় সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যদলের রক্ষণাধীনে থেকে বৃটিশ ধনিকগণের লাভের জন্যে ভারতবর্ষ (বেশীর ভাগই) ভারতবাসীর দ্বারা শাসিত হবে।

যুদ্ধের সময় থেকে এটাই যে বৃটিশ শোষণবাদের নীতি হয়েছে তা বোঝাবার জন্যে এখানে আলোচনা করার তেমন কোনো আবশ্যক নেই। খুব দ্রুতবেগে কল-কারখানা এদেশে স্থাপিত হয়েছে, বৃটিশ মূলধন খুব বেশী রূপে ঢালা হয়েছে এবং ভারতীয় ধনিকগণকে সর্বপ্রথমে 'ছোট অংশীদার' রূপে 'মেনে নেওয়া'ও হয়েছে। বৃটিশ ও ভারতীয় স্বার্থ ইতোমধ্যেই অবিচ্ছেদ্য-রূপে সংযুক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের প্রধান কারবার টাটার কারখানার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় মূলধনই খাটছে এবং গবর্নমেন্টের সহিতও এ কারখানার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এর সাথে বন্দোবস্ত আছে যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করার। ভারতীয় ধনিকগণ ও তাঁদের অনুচরগণ বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে খুব দ্রুত শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এখনি কিছু ভারতীয় ধনিকগণকে 'ঔপনিবেশিক' স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া

হবে না। এটা এখনো একটা টোপ গেলানো ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এটা ফেলা হয়েছে তাঁদিগকে গঠনমূলক পথে টেনে নেবার জন্যে। এখানে বিশেষ ভাবে দেখবার বিষয় এই হচ্ছে যে বাকলে, এমন কি স্বরাজীরা পর্যন্ত, ধীরে হলেও নিশ্চিত রূপে সেই পথে চালিত হচ্ছেন। ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে বৃটিশ ধনিকগণের লড়াই লড়ার সুযোগ দানের পক্ষে কতক লোক এখনো খুব 'দুর্বিনীত' রয়ে গেছেন। তাঁদেব অনেকে বারদৌলি সত্যাগ্রহের* ন্যায় অগঠন-মূলক কাজের সমর্থন করছেন। তাঁদের আরো ভাল শিক্ষা হওয়া দরকার; তাই কথা ওঠে ক্রমশত্বের, তাই কথা ওঠে 'ক্রমোন্নতভাবে দায়িত্ব-শাসন লাভের'।

'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন'-এর অধীনে ভারতবর্ষ কল্পনায় যতই 'মুক্ত' হ'ক না কেন, এ মুক্তি কিন্তু এমন কিছু হতে পারে না যার সহিত ভারতের জনগণের কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকতে পাবে। আমরা চাই বৃটিশ ধনিক-গণেব শোষণ হতে মুক্তি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অন্য কোনো প্রকার শাসন আমাদিগকে তা দিতে পারবে না। এ কারণে আমরা কিছুতেই সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকতে পারি না। আমাদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতেই হবে যার মানে হবে বৃটিশ ধনিকগণের শোষণ হতে আমাদের স্বাধীনতা।

এ যে নীতি এটা হচ্ছে এখন গভীর ভাবে চিন্তা করবার বিষয়। এটা খুব সহজেই প্রতীয়মান হবে যে স্বাধীনতা শান্তিব সহিত লাভ করা কিংবা বৃটিশের সহিত চুক্তিব দ্বারা লাভ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পাবে না। বৃটিশ ধনিকগণ কিছুতেই কোটি কোটি টাকা নির্বিরোধে ছেড়ে চলে যাবে না।

* এটা এখানে লক্ষ্য কবা আবশ্যক যে স্বরাজীরা এ ব্যাপারে ভেদের পরিচয় দিয়েছেন। বারদৌলি সত্যাগ্রহ একটা গভীর ও বাস্তব গণ-আন্দোলন। নেতৃগণ এ আন্দোলনকে খুবই নির্দোষ পথে চালিয়েছেন। ধনিক নেতৃগণ যে আপনাদেব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনের সুযোগ নিচ্ছেন এটা হচ্ছে তারি একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বল্লভভাই প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃগণ সমভাবে ও ভুলক্রমে আন্দোলনকে যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতবে আবদ্ধ রেখেছেন। স্বরাজীরা ও আরো অনেকে মিঃ প্যাটেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপারটাকে "সমগ্র-ভারতীয়" প্রশ্ন করে তুলেছেন। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে এ আন্দোলনকে অপর কৃষকদের মধ্যে বিস্তৃত করার ইচ্ছা তাঁদের নেই। আন্দোলনকে যথেষ্ট অর্থের দ্বারা সাহায্য করার ইচ্ছাও তাঁদের নেই। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার-কার্য। তা না হলে আটিয়ার কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁরা কোনো কিছুই করছেন না কেন? আটিযার কৃষকগণ বারদৌলি থেকে সংখ্যায় বেশী, তাদের অভিযোগও খুব গুরুতর, এর কারণ এই যে আটিয়া আন্দোলন গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে হলেও এ-ব্যাপারে গবর্নমেন্টের সহিত ভারতীয় জমিদারগণের যোগাযোগ রয়েছে। কাজেই, স্বরাজীরা তাঁদের সুবিধার খাতিরে বাজে জাতীয়ত্বের নামে এ আন্দোলনকে ব্যবহার করতে পারছেন না।

তাদের আরো যে কত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তার কথা এখানে না হয় নাই বা বললেম। একথা প্রত্যেক ভারতবাসীরই জানা উচিত যে বৃটিশ ধনিকগণ খুব দৃঢ়তার সহিত এবং কঠোরভাবেই তাদের স্বার্থের জন্যে যুঝবে।

কংগ্রেস 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবী যখন করে তখন এসবই কি ভাবে? এ প্রশ্ন কেবল জিজ্ঞাসা করাই সার হবে। অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে চান এবং এই চাওয়ার খাতিরে সব কিছুর সম্মুখীন হতেও তাঁরা রাজী আছেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই বেশীর ভাগ জায়গায় কংগ্রেসের নেতৃগণকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে ভোট দিতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু এটা খুবই জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কতকাল এ প্রতারণা, এ গোঁজামিল চলতে থাকবে। যাঁরা সত্য সত্যই স্বাধীনতা চান এবং তার জন্যে সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত আছেন তাঁদের আর যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে আপোস-নিষ্পত্তি করতেই চান, অথচ গবর্নমেন্টকে ভয় দেখাবাব জন্যে কিংবা 'ভক্তদের' অসন্তোষ এড়াবার জন্যে স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন, এই দুপক্ষের মধ্যে কোনো সম্মিলন হতে পারে কি?

এরূপ কোনো সম্মিলন হতেই পারে না। পবিপূর্ণ স্বাধীনতার মানেই হচ্ছে বিপ্লব, আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মানে শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতাব মানে বৃটিশ ধনিকগণের সহিত বিচ্ছেদ, আব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মানে হচ্ছে তাদের ক্ষমতার নিকটে আত্মসমর্পণ। স্বাধীনতার মানে 'শতকরা আটানব্বই জনেব জন্যে স্ববাজ লাভ কবা', আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মানে শতকরা দুজনের জন্যে স্ববাজ (?) লাভ'। এইরূপ পরস্পরবিরোধী নীতি ও স্বার্থের সহিত সম্মিলন হতে পাবে না। কাজেই বর্তমানের অত্যন্ত বাজে সম্মিলনেব জায়গায়* অচিরেই বিচ্ছেদ ঘটিত হবে।

* এখানে প্রকৃত অবস্থার একটা প্রকৃত চিত্র দেওযা হল। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ তাবকনাথ দাস ও 'ফবওয়ার্ড'-এর দ্বরা বিপথে চালিত হয়ে অনেকেই জাতিব এই 'বিভেদ' ও ভবতে শ্রেণী-সংগ্রামের 'প্রবর্তন'-এব বিরুদ্ধাচরণ কববেন এবং বলবেন যে—"প্রথমেই আমবা স্বরাজ চাই। তারপবে নিশ্চিন্ত হয়ে স্থির করা যাবে কোন্ প্রকারেব স্বরাজ সেটা হবে"। ওপরে যা বলা হয়েছে তাতেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে খাঁটি স্বরাজ নামক কোনো বস্তু নেই। স্বরাজ হয়তো জনগণের দ্বারা লাভ হবে কিংবা লাভ হবে ধনিকগণেব নেতৃত্বাধীনে। ধনিকগণ (bourgeoisie) যে "স্বরাজ" চায় তা মোটেই স্ববাজ নয়। তাবা চায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিংবা বৃটিশ শোষণবাদের সহিত এমনি একটা কিছু অপমানজনক আপোস-নিষ্পত্তি। একমাত্র সম্ভবপব স্বরাজ "শতকরা আটানব্বই জনেব" দ্বারা ও "শতকরা আটানব্বই জনের" জন্যই লাভ হবে।

কংগ্রেস আধাআধি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিচ্ছে, অপর দিকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারীদের সহিত সম্বন্ধও কাটাতে পারছে না, কাজে কাজেই কেবল হাস্যাস্পদই হচ্ছে।

আসল কথাটা এখানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার জন্যে কাজ করার নীতি গভীর ভাবে চিন্তা করাব বিষয়। কেবলমাত্র বক্তৃতা বা ভয়-প্রদর্শন করা স্বাধীনতার খাতিরে কাজ করা নয়। স্বাধীনতা লাভের জন্যে কাজ করার মানে হচ্ছে সমগ্র দেশের জনগণের দৃঢ়, কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম। যতক্ষণ না স্বাধীনতা লাভ হবে ততক্ষণ এ সংগ্রাম চালাতেই হবে। এই লাভের পথে আমাদিগকে অনেক কিছু ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে হবে—কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ ভাবে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করলে চলবে না। বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে হলেও আমাদিগকে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কিংবা এরূপ কিছু একটার জন্য, ধনিকগণের সহিত আপোস-নিষ্পত্তির জন্যে একটি জীবন বলিদান করাও সঙ্গত নয়। কে বলতে পাবে যে, স্বাধীনতা আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন একই জিনিস? আর কিসের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে তাতেই বা কার সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে?

গণবাণী : ২রা আগস্ট, ১৯২৮

স্বরাজের স্বরূপ

আমাদের স্বরাজের স্বরূপ কি হবে সর্বদলসম্মিলনের রিপোর্টে তা প্রকাশিত হয়েছে। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর অধ্যক্ষতায়—

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু
সার আলী ইমান
শ্রীযুক্ত প্রধান
মিঃ শোয়েব কোরায়শী
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত মাধাওরাও আনি
মিঃ এম, আর, জয়াকর
মিঃ এন, এম, যোশী
ও
সর্দার মঙ্গল সিং

-কে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটি স্বরাজের একটা খসড়া প্রস্তুত করে বাজারে বার করেছেন। মিঃ এন, এম, যোশী ব্যতীত আর সকলেরই নাম এ খসড়ায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। খসড়াটির সাফল্য সম্বন্ধে আজ ক'দিন থেকে আমাদের ধনিক ন্যাশন্যালিস্ট সংবাদপত্রসমূহে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। এই কাগজগুলির মতে পণ্ডিত মোতিলাল ও তাঁর সহকর্মিগণ খসড়াটি প্রস্তুতের দ্বারা যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার দাঁতও ভেঙে দিয়েছেন। কেননা, তিনি কিছুদিন পূর্বে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতবাসী কোনো খসড়া প্রস্তুত করতে পারেনি। বিলাতের লোকগুলি এইবার দেখে নেবে যে কত ভাল খসড়া ভারতবাসী প্রস্তুত করতে পারে!

এখন দেখা দরকার, মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হওয়ার পরে এবং সাইমন কমিশন বয়কটের যুগে কি প্রকারের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, আর তার লক্ষ্যই বা কি?

বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের বেশী আর কিছুই স্বরাজের খসড়া-প্রণয়নকারীরা দাবী করতে পারেননি। অর্থাৎ

বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরেই তাঁরা থাকতে চান এবং তাঁদের বন্ধুত্বটা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত খুব পাকাপাকিও করে নিতে চান। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের এটুকুই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়েছিল এই খসড়া প্রণয়নের পরে তার আর কোনো মূল্যই থাকল না। সত্য কথা বলতে গেলে, দিল্লীর সর্বদলসম্মিলনের পরেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের কোনো সার্থকতা আর থাকেনি। আসলে ধনিক ন্যাশন্যালিস্টগণ কোনো লক্ষ্যের দিক থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের সমর্থন করেননি। এই প্রস্তাব পাস করা, এবং এর ওপরে গরম গরম বক্তৃতা করা ছিল তাঁদের একটা চালিয়াতি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দুটি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই মাদ্রাজে তাঁরা এই প্রহসন করেছিলেন। প্রথমত, সাইমন কমিশনকে ভয় প্রদর্শন করা, দ্বিতীয়ত, তাঁদের অসন্তুষ্ট অনুসরণকারিগণকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখা। ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ধনিকগণের যদি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য থাকত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা, তা হলে তাঁরা কখনো ভুলেও সর্বদলসম্মিলন আহ্বান করতে যেতেন না। বিরোধী-স্বার্থ-বিশিষ্ট বিভিন্ন দল কখনো এক হয়ে কাজ করতে পারবে না। ভারতের সকল দলের লোকই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কামনা করবে, এরূপ যাঁরা ভেবে থাকেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করানো খুবই প্রয়োজন। বর্তমান যুগ হচ্ছে ধনিক-শাসনের যুগ। দেশের জনগণ এই যুগে ধনিকগণের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। কাজে কাজেই এই যুগে কোনো দেশের স্বাধীনতা লাভ করার মানেই হচ্ছে ধনিকগণের হাত হতে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। ভারতবর্ষ আবার বিদেশী ধনিকগণের দ্বারা শোষিত ও শাসিত হচ্ছে। দেশীয় ধনিকগণের স্বার্থ দ্রুতগতিতে এই বিদেশীয় ধনিকগণের স্বার্থের সহিত বিজড়িত হয়ে পড়ছে। মোট কথা, আমাদের অধীনতার বন্ধন কেবলমাত্র বাইরে নয়—ভিতর বাহির উভয় দিকের বন্ধনেই আমরা জর্জরিত হয়ে আছি। আমাদের স্বাধীনতা লাভ করার অর্থ হচ্ছে, এই উভয় প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। বর্তমান যুগে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার এ আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ স্থাপন করা ন্যায়, যুক্তি ও ঐতিহাসিক গতির দিক থেকে একেবারেই অসম্ভব।

কংগ্রেসের নেতৃগণ যদি সত্য সত্যই মনে-প্রাণে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাবে বিশ্বাস করতে পারতেন তবে সর্বদলসম্মিলন আহ্বান করার প্রয়োজনই তাঁদের ছিল না। দেশের জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার কাজে জনগণের সহযোগই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শুধু যথেষ্ট বললে অন্যায়

করা হয়, একমাত্র জনগণের অভ্যুত্থানেরই দ্বারা জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ কথাও সত্য যে এই প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমাদের ঘরে-বাইরে উভয় দিকেই সংঘর্ষ বাধবে।

মোট কথা, যখন তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলের কামনা ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা তখনি কংগ্রেসের ধনিক নেতৃগণ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছিলেন কেবলমাত্র আপনাদের নীতির খাতিরে। কাজেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা যাঁরা প্রকৃত লাভবান হবেন তাঁদেরই সহযোগ যাচ্ঞা করে কংগ্রেস সর্বদলসম্মিলন আহ্বান করেছিলেন। অবশ্য এই সম্মিলনে তাঁরা ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজান্টস পার্টি (কৃষক ও শ্রমিক দল) ও কম্যুনিস্ট পার্টি প্রভৃতিকেও ডেকেছিলেন, কিন্তু, ধনিকদের দলের সংখ্যা বেশী জেনেই তাঁরা তা করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কি মুক্তি নামে অভিহিত হতে পারে?

স্বরাজের খসড়া-প্রণয়নকারীরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভই আমাদের জাতীয় মুক্তিরূপে পরিগণিত হবে। তারা এতটা পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আর পরিপূর্ণ স্বাধীনতাতে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। কিন্তু, সত্যই কি তাই? আমরা ওপরে বলেছি যে বর্তমান যুগে কোনো দেশ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে বললে বুঝতে হবে যে সেই দেশে জনগণের অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্বময় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া আর কিছু যে কেন হতে পারে না তা-ও আমরা ওপরে বলেছি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা কোনো প্রকারেই দেশে জনগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা, এর দ্বারা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ ভারতে অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। অক্ষুণ্ণ যে থাকবে স্বরাজের খসড়ার একাদশ পৃষ্ঠায় খসড়া-প্রণয়নকারীরাই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিদেশীয় ও দেশীয় ধনিক একত্র হয়ে এদেশে কারবার (অবশ্য লুণ্ঠনের কারবার) চালাবেন এবং সমবেত ভাবেই শ্রমিকগণের সহিত সংগ্রাম চালাতে থাকবেন। তাঁদের মতে কোনো দেশই এরূপ সংগ্রামের হাত থেকে রেহাই পায়নি। (এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল, আমরা কেবলমাত্র রিপোর্টের একটা অংশের সারমর্ম মাত্র উদ্ধৃত করেছি। এটাকে কেউ যেন অনুবাদ বলে ভুল না করেন।)

এই একটি মাত্র কথার দ্বারাই কংগ্রেস ও অন্যান্য ধনিকদলের মনোবৃত্তি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাঁরা আবার বলেছেন—"Real problem, to

our mind, consists in the transference of political power and responsibility from the people of England to the people of India." অর্থাৎ "আমাদের মতে, সত্যকারের সমস্যা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের জনগণের হাত থেকে ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা আনয়ন করা।" কিন্তু, এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কোনো দেশেই জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, এদেশেও তা পারবে না। তারপরে, এটা কি সত্য কথা যে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হয়? বৃটিশ শ্রমিক ও ভারতীয় শ্রমিক সমভাবেই বৃটিশ ধনিকের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে। বৃটিশ ধনিকগণই ভারতবর্ষকে শোষণের জন্যে শাসন করে থাকেন। ভারতের শাসনের ওপরে বৃটিশ জনসাধারণের এতটুকুও হাত নেই। কাজে কাজেই বৃটিশ জনগণের হাত থেকে ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা আনয়ন করার কথা বলার মতো ধাপ্পাবাজি আর কিছুই হতে পারে না।

বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের লৌহ-শৃঙ্খলে আমরা যে বাঁধা পড়ে আছি তারি বেদনা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় বেদনা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দ্বারা আমাদের সে-বেদনা কিছুতেই তিরোহিত হচ্ছে না। এর দ্বারা লাভবান ও ক্ষমতাবান হবে আমাদের সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা অর্থাৎ আমাদের দেশের ধনিক ও জমিদারগণ। স্বরাজের খসড়ায় বৃটিশ ধনিকগণকে অভয় প্রদান করা হয়েছে। পরোক্ষ ভাবে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের শোষণ কিছুতেই ব্যাহত হবে না। কেবলমাত্র আমরাও তোমাদের সঙ্গে সমভাবে শোষণের অধিকারী হব। এতে তোমাদের ভয়ের (nervous হওয়ার) কোনো কারণ নেই।

আপাত-দৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষণ করবার মতো কিছু কিছু কথা খসড়ায় রয়েছে বটে, কিন্তু এই থাকার যে বিশেষ কিছু মূল্য নেই সে সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।

ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড পিজাণ্টস্ পার্টি (কৃষক ও শ্রমিক দল) পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী। এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত ভারতের কোনো সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। গোলে হরিবোল না করে সকলেরই উচিত সকল বিষয় তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা।

গণবাণী : ২৩শে আগস্ট, ১৯২৮

'শ্রেণী-বিরোধ ও কংগ্রেস'

'শ্রেণী-বিরোধ ও কংগ্রেস' নাম দিয়ে গত ২৪শে আগস্ট তারিখের "আত্মশক্তি'র "চলতে পথে"র কলমে একটি প্রবন্ধ বার হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমাদের প্রতি অর্থাৎ 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজান্টস পার্টি" (কৃষক ও শ্রমিক দল)-এর প্রতি কোনো ইঙ্গিত করা হয়েছে কিনা, তা 'আত্মশক্তি'র সম্পাদকীয় বিভাগ বলতে পারেন, কিন্তু এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমাদের একটা গোলযোগ রয়েছে এবং এই থাকার দরুনই আমাদিগকে দু-এক কথা বলতে হবে। 'আত্মশক্তি' লিখেছেন, "মুক্তিকামী একদল লোক কিছুদিন হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে রাজনৈতিক মুক্তির কোনো অর্থই থাকে না—যদি না জাতির প্রতি লোক পায় অর্থনৈতিক মুক্তি। আর অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিবন্ধকরূপেই রহিয়াছে দেশের জমিদাররা, ধনিকরা, বিত্তবান সাধারণ সকলে। তাঁহাদের একথা যে একেবারেই মিথ্যা এমন কথা আমরাও বলি না, আমরা বলি যে অর্থনৈতিক পরাধীনতার একটা কারণ উহাই সত্য; কিন্তু একমাত্র কারণ কখনই নয়! প্রধান কারণ যাহা তাহা বাড়িয়া উঠিয়াছে বর্তমান শাসন-পদ্ধতির প্রভাবে।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্থনৈতিক শক্তিই (ইকনমিক ফোর্স) সমাজের নানাপ্রকার ওলট-পালট সাধন করে থাকে। অর্থনীতিক মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তির কোনো মানেই যে শুধু থাকে না, তা নয়। অর্থনীতিক মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি কখনো সম্ভবপরও নয়। এই মুক্তির প্রতিবন্ধক শুধু যে দেশীয় ধনিক ও জমিদারগণ এমন কথা আমরা কখনো বলিনি। বিদেশী ধনিকগণও আমাদের অর্থনীতিক অধীনতার জন্যে দায়ী। 'আত্মশক্তি' আমাদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না, তবে একেবারে ফেলেও দিতে চান না। আমাদের অধীনতার প্রধান কারণ, 'আত্মশক্তি'র মতে, বর্তমান শাসন-পদ্ধতি। এই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্যে জাতি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করুক, এইটাই 'আত্মশক্তি' কামনা করেন।

সাধারণত শাসন-পদ্ধতি কিসের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সে-কথাটা আলোচ্য প্রবন্ধের কোথাও উল্লিখিত হয়নি। এ সম্বন্ধে খোলাসা কথা বলতে চাইলে এই প্রবন্ধ এভাবে লেখাটা কিছুতেই সম্ভবপর হত না।

সমাজের উৎপন্ন করার উপায়গুলোর অর্থাৎ means of production-এর ওপরে যাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাদেরি দ্বারা শাসন-পদ্ধতি গঠিত হয়ে থাকে। এই উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপরে যদি সমাজের কতিপয় লোকের কর্তৃত্ব থাকে তা হলে ঠিক তাদেরি সুখ-সুবিধার অনুরূপ করেই শাসন-প্রণালী স্থির করা হয়। আর এই কর্তৃত্ব যদি দেশের জনসাধারণের হাতে থাকে তা হলে দেশের শাসন-পদ্ধতিও দেশের জনসাধারণেরই ইচ্ছানুরূপ গঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার প্রচেষ্টা যুগে যুগে চলে এসেছে। এই যুগেও ধনিকগণ এবং ধনিক-গণের দ্বারা আচ্ছন্ন জাতীয় আন্দোলনকারিগণ এই প্রচেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি করছেন না।

ভারতবর্ষ এখন পরাধীন। বৃটিশ ধনিকগণ আমাদিগকে পদানত করে রেখেছে। তাদের এই পদানত করে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষকে শোষণ করা। এই শোষণের ভাগীদার তারা ভারতবর্ষের ধনিকগণকেও করেছে। তারা বুঝে নিয়েছে যে এই গণ-চৈতন্যের যুগে ভারতের ধনিকগণের সহিত কোনো না কোনো প্রকার স্বার্থের বন্ধন স্থাপন না করে ভারতবর্ষকে শোষণ কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কৃষকদের সহিত যাতে সাক্ষাৎভাবে গবর্নমেন্টের সংঘর্ষ উপস্থিত না হতে পারে এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ ধনিকগণ ভূমিতে বহু মধ্য-স্বত্বভোগীও সৃষ্টি করে রেখেছে। মোটের ওপরে আজকার দিনে বৃটিশ ধনিক শাসকগণ ও দেশীয় শোষকগণ অর্থাৎ ধনিক, জমিদার ও মধ্য-বিত্তবান লোক ক্রমশই অধিকতর স্বার্থ-বিজড়িত হয়ে পড়েছে। এই স্বার্থের অনুরূপ করেই আমাদের বর্তমান শাসন-পদ্ধতি গঠিত হয়েছে, আর এই ভাগাভাগির তারতম্য অনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি খাড়া করার প্রচেষ্টাও হবে। নেহেরু কমিটি দ্বারা যে স্বরাজের খসড়া প্রস্তুত হয়েছে তা থেকেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আপাত-দৃষ্টিতে সার্বজনীন ভোটের অধিকার প্রভৃতি দেখে অনেকেই সংম্মোহিত হবেন, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে এই খসড়া পাঠ করলে সকলেই বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষে বৃটিশ ধনিকগণের শাসন অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে এতটুকু শুধু পরিবর্তন হবে যে লুণ্ঠনের অংশ ভারতের ধনিক প্রভৃতি আরো অনেক বেশী মাত্রায় পাবে। কাজে কাজেই অধিকারও তাদেরি হাতে বেশী করে আসবে। মোট কথা, শাসন-পদ্ধতির ইত্যাকার পরিবর্তনের দ্বারা দেশের জনসাধারণের কোনো উপকারই হবে না। সার্বজনীন ভোটের অধিকার থাকা সত্ত্বেও

পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রনীতিক পরিবর্তন অর্থনীতিক কারণেই সাধিত হয়ে থাকে একথা আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমরা যদি সুচারুরূপে ব্যাপারটা সকলের চোখের সামনে ধরতে না পেরে থাকি তা হলে আমরা এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতেও প্রস্তুত আছি। 'আত্মশক্তি'র প্রবন্ধ যে কংগ্রেসের মুখ-রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। প্রবন্ধের আর-এক জায়গায় লিখিত হয়েছে যে "কংগ্রেস হইতেছে জাতির ঐক্য স্থাপনের প্রধান প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস তাহার পতাকাতলে ভারতের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোকদেরই সমবেত হইবার সুযোগ করিয়া দিবে সকলের অধিকার রক্ষার সমান ব্যবস্থা দ্বারা।" আবার বলা হয়েছে—"কংগ্রেস যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা যখন সাধিত হইবে তখন ধনিকে-শ্রমিকে, জমিদারে -প্রজায় এমন সম্বন্ধ থাকিবে না যাহার ফলে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে চাপিয়া দাবাইয়া রাখিয়া বড় হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। সে ব্যবস্থা যে শ্রেণী-বিরোধ ব্যতিরেকে করা যাইবে না তাহা অভ্রান্ত সত্য নাও হইতে পারে।" 'আত্মশক্তি'র মন্তব্য পড়ে আমাদের সোনার পাথর বাটির কথাই বেশী করে মনে পড়ছে। মানুষকে অন্ধ করে রাখার এর চেয়ে বড় চেষ্টা আর কি হতে পারে তা আমরা জানিনে। কংগ্রেসকে জাতির ঐক্য স্থাপনের প্রধান প্রতিষ্ঠান বলে লিখতে লেখকের মতি যে কেন কেঁপে গেল না তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি। শুধু মুখের কথা বললে তো চলে না, দলীল প্রমাণ কিছু আছে কি? জাতির প্রধান প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস নয়, সে-কথা এর পরের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। সকল শ্রেণীর অধিকার সমানভাবে রক্ষার ব্যবস্থার-দ্বারাই কংগ্রেস আপন পতাকার নীচে সকল শ্রেণীকে সমবেত করবে, এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শুনেছে কি? এমন ভণ্ডামি প্রচারের দ্বারা কোনো কালে কোনো প্রতিষ্ঠান জাতির প্রধান প্রতিষ্ঠান হতে পেরেছে কি? শোষক আর শোষিত জগতে এক হতে পারে না। কংগ্রেস হয়তো তার পতাকাতলে শোষকদের সমবেত করবে, কিংবা করবে শোষিতদের। বাঘ আর ছাগের মধ্যে সাম্য যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি অসম্ভব শোষক আর শোষিতের সাম্য। যাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে চান তাঁরা বাতুল কিংবা ভণ্ড ব্যতীত কিছুই হতে পারেন না।

কংগ্রেসের শত শত কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে তা সমাজের সেই কতিপয় লোকের প্রতিষ্ঠান যারা উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপরে আপনাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছে। এই কথা অস্বীকার করার কোনো সাধ্য

কংগ্রেসের নেই। এ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতোপূর্বে দিয়েছি, এখনো আমরা বহু দৃষ্টান্তর উল্লেখ করতে পারি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ঘটিত ব্যাপারে কংগ্রেস কাদের পক্ষ অবলম্বন করেছে? এই আইন সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের মনোভাব পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে কংগ্রেসের সমর্থন আগাগোড়াই ছিল জমিদার ও মধ্য-স্বত্বভোগীদের পক্ষে। মাটির বুক চিরে যে কৃষক ফসল উৎপন্ন করে দেয় তার স্বার্থ কংগ্রেস কিছুতেই দেখতে পারলে না। কলিকাতায় রেন্ট অ্যাক্টের পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষেও কংগ্রেস ভোট দিতে পারেনি। কেননা, জমিদারের স্বার্থের হানি হবে। জামসেদপুরে শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি হয়েও কংগ্রেসের একজন প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি কারখানার ডিরেক্টরগণের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। এ-সব দেখেশুনেও কি আমাদিগকে বলতে হবে কংগ্রেস শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান নয়?

জমিদারও থাকবে, কৃষকও থাকবে, আবার ধনিকও থাকবে, শ্রমিকও থাকবে—অথচ কেউ কাউকে দাবাতে পারবে না—এমন ব্যবস্থা নাকি কংগ্রেস করবে। এই ব্যবস্থার জন্যে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন হবে, তা-ও নাকি আবার অভ্রান্ত সত্য না-ও হতে পারে। অথচ কি জগাখিচুড়ি যে কংগ্রেস পাকিয়ে তুলবেন সেটা লেখক কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারেননি। কেননা, ব্যক্ত করবার কিছুই নেই। লেখক যা লিখেছেন তা তাঁর মনের সায় নিয়ে যে লিখতে পারেননি তা তাঁর লেখার অসঙ্গতির দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রবন্ধটি লেখার মূল কারণ হচ্ছে নয়কে হয় বলে লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা। শ্রেণীগত স্বার্থের জন্যে যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁরাই প্রচার করেছেন শ্রেণী-সংগ্রামের অপকারিতা। কিন্তু এ-সব জারিজুরি আর বেশী দিন খাটবে না। বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত লোকেরা আজকার দিনে দাবী করতে শিখেছে। সেই দাবীর মুখে এই সব ফন্দীই এক ফুৎকারে উড়ে যাবে।

গণবাণী: ৩০শে আগস্ট, ১৯২৮

'আত্মশক্তি' ও আমরা

গত ২৪শে আগস্ট তারিখে 'ফরওয়ার্ড' পাবলিশিং কোম্পানী'র দ্বারা পরিচালিত 'আত্মশক্তি'-তে 'শ্রেণী-বিরোধ ও কংগ্রেস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ৩০শে আগস্ট তারিখের 'গণবাণী'তে আমরা তারি উত্তরে ঐ শিরোনাম দিয়েই একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেম। এই প্রবন্ধ পড়ে 'আত্মশক্তি'র পেছনে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা খুবই উত্তপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের এই উত্তাপের খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'আত্মশক্তি'র 'কংগ্রেস ও গণমঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধে। কোনো পাঠক যদি আমাদের ও 'আত্মশক্তি'র লেখা পড়ে নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করেন তা হলে তাঁকে বলতেই হবে যে শেষ প্রবন্ধে 'আত্মশক্তি' আমাদের প্রদর্শিত যুক্তি সম্বন্ধে কিছুই না বলে বেশীর ভাগ জায়গাতেই নিতান্ত বাজে কথার অবতারণা করেছেন। আমরা বহুবার বলেছি এবং আজো বলছি যে, কংগ্রেস ভারতের জনগণের প্রতিষ্ঠান নয়। সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের অর্থাৎ যাঁরা জনগণকে শোষণ করে থাকেন কংগ্রেস তাঁদেরি প্রতিষ্ঠান মাত্র। আমরা যে মিথ্যা কথা বলেছি 'আত্মশক্তি' কোথাও তা প্রমাণিত করতে পারেননি। তাই, কোনো না কোনো প্রকারে আমাদের ওপরে কেবল ঝালই ঝাড়তে চেয়েছেন। গোড়াতেই 'আত্মশক্তি' 'গণবাণী'কে বাংলার নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপাত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার অধিকাংশ কৃষক ও শ্রমিকই যে নিরক্ষর তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই এবং এই নিরক্ষরতার জন্যে বিদেশী শাসনতন্ত্র যতটা দায়ী, যে শ্রেণীর লোকদের দ্বারা 'আত্মশক্তি' পরিচালিত হয় সেই শ্রেণীও ঠিক ততটাই দায়ী। তবে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' কেবলমাত্র নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিকের দল নয়—সম্বলহীন অবস্থায় পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে যে-সকল উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক 'ফরওয়ার্ড' পাবলিশিং কোম্পানী'র নিকটে আপনাদের পরিশ্রম বিক্রয় করেছেন এটা তাঁদের মতো লোকেরও দল বটে। 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক যে একথা জানেন না তা নয়, তবে আমাদের কথার জওয়াব যখন তিনি দিতে পারছেন না তখন তাঁকে বাজে কথা বলতেই হবে।

'আত্মশক্তি' লিখেছেন—" 'গণবাণী' শুনাইবার ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা যেমন মনে করেন যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জাতিকে ভ্রাতৃরক্তপাত

করিতেই হইবে—আমরাও তেমনি মনে করি যে কংগ্রেসের সাম্যের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যদি এক শ্রেণী শত্রুতায় মত্ত হয় অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে—তাহা হইলে তাহা সমগ্র জাতির পক্ষেই ক্ষতিজনক হইয়া উঠিবে। সেই জন্যই আমরা কংগ্রেসের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা সমর্থন করি।" শোষক আর শোষিতের মধ্যে সাম্য কখনো স্থাপিত হতে পারে না। জমিদার আর কৃষকের মধ্যে এবং ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে কিভাবে সাম্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব তা কি 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন? সমাজের পরগাছা-স্বরূপ অকর্মণ্য জমিদারগুলো অকারণে অগণিত কৃষকের বুকের রক্ত শোষণ করে খাচ্ছে। সুদখোর মহাজন রাতদিন কেবল কৃষকের সর্বনাশই করছে। এ-সব সত্ত্বেও কৃষক, জমিদার আর মহাজনকে তার পরম সুহৃদ বলে মনে করবে—এরূপটা কি কখনো সম্ভবপর হতে পারে? শ্রমিক যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যে তার নিঃসম্বল হওয়ার সুযোগ পেয়ে, পেটের জ্বালায় তাকে কাবু হতে দেখে—ধনিক তার পরিশ্রমের ধন লুটে খাচ্ছে তখনো কি তাকে মনে করতে হবে যে ধনিক তার অকপট বন্ধু? বৈষম্যের সব কিছু কারণ বাকী থাকবে, অথচ সাম্যও স্থাপিত হবে, এরূপ মত কেবলমাত্র বাতুল আর ধনিক শ্রেণীর লোকেরাই প্রচার করে থাকে। বাতুল যে কেন এরূপ মত প্রকাশ করতে চায় তার কারণ অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। ধনিক এরূপ মত প্রচার করে থাকে তার আত্মরক্ষার জন্যে। প্রচারকার্যের দ্বারা শ্রমিকগণকে আত্মহারা ও সম্মোহিত করে দিয়েই তাদিগকে তাদের পরিশ্রমের ধন থেকে ধনিকরা বঞ্চিত করে থাকে। কংগ্রেসের সাম্য প্রচার এরূপই একটা ব্যাপার মাত্র। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যগণ যে জঘন্য স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা-ও কি কংগ্রেসের সাম্য প্রচারের মধ্যে পরিগণিত হবে? মুক্তিলাভের জন্যে ভ্রাতৃরক্তপাত কখনো করতে হয় না,—তবে শত্রুরক্তপাতের যে আবশ্যক হয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেশের জনগণের মধ্যে যদি কোনো দিন রক্ত-পিপাসা জেগে ওঠে, তবে সে-পিপাসার দমন হবে কেবলমাত্র শোষকের রক্তের দ্বারা,—শোষিতের নয়। শোষক শোষিতের ভাই নয়,—শত্রু, একথা যে না মানবে, মনে করতে হবে যে হয়তো সে মানার সব ক্ষমতা হারিয়েছে, নতুবা সে ভণ্ড।

আমরা বলেছি—অর্থনীতিক মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি কখনো লাভ হয় না। কেননা, অর্থনীতিক শক্তিই জগতের সব ভাঙা-গড়ার মূল কারণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতা দেশের জনগণ কেবলমাত্র তখনি অর্জন করতে পারে যখন অর্থনীতিক শক্তি বহুল পরিমাণে তাদের করায়ত্ত হয়েছে। 'আত্মশক্তি'

এই ঐতিহাসিক সত্যকে ধামাচাপা দেবার জন্যে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন—"ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি কি রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি লাভ করে নাই? স্বাধীন রাষ্ট্র বলিতে লোকে ওই সব দেশকেই বোঝে, যদিও তারা জানে যে ওই সব দেশের সকল বা অধিকাংশ লোক অর্থনীতিক মুক্তি লাভ করে নাই—এমন কি 'গণবাণী'র ভূ-স্বর্গ রাশিয়ার লোকেরাও নয়। আমাদের অর্থনীতিক অধীনতার প্রধান কারণ হইতেছে রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ যতদিন অনধীন না হইবে, ততদিন এমন কোনো ব্যবস্থা করা যাইবে না যাহাতে অর্থনীতিক মুক্তি লাভ হইতে পারে।" 'আত্মশক্তি'র আদর্শ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি, অর্থাৎ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি ও জাপান প্রভৃতি দেশ সত্যই কি স্বাধীন রাষ্ট্র? দেশ বলতে দেশের ধনিকগণকে বোঝায় না—বোঝায় দেশের জনগণকে। কিন্তু এই ক'টা দেশের কোনো দেশই আজ পর্যন্ত প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি লাভ করেনি এবং এই সব ক'টা দেশেই জনগণের সহিত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা যারা অন্যায়ভাবে করায়ত্ত করে রেখেছে, তাদের একটা তুমুল সংগ্রাম চলছে। 'আত্মশক্তি' একথা অস্বীকার করতে পারেন কি? কেবলমাত্র ইংরাজ ধনিকগণের অধিকার চ্যুত হলেই ভারতবর্ষ কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র নামে অভিহিত হওয়ার জন্য ভারতের জনগণের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের ওপরে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হবে। অর্থনীতিক শক্তির ওপরে যথেষ্ট অধিকার যতক্ষণ না জন্মাবে ততক্ষণ কিন্তু রাষ্ট্রের ওপরে জনগণের এই কর্তৃত্ব কিছুতেই স্থাপিত হবে না। অর্থনীতিক শক্তিকে রাশিয়ার জনগণ অনেক পরিমাণে আয়ত্ত করতে পেরেছে বলেই আজ জগতে একমাত্র রাশিয়াতেই জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাঁ, 'গণবাণী' কোনো দেশকেই স্বর্গ বলে মানে না, যাঁদের হয়ে 'আত্মশক্তি' ওকালতি করছেন স্বর্গ আর নরক তাঁদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। এ দুটো বস্তুর লোভ ও ভয় দেখিয়ে লুঠ করার যথেষ্ট সুযোগ ধনিকরা করে নিয়ে থাকে।

'আত্মশক্তি'র মতে কংগ্রেস রাজনীতিক মুক্তির পরিকল্পনা করে সে-বিষয়ে ঘোষণা প্রকাশ করেছে এবং এই ঘোষণার "কোথাও একথা নাই যে মুক্ত ভারতে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে অধিকার-হারা করিয়া চাপিয়া দাবাইয়া রাখিবে—পক্ষান্তরে এই দেশে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের সকলেরই যে সমান অধিকার রহিয়াছে তাহাই স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।" কংগ্রেস মুক্ত ভারতের পরিকল্পনা কখনো করে নাই। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ হতে আরম্ভ করে নেহরু কমিটি পর্যন্ত সকলের দৌড়ই

পৌঁছেচে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা পর্যন্ত। অবশ্য মাদ্রাজ কংগ্রেসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বটে, কিন্তু, সেটাও যে অসন্তুষ্ট লোকদের চোখে ধূলো নিক্ষেপ করার জন্যে হয়েছিল তা পরবর্তী নেহেরু কমিটির রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে। অধিকার সম্বন্ধে যে ঘোষণা নেহেরু কমিটি করেছে সে ঘোষণা কি ইংরেজ করেনি? সার্বজনীন ভোটের অধিকার পাওয়া খুবই বড় কথা বটে, কিন্তু, তা পেলেও দেশের জনসাধারণের হাতে সে ক্ষমতা আসবে এমন কথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রমাণস্বরূপে আমরা ইংল্যান্ডের নাম উল্লেখ করতে পারি, ব্যাপক ভোটের অধিকার থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে সংখ্যায় গরিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ জনগণ আজো 'উপেক্ষিত হয়েই আছে'। উৎপাদনের উপায়গুলি যারা কব্জা করে রেখেছে, সকল অধিকার তাদেরি আয়ত্তে হয়ে আছে। জনগণকে অবজ্ঞন্ন করে রাখার জন্যে ইংল্যান্ডের ধনিকগণের হাতে বিপুল শক্তিশালী প্রেস রয়েছে। এই প্রেসের দ্বারা অনবরত ধনিকদের স্বার্থের অনুকূল প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। মিথ্যা জাতীয়ত্ব ও দেশাত্মবোধের কথা প্রচার করে করে শ্রমিকদের ভাব-প্রবণতার ওপরে ঘা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও যে এরূপ কাজের নমুনা নেই তা নয়। আমাদের শিক্ষিত সর্বহারাগণই আমাদের দেশের ধনিক শ্রেণীর দ্বারা প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রচারের ফলে সব সময়েই বিপথে চালিত হয়ে থাকেন। ধনিকদের সংবাদপত্রের মারফতে পাওয়া তথাকথিত জাতীয়ত্বর মাদকতায় তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে তাঁদের স্থান কোথায়। অন্যান্য দেশেও এরূপ ব্যাপারই ঘটছে। কাজেই, কেবলমাত্র সার্বজনীন ভোটের অধিকারের নামে উৎফুল্ল হয়ে আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিতে পারব না।

'আত্মশক্তি' যে বলেছেন গণ-নেতৃগণ গণ-চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। ধনিকগণ ও তাদের ধর্ম-প্রচারকগণই গণ-চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখার জন্যে চিরকাল চেষ্টা করে আসছে। স্বয়ং 'আত্মশক্তি'ও সেই চেষ্টাকারীদের একজন বটে।

'আত্মশক্তি' লিখেছেন—" 'গণবাণী' আমাদের রাজনীতির এ, বি, সি, বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া নিজের না-বোঝা অনেক রাষ্ট্রতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও বুঝাইতে পারেন নাই যে শ্রেণী-বিরোধের আগুন জ্বালাইয়া তুলিতে পারিলেই অধীনতার বন্ধন কেমন করিয়া

পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।" আমরা 'আত্মশক্তি'কে রাজনীতির এ, বি, সি, শেখাবার ভার কখনো নিই নি। কেবলমাত্র বিশিষ্ট স্থানে রাজনীতির এ, বি, সি, শেখাবার সময়ও আমাদের নেই। তবে তথাকথিত রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেরই এই এ, বি, সি, শেখার প্রয়োজন যে আছে সে-কথা খুবই সত্য। শ্রেণী-সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে আর হবে না, জ্বলেই তা উঠেছে এবং এই আগুনেই অধীনতার বন্ধন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। শ্রেণীর হাতে যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তখন এই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে জনগণকে একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামই চালাতে হবে। অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার মানে কি শ্রেণীর হাত থেকে জনগণের ক্ষমতা গ্রহণ নয়? এই গোড়ার কথাই যদি 'আত্মশক্তি' না বোঝেন তবে কি 'আত্মশক্তি'র এ, বি, সি, শেখার কোনো আবশ্যকতা নেই? আমরা যদি আমাদের না-বোঝা রাষ্ট্রযন্ত্রের অবতারণা করে থাকি তাহলে সব-বোঝা 'আত্মশক্তি' তা বুঝিয়ে দিলেন না কেন? আমরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলাম 'আত্মশক্তি' তো তার নিকটও মাড়ায় নি। 'আত্মশক্তি' যে সব বোঝেন তার একটা নমুনা আমরা নিম্নে দিচ্ছি। 'আত্মশক্তি' লিখেছেন—"জমিদার নাই, ধনিক নাই—এমন দেশও দুনিয়ায় পরাধীন রহিয়াছে এবং সে-সব দেশের লোকেরা ভারতের জনগণ যে জীবন যাপন করিতেছে তাহার চেয়েও হীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।" আমরা এতদিন জানতেম, বাগবাজারেই শুধু এমন এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা এমন সব অদ্ভুত কথা জাহির করতে পারে। কিন্তু, সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি রাণী মুদির গলিতেও তার আড্ডা বসে গেছে। জমিদার নেই, ধনিকও নেই, অথচ দেশটা পরাধীন—এমন অত্যাশ্চর্য দেশের নাম 'আত্মশক্তি' দয়া করে আমাদের জানাবেন কি?

গণবাণী: ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

গোড়ায় গলদ

শ্রমিক আন্দোলনের সহিত বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট থাকিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ইহার গোড়াতেই অনেক গলদ রহিয়াছে। এই সকল গলদ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শ্রমিক আন্দোলন কিছুতেই বিপ্লবের রূপ ধারণ করিতে প্যারবে না। শ্রমিকদের যত ইউনিয়ন রহিয়াছে তাহার শতকরা অন্তত নিরানব্বইটি বাহিরের লোকের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। মজুরদের ইউনিয়ন গড়ার হাজার ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা নিজেরা কিছুতেই ইউনিয়নের কর্মকর্তা অর্থাৎ সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হইতে চাহে না। এই না-চাওয়ার কারণ তাহাদের লেখাপড়া না জানা নহে। খুব বেশীর ভাগ মজুর লিখিতে পড়িতে না জানিলেও অনেক মজুর যে লিখিতে পড়িতে জানে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহারা ইউনিয়নের সেক্রেটারি কিংবা প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হইলে কারখানার মালিকেরা তাহাদিগকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিবে, এই ভয় তাহারা করিয়া থাকে। বাস্তবিক, এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াও থাকে। কাজে কাজেই ইউনিয়ন গড়ার ব্যাপারে বাহিরের লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে মজুরদের আজো পর্যন্ত চলে না।

এই বাহিরের লোকেরা নানা প্রকার মনোভাব লইয়া কাজ করিতে যান। কেহ যান নাম জাহির করার উদ্দেশ্যে, কাহারো উদ্দেশ্য হয় নিছক স্বার্থসিদ্ধি করা, আবার কাহারো কাহারো উদ্দেশ্য হয় লোকহিতৈষণা দেখানো। কোনো কোনো লোকে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য কারখানার মালিকদের দ্বারা গোপনে নিয়োজিতও হইয়া থাকে। অতি অল্পসংখ্যক লোকই আছেন যাঁহারা মজুরদের লোক হইয়া ইউনিয়ন ইত্যাদি গড়িতে যাইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকগণ ছাড়া আর কেহই মজুরদিগকে তাহাদের অবস্থা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সত্যকার ভাবে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহেন না। তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী মজুরদিগকে শুনাইয়া থাকেন। সর্বদাই মজুরগণকে বোঝানো হইয়া থাকে যে তাঁহারা অর্থাৎ নেতৃগণ দয়া করিয়া মজুরদের সংস্রবে আসিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের ক্বচিৎ কদাচিৎ কিছু কিছু ভাল হইয়া থাকে। মজুররা কোনো একটা কথা গভীর

ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুক, এরূপটা এই নেতাগণ কিছুতেই চাহেন না। যে-সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিবার কোনো ক্ষমতা নেতৃগণের নাই সে-সকল প্রতিজ্ঞাও তাঁহারা মজুরদের নিকটে করিয়া থাকেন। এরূপ ধাপ্পাবাজি দিয়া দল পুরু করার চেষ্টা অনেক ভাল মানুষ নেতাকেও আমরা করিতে দেখিয়াছি। মোট কথা, যেরূপ ভাবে আন্দোলন চালানো হইয়া থাকে তাহাতে বোঝা যায় যে নেতারাই আন্দোলনের সব কিছু আর শ্রমিকেরা উহার কেহই নয়।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা এখনই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বার্থপর এবং উদ্দেশ্যহীন ও আদর্শহীন শ্রমিক-নেতৃগণকে আন্দোলন হইতে তাড়ানো খুবই আবশ্যক। এই সম্বন্ধে 'কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর সভ্যগণের দায়িত্ব অনেক বেশী। কেননা, এই দল শ্রমিকদিগের নিজস্ব দল,—তাহাদের প্রতি লোকহিতৈষণা দেখাইয়া তাহাদের মাথা কিনিয়া লইবার জন্য এই দলের সৃষ্টি হয় নাই। অনেক সময় প্রকৃত কথা শ্রমিকেরা শুনিতে চাহে না। সেই জন্য কোনো কোনো শ্রমিক-নেতা মনে করিয়া থাকেন যে শ্রমিকদিগকে ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিয়া লওয়া উচিত। এরূপ করিবার কোনো অধিকার কাহারো নাই। শ্রমিকদিগের কাজ শ্রমিকেরাই করিবে, তাহাদের সংগ্রাম তাহারাই চালাইবে। বাহিরের লোক যদি তাহাদের সহিত মিশিতে যায় তাহা হইলে সেই লোকের একমাত্র কর্তব্য হইবে প্রকৃত ঘটনা শ্রমিকদিগের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া। ইহার জন্য যদি হিতৈষী কিংবা স্বার্থান্বেষী নেতৃগণের কাজের সমালোচনা করার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাও করিতে হইবে এবং কঠোর ভাবেই করিতে হইবে। শ্রমিক-নেতৃগণের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহারা আপনাদের শ্রেণী ও শ্রমিকদিগের শ্রেণীকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রমিকদিগের নিকটে তাঁহাদের শ্রেণী যাহাতে কিছুতেই খাটো না হয় এই চেষ্টার ত্রুটি তাঁহারা কিছুতেই করেন না। কোনো নেতা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা শ্রমিকদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহার সব দোষ ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করা হয় শুধু এই কারণে যে নেতাদের মধ্যে একটা মত-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে একথা শ্রমিকেরা জানিয়া লইবে অর্থাৎ নেতাদের শ্রেণীর উপরে শ্রমিকদিগের একটা খারাব ধারণা জন্মিয়া যাইবে।

'কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর সভ্যগণের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য হইতেছে—এই সকল বিষয়ে শ্রমিকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। এই জন্য যদি

কাহারো অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়। অপর লোকে যাহাই কিছু করুক না কেন, গোঁজামিল দেওয়া 'কৃষক ও শ্রমিক দল'-এর সভ্যদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইবে। এই কথাটা আমাদিগকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে গোড়ায় গলদ রাখিয়া কোনো কাজেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না।

গণবাণী: ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৮

কৃষক-সমস্যা

মাত্র আঠারো-উনিশ বছর আগে আমরা কৃষক-সভা গড়ার কাজ শুরু করেছিলাম। তখনকার দিনের কর্মীরা এখনো অনেকে যে শুধু বেঁচে আছেন তা নয়, তাঁদের অনেকে এখনো কর্মক্ষেত্রেও রয়েছেন। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষক-সভা গড়ার কাজে আমরা নেমেছিলাম, আর কী-বা ছিল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সেই সম্বন্ধে সভার প্রথম দিনের সংগঠকদের স্মৃতি ঝাপসা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এখন দেখছি অনেকের অনেক কিছু মনে নেই।

কৃষক-সভার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। তার ফলে সভার প্রথম যুগের দলীল-পত্রগুলো কোথায় যে উড়ে গেছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অনেকের স্মৃতি যে আজ ঝাপসা হয়ে এসেছে লিখিত দলীল-পত্রগুলো না থাকাও তার একটা কারণ।

১৯৩৬ সালে ভারতের অনেক প্রদেশে কাস্তে-হাতুড়িওয়ালা লাল ঝান্ডার ছায়াতলে কৃষক-সভা সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। উদ্দেশ্য ছিল সারা-ভারত কৃষক-সভা গড়ে তোলা। এই চেষ্টায় বাংলা দেশ পেছিয়ে ছিল না। এখানে প্রদেশের কোথাও তখন কৃষকদের সংগঠিত সভা-সমিতি ছিল না, ত্রিপুরা জিলার কৃষক-শ্রমিক সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রদেশের নানা জায়গায় নানা ভাবে কৃষক আন্দোলন হত। যাঁরা এই রকম আন্দোলন করতেন তাঁদের এক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল ১৯৩৬ সালে কলকাতার অলবার্ট হলে। (দুর্ভাগ্য অলবার্ট হল এখন 'কফি হাউস'-এ পরিণত হয়েছে)। নোয়াখালীর ফজ্লুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন এই সম্মেলনের আহবায়ক। সম্মেলনে একটি অস্থায়ী কৃষক কমিটি গঠিত হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে এই কমিটি বাংলার জিলায় জিলায় কৃষক সমিতি গড়ে তুলবে। পরে এই সমিতিগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে হবে সারা বাংলার কৃষক সম্মেলন এবং সেই সম্মেলনে রূপ পাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা।

১৯৩৬ সালে লখ্নৌর এক সারা-ভারত কৃষক সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে কৃষকদের সারা-ভারত সংগঠনের নাম হবে 'সারা-ভারত কৃষক-সভা'। বাংলাদেশেও এই নামের সঙ্গে মিল রেখে প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনের নাম 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা' হবে স্থির হয়েছিল। তবে, বাংলার কৃষকেরা

সমিতি নামের সঙ্গেই বেশী পরিচিত। সেই জন্যে এটাও স্থির হয়েছিল যে জিলা সংগঠনগুলোর নাম জিলা কৃষক সমিতি হবে।

অলবার্ট হলের সম্মেলনের পরে বাংলার অনেক জিলাতেই কৃষক সমিতি গড়ে উঠল। বাঁকুড়ার জগদীশ পালিত বাঁকুড়া জিলা কৃষক সমিতির তরফ থেকে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনকে নিমন্ত্রণ করলেন। ১৯৩৭ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তারিখে বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়েরর নামক গ্রামে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

বাংলার এই প্রথম কৃষক-সম্মেলনের সভাপতি পরিষদের তরফ থেকে আমি একটি লেখা পাঠ করি। এই লেখাটিই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভার প্রথম রাজনীতিক-সাংগঠনিক দলীল হিসাবে সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল। সারা ভারত কৃষক সভার ভিতরে একমাত্র বাংলা দেশেই প্রাদেশিক কৃষক-সভা রাজনীতিক-সাংগঠনিক দলীল পাস করেছিল। বাংলার প্রাদেশিক কৃষক-সভা আর এক বিষয়েও এগিয়ে গিয়েছিল। পাত্রসায়েরর সম্মেলনেই প্রাদেশিক কৃষক-সভার প্রথম গঠনতন্ত্রও পাস হয়েছিল। তার আগে আর কোথাও, এমন কি সারা-ভারত কিসান সভায়ও, গঠনতন্ত্র রচিত হয়নি। সারা-ভারত কিসান সভা প্রথম রাজনীতিক প্রস্তাব পাস করেছিল তার গয়া সম্মেলনে, ১৯৩৯ সালে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভার প্রথম রাজনীতিক-সাংগঠনিক দলীলটি 'কৃষক সমস্যা' নাম দিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর তা পুস্তিকার আকারেও দুবার ছাপা হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর থেকে পুস্তিকাখানা কোথাও আর পাওয়া যায় না। আমার নিজের নিকটেও এর কোনো কপি ছিল না। বর্মণ পাবলিশিং হাউসের মালিক ব্রজবিহারী বর্মণ দয়া করে একখানা উই-এ খাওয়া বই জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তা থেকেই এবারে কৃষক-সমস্যা পুনর্মুদ্রিত হল।

ওপরে বলা হয়েছে যে, ঐ লেখাটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার মূল দলীল হিসাবে প্রথম কৃষক সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। এই জন্যে লেখাটি সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি, আর এর বর্তমান পুনর্মুদ্রণও হল এই কারণেই।

আজকের কৃষক সংগঠনকারীরা আমাদের কৃষক সংগঠনের প্রাথমিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে এই লেখা থেকে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন। এর সব কথা অবশ্য আজ তাঁদের পক্ষে পালনীয় নয়।

১৯৩৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ময়মনসিংহ জিলার কৃষক

সম্মেলনে আমি সভাপতির একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলাম। এই অভিভাষণে আমি কৃষকদের চারটি ভাগে ভাগ করেছিলাম। অবশ্য, লেনিনকে অনুসরণ করেই আমি তা করেছিলাম। ময়মনসিংহ অভিভাষণের এই অংশটুকু শুধু এই পুস্তিকার শেষে উদ্ধৃত করে দিলাম এই কারণে যে শুনেছি আজকাল এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়।

পুস্তিকার ভাষা কিছু কঠিন হয়েছে, অর্থাৎ কৃষক-সভার পক্ষে তেমন উপযুক্ত ভাষা হয়নি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এই লেখাতে আর কোনো অদল-বদল করার উপায় এখন নেই।

১৪ই আগস্ট, ১৯৫৪

মুজফ্ফর আহ্মদ

কৃষক-সমস্যা

সূচনা

আমাদের এই ভারতবর্ষে যত লোক বাস করে তাহার শতকরা তিয়াত্তর জনেরও বেশী কৃষিকার্যের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে। ভারতে যে ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে উহার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই আবার কৃষি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে খুব পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ একটা কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই, এদেশের কৃষক-সমস্যাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো উপায় নাই। বাস্তবিক, আমাদের জাতীয় জীবনে কৃষক-সমস্যা একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যতই আমরা ধীর-স্থির ভাবে এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিব, ততই আমাদের জাতীয় জীবন-সংগ্রামে একটা সুরাহা মিলিবার আশা প্রবল হইয়া উঠিবে।

আমাদের জাতীয় ধন-দৌলতের এত বেশী ভাগের যাহারা উৎপাদক সেই কৃষকদের আর্থিক অবস্থা দ্রুতগতিতে হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা অতি শোচনীয়রূপে ক্ষয়ের মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের দুরবস্থা শুধু যে তাঁহাদের ধ্বংস করিতেছে তাহা নয়, উহার দ্বারা আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনের স্পন্দনও কমিয়া আসিয়াছে। দিনের পর দিন খুব বেশী সংখ্যায় কৃষকেরা ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছেন। মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সকল প্রাথমিক বস্তুর আবশ্যক সে সবের অতি সামান্য অংশও আমাদের কৃষকেরা পাইতেছেন না। সকল সময় হাড়ভাঙা খাটুনি তাঁহারা খাটিতেছেন বটে, কিন্তু, না পাইতেছেন তাঁহারা পেট ভরিয়া খাইতে, আর, না পাইতেছেন মানুষের মতো পরিতে।

কৃষক-সমস্যা সম্বন্ধে অনেকে, এমন কি সরকারের উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীরা পর্যন্ত, অনেক পুঁথি-পুস্তক লিখিয়াছেন, অনেক নির্ভুল ও মূল্যবান পরিসংখ্যা আর তথ্যও তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের কৃষি-উৎপাদনের প্রথা যে এখনও অতি প্রাচীন মান্ধাতা আমলের মতো রহিয়া গিয়াছে সে-সম্বন্ধেও বহু লেখক অনেক কথা লিখিয়াছেন। তবে, কৃষক-সমস্যা

সমাধানের যে রাস্তা তাঁহারা বাতলাইয়াছেন তাহা আসল সমস্যাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই। কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টি বিন্যস্ত-স্বার্থের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের, অর্থাৎ ব্রিটিশের সাম্রাজ্যতন্ত্রমূলক শোষণপ্রথার যাহারা সমর্থক তাহারা কোনো অবস্থাতেই ভুলিয়া যায় নাই যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ধনিকগণের কাঁচা মাল পাওয়ার জায়গা, ভারতের বাজারে ব্রিটিশ ধনিকদের পাকা মালও চালাইতে হইবে ; মোটের উপরে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ধনিকগণের শোষণ করা চাই-ই চাই। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমর্থনকারী অনেক লেখকও কিছুকাল যাবৎ কৃষকদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ঠিকই ধরিতে পারিয়াছেন যে ভারতে বৃটিশের রাষ্ট্রীয় অধিকার, দেশে কলকারখানার বিস্তারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের বাধা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের উপকারার্থই শুধু ভারতীয় আর্থিক-নীতির পরিচালনা করা,—এই সবই হইতেছে আমাদের কৃষকগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ। তবে, দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল লেখকও ভারতীয় বিন্যস্ত-স্বার্থের প্রতিনিধি ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, তাঁহারা যে কর্ম-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন তাহা নিতান্ত সংস্কার-মূলক, কৃষকদের অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁহারা কিছুতেই চাহেন না। দেশীয় ধনিক, বণিক, জমিদার, ভূমির মধ্য-স্বত্বভোগী ও মহাজন প্রভৃতিও কৃষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দারুণ শোষণ করিয়া থাকে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সহিত এই সকল শোষণকারীর আবার একটা অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগও রহিয়াছে। এই কারণে, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃগণের হাত হইতে কৃষকদের সম্বন্ধে যে কর্ম-পদ্ধতি বাহির হইবে তাহা সংস্কার-মূলক না হইয়া বিপ্লব-মূলক হইতেই পারে না। কৃষকদের আসল সমস্যাকে তাঁহারাও যে এড়াইয়া চলিতে চাহিবেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

শ্রেণী-সংগ্রামই কৃষক-সমস্যার মূল

কৃষক-সমস্যার মূলীভূত কারণ শ্রেণী-সংগ্রাম। যাঁহারা শোষণ করেন, আর যাঁহারা শোষিত হন, এই দুইয়ের মধ্যে একটি অবিরাম সংঘর্ষ বাধিয়াই রহিয়াছে। এই সংঘর্ষের নাম শ্রেণী-সংগ্রাম। শোষিতরা সর্বদা এই চেষ্টা করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের উৎপাদিত ধনে অপর কেহ যেন ভাগ বসাইতে না পারে। ইহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কল-কারখানার মজুর ও খেত-খামারের কৃষকেরাই সর্ববিধ ধনের উৎপাদন করিয়া থাকেন, আর, ধনিক, মহাজন ও জমিদার প্রভৃতি পরগাছা সম্প্রদায় শ্রমিক-কৃষকের উৎপাদিত ধনে ভাগ বসায়। শ্রমিক ও কৃষকগণ যে খুশী হইয়া এইরূপ ভাগ বসাইতে দেন তাহা নয়, তাঁহাদের বাধ্য হইতে হয় ভাগ বসাইতে দিতে। কেননা, উৎপাদনের উপায়গুলির, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও জমীন ইত্যাদির মালিক তাঁহারা নন। কল-কব্জা ও মেশিন ইত্যাদি ধনিকগণের অধিকারে থাকে বলিয়া তাহারাই মজুরগণের মজুরি নিরূপিত করিয়া দেয় এবং পেটের জ্বালায় মজুরদের মালিকগণের হাঁকা দরে নিজেদের মেহনত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু মজুরেরা ভাল করিয়া বুঝেন যে, যন্ত্র যত শক্তিমানই হউক না কেন, তাঁহাদের অনশন ও অর্ধাশন-ক্লিষ্ট দুর্বল শরীরের শক্তির সহযোগ ব্যতীত তাহা কখনো চলিতে পারে না। পুঁজিপতির নিকটে যত পুঁজি, যত কল-কব্জাই থাকুক না কেন, সেই সব হইতে ধনের উৎপাদন শুধু মজুরেরাই করিতে পারেন। মালিকেরা মজুরদের তাঁহাদের পরিশ্রমের পুরা দাম দেয় না বলিয়াই লাভবান হয়। এই জন্য, মজুরগণের সহিত মালিকগণের সংঘর্ষ বাধে। মজুরেরা লড়ে তাহাদের ঐক্য ও সঙ্ঘশক্তির জোরে, আর মালিকেরা লড়ে উৎপাদনের উপায়গুলির উপরে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে বলিয়া। ইহাই হইল ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম। কৃষিক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম চলিয়াছে। সেখানে কৃষকরা জলে ভিজিয়া ও রোদে পুড়িয়া ধন-দৌলত পয়দা করে, আর, পরগাছা সম্প্রদায়গুলি নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া সেই ধন-দৌলত আত্মসাৎ করিয়া লয়। কৃষকদের শোষিত হওয়ার প্রথা শ্রমিকদের শোষিত

হওয়ার প্রথা অপেক্ষা বিচিত্রতর ও বহুমুখীন। এখানে জমিদারগণ কৃষকদের কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, আবার কোথাও বা পরোক্ষভাবে শোষণ করিয়া থাকে। যেখানে পরোক্ষ ভাবে জমিদারগণের শোষণকার্য চলে, সেখানে জমিদারগণের নিম্নবর্তী মধ্য-স্বত্বভোগীরাই প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের শোষণ করিয়া থাকে। মোটের উপরে, ভূমির তথাকথিত মালিকগণই কৃষকগণের প্রথম নম্বরের শোষক। অকর্মণ্য মহাজনগণ কৃষকদের দ্বিতীয় নম্বরের শোষক। তাহারা কৃষকদের নিকটে টাকা কর্জ দিয়া বাড়িতে বসিয়া বসিয়া অকর্মক জীবন যাপন করে। কিন্তু, আশ্চর্য এই যে তবুও নাকি তাহাদের লগ্নি-করা টাকা বাড়িয়া যায়! ইহাদের শোষণের ফলে কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যাপারে দালাল, ফড়িয়া ও আড়তদার প্রভৃতিও কৃষকদের শোষণ করিতে ছাড়ে না। আরও বহু লোক কৃষকদের নানাভাবে শোষণ করিবার জন্য বসিয়া আছে, কৃষকদের শোষণ করিলেই তাহাদের দিন চলে। সর্বোপরি, ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমই হইতেছে ভারতীয় কৃষকগণের বড় শোষক। ধনিক-প্রথা যখন চরম উন্নতি লাভ করিয়া একচেটিয়া আকার ধারণ করে এবং কয়েকটি ব্যাঙ্কের হাতে উহার সমস্ত চাবিকাঠি আসিয়া পড়ে তখনই উহাকে ইম্পিরিয়েলিজম বলা হয়। ইম্পিরিয়েলিজমের আমলে শুধুমাত্র স্বদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ করিয়া ধনিক-প্রথার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাই, উহাকে বিদেশে আপন প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়াইতে হয় এবং তজ্জন্য বিদেশকে উহার পদানতও করিতে হয়। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইম্পিরিয়েলিজম। আমরা ভারতবাসীরা উহারই আওতায় পড়িয়া ক্ষয়ের মুখে চলিয়াছি। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ও অন্যান্য বিদেশী ধনিকগণের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ভারতীয় বণিকগণও আমাদের কৃষকগণকে কম শোষণ করে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অনেক প্রকারে ট্যাক্সও কৃষকদের যোগাইতে হয়। মোট কথা, আমাদের কৃষকেরা নানা দিক হইতে নানা ভাবে শোষিত হইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা এইরূপ যত প্রকারের শোষণ-কার্য চলে সে-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করারই নাম শ্রেণী-সংগ্রাম। কৃষকেরা নানা দিক হইতে শোষিত হয় বলিয়া তাঁহাদের নানা দিকে শ্রেণী-সংগ্রাম চালাইতে হয়।

প্রকৃত অবস্থা এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের (সাম্রাজ্য-তন্ত্রের) সমর্থকগণ মানিতেই চাহে না যে কৃষকদের আবার শ্রেণী-সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অনেক বড় বড় নেতাও

কৃষক-সমস্যার ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করিতে রাজী হন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হওয়ার সময় হইতেই যে মানব-সমাজের ইতিহাস একটা নিছক শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা উপরি-উক্ত জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বুঝিয়াও নিজেদের শ্রেণীর বিন্যস্ত স্বার্থের খাতিরে বুঝিতে চাহেন না। সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব নাই, উহা আন্দোলনকারীদের মস্তিষ্ক-প্রসূত একটা ব্যাপার মাত্র, এইরূপ প্রচারের দ্বারা তাঁহারা শ্রেণী-সংগ্রামে বাধা দিতে চাহেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এই ধর্মের দেশে শ্রেণীসংগ্রাম আমদানি না করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে ছাড়েন না। কিন্তু, সত্যই যখন শ্রেণী-সংগ্রাম বিদেশ হইতে জাহাজে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য নয়, এদেশের সমাজের সম্পত্তিগত সম্বন্ধ হইতেই যখন উহার উদ্ভব হইয়াছে, তখন কাহারও কথায় কিংবা ইচ্ছায় উহা থামিয়া যাইবে না ; বরঞ্চ ক্রমশ উহা প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিবে। এই শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়াই আমাদের জনগণ সর্ববিধ শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই কৃষকদের সমস্যা সমাধানের অনেক অদ্ভুত উপায় বাতলাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বর্তমানে কৃষকদের উৎপাদনের যে প্রণালী রহিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিলে, কৃষকদের আষ্টেপৃষ্ঠে যত বন্ধন আছে তাহা কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিলে এবং ভারতের ধনিকগণের হাতে ভারতীয় অর্থনীতির পরিচালনার ভার খানিকটা ছাড়িয়া দিলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কৃষকদের জীবনধারণপ্রণালীর উন্নতিসাধন, তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি করা এবং আরও অনেক বড় বড় বুলিও অনেকে আওড়াইয়া থাকেন। কিন্তু কি করিয়া যে এ-সব সম্ভব হইতে পারে সে-সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বদা নীরব থাকিয়া যান। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার বিশিষ্ট অনুসরণকারীরা প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রথাকেই উচ্চতর আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের 'স্বরাজ' চরখার সুতায় ঝুলিয়া আছে। প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ-প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দুঃস্বপ্ন তাঁহারা দেখেন। অনেক অপ্রচলিত ও অবৈজ্ঞানিক উৎপাদন-প্রণালীর পুনঃপ্রবর্তন তাঁহারা করিতে চাহেন। কৃষক ও জমিদার এবং শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এক কথায়, ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, বুঝেন না যে উহা সর্বদা সম্মুখের দিকেই ঘুরিয়া থাকে।

কৃষকের মূল সমস্যা হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রামেরই সমস্যা। শুধু এই প্রশ্নটিকে ভিত্তি করিয়াই আমরা কৃষকদের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিব। আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, উৎপাদনকারী কৃষক-গণ এবং তাঁহাদের উৎপাদিত ধনের আত্মসাৎকারীদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? যে সামাজিক-প্রথার সহিত এই-সকল সম্বন্ধ সংযুক্ত রহিয়াছে উহা হইতে প্রশ্নগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে কোনও অনুসন্ধানই আমরা করিতে পারিব না। এই পরস্পর সম্বন্ধগুলিকে একত্র করিয়া বিচার করিলে আমরা যে কেবল কৃষক সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির অতীত ইতিহাস জানিতে পারিব তাহা নয়, বরঞ্চ ভবিষ্যতে উহার উন্নতির গতি কি হইবে তাহাও আমরা বুঝিয়া লইতে পারিব। বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের ধনিক-প্রথার যে প্রবর্ধন হইয়াছে তৎপ্রতি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহা না করিলে এই সময়ের মধ্যে যে সকল কৃষক-সম্বন্ধীয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সে সকল সমস্যার কিছুই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। এই দিক হইতে সম্বন্ধগতভাবে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ব্রিটিশ শাসনের ফলে আমাদের কৃষককুল এত দরিদ্র কেন হইয়া পড়িল? ইহা হইতে ভারতের ভবিষ্যৎ কৃষক-সম্বন্ধীয় কর্ম-পদ্ধতিও স্থির করিতে পারিব।

ধনিক-প্রথার প্রবর্তন

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত উন্নততর সামাজিক শৃংখলার, অর্থাৎ ধনিক-প্রথার (ক্যাপিটালিজমের) রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রভুত্বের ভিতরে আসিয়া পড়িল। প্রত্যেক দেশেই ধনিক-প্রথার প্রথম প্রবর্তনের ইতিহাস রক্ত-রঞ্জিত হইয়া আছে। তাহা সত্ত্বেও ধনিক-প্রথা ইউরোপে একটা বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। উহা ইউরোপের সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়া সেখানকার সমাজকে উচ্চ ও উন্নততর উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উহা জায়গীরদার-প্রথা ও আভিজাত্যের বন্ধনকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে এবং তৎস্থলে বুর্জোয়া, অর্থাৎ ধনিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই যুগের জায়গীরদার ও অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় ধনিক সম্প্রদায় বিপ্লবী শ্রেণী ছিল। কিন্তু ধনিক-প্রথা যে পরিবর্তন ইউরোপে আনয়ন করিয়াছিল ভারতে তাহা করে নাই। এই দেশে ধনিক-প্রথা ধ্বংস সাধনের কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু সৃষ্টি কিছুই করে নাই। জমিদারী জায়গীরদারী ও আভিজাত্যের সহিত যদিও ধনিক-প্রথার এতটুকুও সামঞ্জস্য নাই, তথাপি এই সমস্তকেই ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ব্যবসায়ী ধনিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে শুধু লাভ করিবার লোভেই ব্রিটিশ ধনিকগণ ভারতে প্রথম আগমন করিয়াছিল। প্রাচ্যের ব্যবসায়ে ও নৌ-চালনায় একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য তাহারা তখন অত্যন্ত প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে তাহারা ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়াছে। ইহার ফলে ইংল্যাণ্ডে যে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই সে-দেশে শিল্প-বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। এই শিল্প-বিপ্লবের ফলে নব নব যন্ত্রপাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই উদ্ভাবনা আবার ভারতবর্ষকে শোষণ করিবার পথ আরও প্রশস্ততর করিয়া দিয়াছে।

গোড়াতেই ব্রিটিশ শাসকগণ আমাদের কৃষকগণের নিকট হইতে এত বেশী কর দাবী করিয়া বসিল যে তাহা দিতে যাইয়া কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া

পড়িলেন। এই করের জন্য যে অকথ্য অত্যাচার আমাদের কৃষকগণকে তখন সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে খুবই কম। আমাদের দেশে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল সে-সবই ব্রিটিশ বণিকেরা হাতে ধরিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। কেননা, তাহাতে এই দেশে ব্রিটিশের তৈরী মাল চালাইবার সুবিধা হয়। গ্রাম্য-শিল্প ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের যে একটা আত্ম-নির্ভরতা ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাম্য-শিল্পীরা বেকার হইয়া পড়াতে এক দিকে কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশী ভিড় জমিয়া যায় এবং অপর পক্ষে গ্রামবাসীদের শহরের বণিকগণের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে হয়। ফলে, শহরে যে বাজার দ্রুতগতিতে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার সহিত গ্রামের কৃষকগণের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া যায়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতে লেন-দেন, বেচা-কেনা, সব কিছুই টাকা-পয়সার দ্বারা হইতে থাকে, আর ভূমি পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। বাজারে দরের সর্বদা উঠা-নামা হইতে থাকে এবং তাহার ফলে কৃষকেরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে থাকে। ভূমি পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়া পড়ায় সাধারণের ব্যবহৃত ভূমি ও গো-চারণের ভূমি প্রভৃতিরও কোনো অস্তিত্ব আর থাকে না।

ভারতে ধনিক-প্রথার প্রথম প্রবর্তন ব্রিটিশ বণিকের পুঁজির দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছে। এদেশকে নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর ভাবে লুণ্ঠন করা ব্যতীত এই পুঁজি পত্তনের অপর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রিটিশ বণিকেরা তাহাদের এই ঘৃণিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শুধু যে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়াছে তাহা নয়, ভারতের বাজারে ইংল্যাণ্ডে তৈরী হওয়া মাল চালাইয়াছে এবং ভারতে উৎপন্ন কাঁচা মালের একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে রাখিয়াছে। কেননা, কল-কারখানার প্রসার অত্যধিকরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় ইংল্যাণ্ডে কাঁচা মালের খুবই অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বণিকের পুঁজি ভারতের কৃষকগণের পক্ষে অভিশাপের কার্য করিয়াছে। উহার শুরু হইতে পঁচাত্তর বৎসর সময় তো নিদারুণ কৃষি-সংকটের ভিতর দিয়াই কাটিয়াছে। এই সময়ের ভিতরে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের নামে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ও তাহাদের অনুচরবৃন্দ যে অকথ্য অত্যাচার ও লুণ্ঠন করিয়াছে তাহার তুলনা করা কঠিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও অনুরূপ অত্যাচার চলিয়াছিল। গবর্নমেন্ট ও জমিদারগণ অতিরিক্ত মাত্রায় কর আদায় করায় কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় পঁহুছিয়াছিল।

কৃষকদের শারীরিক অবনতি এত বেশী হইয়াছিল যে কোনো রোগই তাঁহারা আর প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না। ১৭৭০ সালে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে কমপক্ষে এক কোটি লোক না খাইতে পাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এইরূপ নিদারুণ সঙ্কটের দ্বারা নিরুপায় হইয়া এবং অত্যাচার-অবিচার সহিতে না পারিয়া কৃষকেরা স্থানে স্থানে জমিদার, নীলকর, সুদখোর মহাজন ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বিগত শতাব্দীর কৃষি-সঙ্কট ও কৃষকের অবনতি

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে অল্পতম ব্যয়ের দ্বারা অধিকতম রাজস্ব আদায় করিয়া লওয়াই ছিল নীতি। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ রাজস্ব দেওয়ার কড়ারে ভূমির উপরে মালিকী স্বত্ব পাইয়া যায়। ইহার পূর্বে তাহারা কমিশনের উপরে আদায়কারী এজেন্ট মাত্র ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কৃষকগণ মালিকানা-স্বত্ব হারাইয়া ইচ্ছা-করিবা-মাত্রই-তুলিয়া-দিতে-পারা প্রজাতে পরিণত হয়। এই-রূপে বিরাট কৃষকসম্প্রদায়কে কয়েকজন নিষ্ঠুর ও লোভাতুর জমিদারের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইল। আইন অনুসারে জমিদারেরা তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ বিক্রয় করিতে পারিত। এইরূপ করিলে প্রজার সহিত আগেকার কোনো চুক্তিই আর বজায় থাকিত না। কাজেই, জমিদার তাহার সম্পত্তি একবার বেনামে লিখিয়া দিয়া পুনরায় নিজের নামে লিখিয়া লইলে যথা ইচ্ছা প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিত। রীতিমতো খাজনা যাহাতে আদায় হয় তাহার জন্য প্রজাদের গিরেফ্‌তার করিবার একটি আইনও পাস হইয়া যায়। এই আইনের বলে জমিদারের হইয়া পুলিস জোর করিয়া প্রজার বাড়িতে ঢুকিতে পারিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু যে জমিদার-নামীয় একটি পরগাছার সৃষ্টি করিল তাহা নয়, জমিদারেরাও আবার তাহাদের মালিকানা-স্বত্বের জোরে অনেকগুলি পরগাছা সৃষ্টি করিয়া বসিল। পত্তনিদার ও তালুকদার * প্রভৃতি মধ্য-স্বত্বভোগীরাই হইতেছে জমিদারের দ্বারা সৃষ্ট পরগাছা। এই মধ্য-স্বত্বভোগীরাও আবার আরও অনেকগুলি নিম্নবর্তী মধ্য-স্বত্বভোগীর সৃষ্টি করিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিস্তার হইল উহার ফলে শুধু যে ব্রিটিশ বণিকেরাই ধন-সম্পদ লাভ করিল তাহা নয়, পরন্তু আমাদের দেশীয় বণিকগণের নিকটেও অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল। অন্যান্য ধনিক দেশসমূহের ন্যায় দেশীয় ধনিকগণের নিকটে সঞ্চিত

* অনেক জায়গায় তালুকদারী-প্রথা জমিদারী-প্রথারও পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। তালুক-গুলিও জমিদারীর মতো কালেক্টরীতে তৌজিভুক্ত আছে।

অর্থ কল-কারখানার সৃষ্টি-করণে ব্যয়িত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, তাহাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ তাহাতে রাজী হইত না : কাজেই এই সঞ্চিত ধন ভূমিতে বিন্যস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু ভূমির উন্নতি বিধানে কিংবা কৃষি-সম্বন্ধীয় উন্নত যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে এই অর্থ লাগানো হইল না, কৃষকদের দুর্গতি বাড়াইবার জন্য ইহার দ্বারা কতকগুলি মধ্য-স্বত্বের সৃষ্টিই শুধু হইল। ভোগ-বিলাসিতার খাতিরে ও সরকারী রাজস্ব প্রদানের জন্য অকর্মণ্য জমিদারগুলির অর্থের অনটন হইলেই তাহারা সালামি লইয়া মধ্য-স্বত্বের বন্দোবস্ত দিত। একবার শুরু হইতেই মধ্য-স্বত্ব ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। বাংলার কোনো কোনো স্থলে কৃষক ও জমিদারের মধ্যস্থলে মধ্য-স্বত্বভোগীর সংখ্যা বার হইতে পঁচিশ জন পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে। এতগুলি পরগাছার শোষণে প্রকৃত কৃষকগণের অবস্থা যে শোচনীয়তম হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

ব্রিটিশ আমলের আর-একটি গ্লানি হইতেছে সুদখোর মহাজনগণ। উহার পূর্বে যে এই মহাজনেরা ছিল না এমন কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তবে, একথা সত্য যে, তখনকার মহাজনের প্রতিপত্তি আজিকার মহাজনের মতো ছিল না। সে-যুগে সমাজে তাহাদের কোনো পদ-মর্যাদা ছিল না বলিলেই হয়। সত্য বলিলে তাহাদের মর্যাদা চাকরদের মর্যাদারই সামিল ছিল। ব্রিটিশ আমলেই দেশের সর্বত্র টাকা-পয়সার দ্বারা লেন-দেন প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা হইতেই বর্তমান মহাজনগণের প্রথম উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা যে সম্পূর্ণরূপেই ব্রিটিশ আমলের অভিশাপস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। কৃষকগণ জমিদার প্রভৃতি ও অপরাপর শোষকদের দ্বারা শোষিত হওয়ার পরে মহাজনগণের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হয়। মহাজনের শোষণও বহুমুখীন। তাহারা যে শুধু টাকা লগ্নি দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে সুদ আদায় করিয়া লয় তাহা নয়, ফসল প্রভৃতির উপরে টাকা অগ্রিম দাদন দিয়াও তাহারা কৃষকদের শোষণ করিতে ছাড়ে না। এইরূপ শোষণের দ্বারা সর্বদা হাজার হাজার কৃষক ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে, কৃষকের চাষের জমীন চলিয়া যাইতেছে মহাজনদের হাতে।

শুধু যে জমিদারী প্রদেশগুলিতে কৃষকের দুরবস্থার সীমা নাই তাহা নহে, রাইয়তওয়ারী প্রদেশগুলিতে কৃষকরা শোচনীয়রূপে শোষিত হইয়া থাকেন। যদিও এই-সকল প্রদেশে কৃষকেরা সাক্ষাৎভাবে গবর্নমেন্টকেই খাজানা দেন, তথাপি এই প্রদেশগুলিতেও যে ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় নাই এমন কথা বলিতে পারা যায় না। রাইয়তওয়ারী প্রদেশগুলিতেও কৃষকের

জমীন মহাজনগণের হাতে চলিয়া যায়। তাহাদের প্রতিপত্তি সর্বত্রই সমান। মাদ্রাজের তামিলভাষী প্রদেশে কৃষকদের অনেকটা ভূ-দাসদের মতোই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। অথচ, ইহা রাইয়তওয়ারী প্রদেশ। পাঞ্জাবে কৃষকদের নিকটেই শুধু জমীন বন্দোবস্ত দেওয়ার আইন রহিয়াছে। কোনও একজন বড় আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, আইন একটা গাধাবিশেষ। সম্ভবত এই কথাটা সত্য। পাঞ্জাবে আইন আছে, কৃষি যাহাদের পেশা তাঁহাদের হাতেই শুধু চাষের জমীন থাকিবে। কাজেই, যে কোনো লোক নিজের পেশা কৃষিজীবী বলিয়া লিখিলেই সে জমীনের মালিক হইতে পারে, সে সত্যকারের কৃষক হউক কিংবা না হউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। শুনিয়াছি, সার ফজল-ই-হুসেয়নও এই জাতীয় একজন কৃষিজীবী ছিলেন।

কৃষক-অভ্যুত্থান

ঊনবিংশ শতাব্দী

কৃষকদের উপরে যত সব অত্যাচার হইয়াছে সেই সকল অত্যাচার যে তাঁহারা সব সময়ে বিনা আপত্তিতে সহিয়া লইয়াছেন, তাহা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর তো ভারতীয় কৃষকগণ বিদ্রোহের পর বিদ্রোহই শুধু করিয়াছেন। ভারতের কৃষি-সম্বন্ধীয় অর্থনীতিতে ধনিক-প্রথার কতক-গুলি নিয়মের জবরদস্তি প্রয়োগ হইতেই এই সকল বিদ্রোহের সূচনা হইয়া-ছিল। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে কৃষকদের পক্ষে উপশমকারী যাহা কিছু নিয়ম-কানুন ছিল সেই সবই ব্রিটিশ আমলে নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ে জমিদার ও মহাজনগণের অত্যাচার অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে। ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির উদ্ভবও এই সময়েই হয়। এই নীলকরগণের জুলুমের কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। হাজার হাজার কৃষক এই সময়ে তাহাদের ভূমি হইতে বিতাড়িত হয়। বিদেশীয় ধনিকগণের প্রয়োজনের তাগিদে ভারতীয় গ্রাম্য-শিল্পীদের শিল্পও এই সময়ে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল লোকের সম্মুখে তখন দারিদ্র্য ও মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। কাজেই, কৃষকেরা বিদ্রোহ যে করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

১৮৫৭ সালে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং যাহা সাধারণত সিপাহী-বিদ্রোহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাতে যে সামন্ত প্রভুগণের বিনষ্ট ক্ষমতা ফিরাইয়া পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের পিছনে ভূমিহীন কৃষকগণের ও কর্মহীন কারিগর-গণের তীব্র অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল, আর, এই অসন্তোষ থাকার দরুনই সিপাহী-বিদ্রোহ জনগণের বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। অবশ্য, কৃষকগণ তাহাদের শ্রেণীর কোনো দাবী-দাওয়া এই উপলক্ষে সকলের সম্মুখে পেশ করিতে পারে নাই। নীলকরেরা যে কৃষকগণের উপর জুলুম করিত তাহার কথা বলিয়াছি। যে-সব জমিতে অপর শস্য বোনা হইয়াছে সে-সব জমি পুনরায় চষিয়া ফেলিয়া নীলের বীজ বপন করিতে নীলকরেরা কৃষকদের বাধ্য করিত। সহিতে না পারিয়া এ-সবের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ করিয়াছিল।

১৮৬০ সালে যে 'ইন্ডিগো কমিশন' বসিয়াছিল, উহার রিপোর্টে কৃষকদের উপরে নীলকরের অমানুষিক অত্যাচারের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণের হাতে অসীম ক্ষমতা আসিয়া যায়। তাহারা শুরু হইতেই সেই ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনকে কৃষকগণের 'সনন্দপত্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই 'সনন্দপত্র' কৃষকগণকে জুলুমের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই। ক্ষমতা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারগণ কৃষকদের খাজনা বাড়াইয়া দিল। শুধু ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিল না, বে-আইনী ভাবে অনেক আবওয়াবও তাহারা কৃষকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে লাগিল। কৃষকগণের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে টাকা আদায় করিবার জন্য জমিদারেরা জালিয়াতির প্রশ্রয় পর্যন্ত লইতে ছাড়িল না। এই সব আমার নিজের তৈয়ারী কথা নহে। তখনকার দিনের সরকারী কাগজপত্রে এই সকল কথার উল্লেখ আছে। অত্যাচার সহিবার সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় পাবনা প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ ১৮৭৩ সালে জমিদারগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। এই বিদ্রোহ খুবই ব্যাপকরূপ ধারণ করিয়াছিল। সমিতি গঠন করিয়া কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা আজকাল নূতন সৃষ্টি হয় নাই। ১৮৭২ সালে গবর্নমেন্ট ঢাকা বিভাগের যে শাসন-সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে কৃষকেরা যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে। শুধু ইহাই নয়, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা যে 'স্ট্রাইক' বা 'ধর্মঘট' পর্যন্ত করিয়াছিল সে-কথারও উল্লেখ আছে। কৃষকদের ধর্মঘট করার মানে যে খাজানা বন্ধ করিয়া দেওয়া একথা আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অবশ্য, পুলিস ও ভাড়া-করা লোকদের সাহায্য লইয়া জমিদারেরা এ সকল 'স্ট্রাইক' ভাঙিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।*

আমেরিকাতে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে আমেরিকা হইতে ইংল্যান্ডে তুলার আমদানি বন্ধ হইয়া গেল। কাজেই, তুলার জন্য ইংল্যান্ডকে বিশেষভাবে ভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ইহার ফলে বোম্বে প্রদেশে তুলার চাষ দ্রুত বাড়িয়া চলিল। এই চাষের কাজ চালাইবার জন্য কৃষকেরা তখন নির্ভাবনায় মহাজনদের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইত এবং কড়া দামে তুলা বিক্রয় করিয়া মহাজনের দেনা অনায়াসে শোধ করিয়া দিত। কিন্তু, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ থামিতেই বোম্বে প্রদেশের তুলার দাম ও

* ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এই সব আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলেই পাস হইয়াছিল।

তুলার ক্ষেতে যাহারা জন-মজুর খাটিত তাহাদের মজুরি কমিয়া গেল। কিন্তু তুলার দাম বাড়িয়া যাওয়ার কারণে গবর্নমেন্ট জমির যে খাজনা বাড়াইয়াছিল তুলার দাম কমিবার পরে সে খাজানা আর কমানো হইল না। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মহাজনেরাও কৃষকদের টাকা কর্জ দিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। ইহাতে মহাজনগণের উপরে কৃষকদের রাগ অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল এবং তাহা প্রকাশ পাইল ১৮৭৫ সনে দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহে। পুনা, সাতারা, আহ্মদনগর ও সোলাপুরে কৃষকেরা গ্রাম্য মহাজনদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের হিসাবের খাতা-পত্র পোড়াইয়া ফেলিয়া তবে ছাড়িল।

বিগত শতাব্দীতে ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন হয়। তাহার ফলে (১) কৃষকেরা বহু সংখ্যায় ভূমিহীন হইয়া পড়ে এবং গ্রাম্য কারিগরেরা বেকার হইয়া যায় ; (২) প্লানটার অর্থাৎ নীলকর প্রভৃতির অভ্যুদয় হয় ; (৩) জমিদারের লাভ হয়, এবং (৪) সুদখোর মহাজনগণের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়।

কৃষক-অভ্যুত্থান

(বিংশ শতাব্দী)

বর্তমান শতাব্দীতেও ভারতের বহু স্থানে কৃষক-অভ্যুত্থান হইয়াছে। সে-সকলের ধারাবাহিক ইতিহাস এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই সমস্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে মালাবারের কৃষক-অভ্যুত্থান। ভারতে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরের সহিত চলিতেছিল তখন সংযুক্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে কৃষক-অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই সময়েই গোরখপুর জিলার চৌরি-চৌরা থানা আক্রমণ করিয়া কৃষকেরা তাহা জ্বালাইয়া দেয়। তাহাতে সেই থানার সমস্ত কর্মচারী প্রাণ হারাইয়াছিল; আমাদের এই বাংলাদেশেও ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কৃষকেরা যে মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল সে-কথা আমরা সকলেই জানি। স্বার্থপর লোকেরা যতই ইহাকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলিয়া ঘোষণা করুক না কেন, ইহা যে শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক-অভ্যুত্থান ছিল, একথা কোনো সত্যান্বেষী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতে আপন শাসন প্রতিপত্তি যখন স্থাপন করিল তখন উহা আনুষঙ্গিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও উন্নতির ব্যবস্থাগুলি ভারতে আনয়ন করে নাই। ভারতে সেই পুরাতন মধ্যযুগীয় সামন্ত-প্রথার আবহাওয়া ষোল আনা থাকিয়া গেল। ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলি ধনতান্ত্রিক ব্রিটিশ শক্তির প্রভুত্ব মানিয়া লইল বটে, কিন্তু, সেই সকল রাজ্যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। ভূমি-স্বত্বের সংস্রবে জমিদারী প্রথা ও নানাবিধ মধ্য-স্বত্বভোগীদের সৃষ্টি ব্রিটিশ আমলেই হইল। অথচ, এই সমস্তের সহিত ধনতন্ত্রের এতটুকুও সামঞ্জস্য কোথাও নাই। রিকার্ডো বুর্জোয়া অর্থাৎ ধনিক প্রভুত্বের সমর্থনকারী একজন প্রখ্যাতনামা অর্থশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। তাঁহার মতে, ভূমিকর বাবদে জমিদারকে একটিও পয়সা দেওয়ার মানে হইতেছে, সেই পয়সাটি প্রগতির বিরুদ্ধে খরচ করা। আমাদের ধনতান্ত্রিক ব্রিটিশ

প্রভুদের আসল মত ইহা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে জমিদারগণ ভূমির মালিক হইয়া বসিয়াছে। অল্প কয়েক দিনের ভিতরেই আমরা একটা নূতন শাসন-পদ্ধতির আমলে আসিব। সেই শাসন-পদ্ধতি এই পরগাছা জমিদার সম্প্রদায়ের আসন এতটুকুও ক্ষুন্ন না করিয়া উহা আরও পাকাপোক্ত করিয়া দিয়াছে। নূতন শাসন-পদ্ধতির আমলেও ভারতের আইন-প্রণয়নকারী সভাগুলি জমিদারী-প্রথা তুলিয়া দিতে পারিবে না। একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতেই সেই ক্ষমতা রাখা হইয়াছে।

আমাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ ধনিক হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ভারতবর্ষকে কল-কারখানাময় দেশ করিয়া তোলে নাই। এদেশে প্রচুর কাঁচা মাল উৎপন্ন হয়। এই কাঁচা মাল সংগ্রহ করা এবং আমাদের বাজারে ব্রিটিশের তৈয়ারী পাকা মাল চালানোই ব্রিটিশ প্রভুগণের নীতি। ভারতে রেলওয়ে অবশ্য ইংরেজ ধনিকগণ তাহাদের নিজেদের তাকিদে স্থাপন করিয়াছে। সৈন্যগণকে এক স্থান হইতে আর-এক স্থানে দ্রুত প্রেরণের জন্য রেলওয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তাহা ছাড়া, দেশের অভ্যন্তর হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবার জন্য, দেশের অভ্যন্তরের বাজারসমূহে ব্রিটিশের তৈয়ারী পাকা মাল চালানোর জন্য রেলওয়ের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আর রেলওয়ে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে তো রেলওয়ের কারখানা স্থাপন করিতেই হইবে। তাহা না হইলে রেলওয়ের কাজ কিছুতেই চলিতে পারে না। ইংল্যান্ডে পুঁজি যখন বাড়তি হইয়াছে তখন কিছু কিছু পুঁজি ভারতেও ঢালা হইয়াছে। অবশ্য, এই পুঁজির বেশীর ভাগ ভারত সরকারকে কর্জ দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এই সূত্রে কিছু কিছু আধুনিক কল-কারখানা ভারতেও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্রিটিশের সহিত বাণিজ্য করিয়া ভারতীয় বণিকগণ যে ধন সঞ্চয় করিয়াছিল তাহারও কিছু কিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-তন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আধুনিক কল-কারখানা নির্মাণে খাটাইয়াছে। ভারত যে কতটুকু পরমুখাপেক্ষী তাহা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারা গিয়াছে বিগত মহাযুদ্ধের সময়। তাই, মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয়দের মালিকানায় কল-কারখানার প্রসার অনেকখানি বাড়িয়াছে। কিন্তু ভারতে কল-কারখানা যে পরিমাণে স্থাপিত হইয়াছে সে পরিমাণে উহা স্বাধীন নহে। মেশিনের জন্য আমাদের বিদেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। মেশিন যে দেশে প্রস্তুত হয় না সে দেশের শিল্পকে কিছুতেই স্বাধীন শিল্প বলিতে পারা যায় না। এত বড় ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র আজমীঢ়ে

বি. বি. অ্যান্ড সি. আই. রেলওয়ের কারখানায় মিটারগেজ রেলওয়ের ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়। আমাদের কৃষিকার্য যে সেই পুরাতন মান্ধাতার আমলের মতনই রহিয়া গিয়াছে সেই কথা তো আগেই বলিয়াছি। মোট কথা, ধনিকতন্ত্রের অধীনে ভারত যেমন আধুনিক কল-কারখানা-সম্পন্ন দেশ হইয়া উঠা উচিত ছিল তাহা না হইয়া উহা আজিও মধ্যযুগীয় নানা অনুষ্ঠানসহ পশ্চাৎপদ দেশই রহিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতকে শোষণ করা এবং এই শোষণেরই খাতিরে উহাকে অনুন্নত করিয়া রাখা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণ-নীতি উহার বিরুদ্ধে যাইবে

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কৃষিনীতি যে উহাকে বরাবর বাঁচাইয়া রাখিবে এইরূপ মনে করা খুবই হাস্যকর হইবে। কেননা, আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র আপন হাতে বিরোধেরও সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে রেলওয়ে, পোতাশ্রয় ও ডক ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। যত কমই হউক না কেন, অন্য নানা প্রকার কল-কারখানাও ভারতে স্থাপিত হইয়াছে। কল-কারখানা হইতে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং আজিকার দিনে ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণী একটা স্বতন্ত্র রাজনীতিক শক্তিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর একটা সংঘাত প্রতিনিয়ত লাগিয়াই আছে। তাহা ছাড়া, প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া রাখার কারণে এবং ভূমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য চালানো মোটেই সম্ভবপর নহে। কৃষিকার্য বরাবর একই প্রকার অনুন্নত অবস্থায় থাকিয়া যাওয়ায় উহা হইতে এমন কিছু সঞ্চিত হইতে পারে না যাহা যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সাম্রাজ্যতন্ত্র পাওয়ার আশা করিতে পারে। কৃষকগণের ক্রয় করিবার ক্ষমতাও ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। আর, কৃষকেরাই যদি কিনিতে না পারে তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় কৃষকগণের সহিত জমিদার, মহাজন ও গবর্নমেণ্টের বিরোধ তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও শাসন-শৃঙ্খলার আমূল পরিবর্তনের জন্য কৃষকদের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও বাড়িয়া যায়। মোট কথা এই যে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের (সাম্রাজ্যতন্ত্রের) নিজস্ব অর্থ-নীতিই উহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত যে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতের অর্থ সামর্থ্য অত্যধিক পরিমাণে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এই কারণে, যুদ্ধের পর হইতে আমাদের দেশে কৃষি-সঙ্কট এক প্রকার লাগিয়াই রহিয়াছে। ১৯১৯ সনে যে ভারত শাসন-সংস্কার আইন আমলে আসে উহার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের ইতিহাসে এই অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই সর্বপ্রথমে কৃষকদের আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। কৃষকেরা এই আহ্বানে প্রচুর পরিমাণে সাড়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সব সময়েই শ্রেণীরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও কৃষকদের আন্দোলন শ্রেণীরূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার ফলে, সংযুক্ত প্রদেশের কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাঁহাদের জমিদারগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়া দেন। এই আন্দোলন খুবই প্রবলরূপ ধারণ করিয়াছিল। কৃষকদের উপরে গুলিও চলিয়াছিল। থানা-ওয়ালাদের জমিদারগণের পক্ষপাতী মনে করিয়া গোরখপুর জিলার চৌরি-চৌরা নামক স্থানের কৃষকেরা সেখানকার থানা পোড়াইয়া দিয়াছিল। মালাবারের মোপলা কৃষকেরা তাহাদের জমিদার ও মহাজনগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া রীতিমতো পরিখা খনন করিয়া উহার ভিতর হইতে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনের নেতারা অবশ্য এই সব ব্যাপারে কৃষকদের কোনও সাহায্য করেন নাই। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়েও কৃষকেরা নানা স্থানে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন; শ্রমিক আন্দোলনও এই কয় বৎসরে প্রবলরূপ ধারণ করিয়াছে। এই সকল আন্দোলনের চাপে বাধ্য হইয়া গবর্নমেন্ট কয়েকটি উপশমকারী আইন পাস করিয়াছে। কিন্তু, এই সকল আইনের কোনটিই কি কৃষক, কি শ্রমিক, কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে নাই।

১৯২৯ সন হইতে যে ব্যাপক আর্থিক সংকট আরম্ভ হইয়াছে উহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার কোনও পথই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই আর্থিক সংকটের দ্বারা আমাদের কৃষক-সমাজের অবস্থা ক্রমশ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। আগে যাঁহারা অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন তাঁহারা এখন দরিদ্র কৃষকে পরিণত হইয়াছেন। আর, যাঁহারা আগে দরিদ্র কৃষক ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই আজ ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছেন। ১৯২১ সনের আদমসুমারী অনুসারে প্রতি হাজার জন কৃষকের মধ্যে প্রায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল দুইশত একানব্বই জন। ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় যে এই সংখ্যা বাড়িয়া প্রতি হাজার জন কৃষকে চারি-শত সাত জনে দাঁড়াইয়াছে। ইহা শুধু বাংলার কথা নহে, ইহা সমগ্র ভারতের সমস্যা।

কৃষিক্ষেত্রে লোকের চাপ অতিমাত্রায় বেশী। সেই কারণে ভূমি ক্রমশই

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। দিন দিন কৃষকের হোল্ডিং এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে যে তাহা হইতে কোনরূপেই কৃষকের সংকুলান হইতেছে না। সব দিক হইতেই আমরা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি।

আমূল পরিবর্তন আবশ্যক

দিন দিন যে সংকটের মুখে আমরা আসিয়া পড়িতেছি উহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার কি উপায় থাকিতে পারে, তাহাই এখন চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম অর্থাৎ সাম্রাজ্যতন্ত্র এই দেশে যে বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার সংকট দেখা দিয়াছে। আমাদের এইসকল সংকট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের দ্বারা আমাদের কোনো দুরবস্থারই আর প্রতিকার হইতে পারে না। যে সকল দুরবস্থার সৃষ্টি সাম্রাজ্যতন্ত্রের অস্তিত্ব বর্তমান থাকার কারণেই হইয়াছে সে সকল যে সাম্রাজ্যতন্ত্র নিজে কিছুতেই দূর করিতে পারে না তাহা খুব সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এই কারণে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনের কবল হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। কিন্তু, যদি আমরা কেবল স্বাধীনতাই লাভ করি, আর, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে কোনো সামাজিক বিপ্লব না ঘটে, তাহা হইলে সেই স্বাধীনতা লাভের কোনো মূল্যই থাকিবে না। দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া আমাদের বিরাট কৃষক-সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগের একটা চরম প্রতিকার শুধু এক আমূল সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারাই হইতে পারিবে। তবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের অস্তিত্ব দেশে বর্তমান থাকিলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। তাহারই জন্য সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনের হাত হইতে ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক।

আমরা যে ভারতের জাতীয় বিপ্লবের কথা ভাবিয়া থাকি তাহা একমাত্র সাম্রাজ্যতন্ত্র-বিরোধী কৃষি-বিপ্লবের দ্বারাই সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আমাদের জাতীয় বিপ্লব কথার মানেই হইতেছে কৃষকদের জীবনে এক বিরাট, বিশাল সামাজিক বিপ্লব। এক দিকে রাজা-রাজড়া ও জমিদার প্রভৃতির অত্যাচার এবং অপর দিকে ব্রিটিশ ধনিকগণের শোষণের দ্বারা আমাদের কৃষকগণের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই সবের

বিরুদ্ধে বিশাল কৃষক-সমাজ যদি খাড়া না হয় তাহা হইলে আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে সফলতার আশা খুবই কম।

যতই দিন যাইতেছে ততই বর্ধিত হারে ভারতীয় কৃষকগণকে ট্যাক্স ও করভার বহন করিতে হইতেছে। তাঁহাদের নিত্য-ব্যবহারের অধিকাংশ জিনিসের উপরেই ট্যাক্স ধার্য হইয়া গিয়াছে। এদিকে তাঁহাদের উৎপন্ন ফসলের দাম কমিয়া গিয়াছে। সুদখোর মহাজনগণের জালে ক্রমশই কৃষকগণ অধিকরূপে জড়াইয়া পড়িতেছেন এবং তাঁহাদের চাষের জমি বেহাত হইয়া যাইতেছে। মোটের উপরে, কৃষকদের আর্থিক অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র ইহা বেশ ভালরূপেই অনুভব করিতেছে এবং অনুভব করিতেছে বলিয়াই সন্ত্রস্ত হইয়াও উঠিয়াছে। কিন্তু, কৃষকদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়াইবার কোনো উপায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র করিতে পারিতেছে না। প্রজননের জন্য ষাঁড় সরবরাহ করিলে, কিংবা কো-অপারেটিভ আন্দোলন চালাইলে কৃষকগণের ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়িতে পারে না। কৃষকগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের আসল যে কারণ— আমাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ তাহা স্পর্শও করেন না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র উহার আয়ের প্রধান অংশ কৃষকগণের নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। কৃষকেরা পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন করে আমাদের ধনিক-প্রভুরা তাহা সস্তায় খরিদ করিয়া লইয়া যায় এবং এই প্রভুদের কারখানায় যে-সব পাকা মাল তৈয়ারী হয়, সে-সব খুব চড়া দামে আমাদের কৃষকগণের নিকটে বিক্রয় করা হয়। জমিদার-মহাজন ও রাজা-রাজড়ার উৎপীড়ন ও শোষণক্লিষ্ট যে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ভিতরে থাকিয়া কৃষকগণ উৎপাদন-কার্যে রত রহিয়াছেন, সেই বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের ধনিক-প্রভুগণ কিছুতেই করিতে চাহে না। অধিকন্তু, উল্লিখিত জমিদার ও মহাজন প্রভৃতির শোষণের উপরে আমাদের এই ধনিক-প্রভুরাও নির্মমরূপে কৃষকদের শোষণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই শোষণের মাত্রা আবার ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রিটিশ ধনিকগণের ভারতীয় কৃষকগণকে শোষণ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই তাহারা ভারতীয় জমিদার ও মহাজন প্রভৃতির যে-শোষণ আমাদের কৃষকগণের উপর চলিতেছে, তাহাতে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। কেননা, এই শ্রেণীগুলিই ভারতে ব্রিটিশ ধনিকগণের পক্ষে সামাজিক সহায়তার প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। কাজেই, ভারতীয় জমিদার ও মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হওয়াটা ব্রিটিশ ধনিকগণের পক্ষে স্বাভাবিক।

সম্প্রতি ভারতের যে নব-শাসন-পদ্ধতি রচিত হইয়াছে তাহারও ভিত্তি এইরূপ সখ্য স্থাপনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রত্যেক বিপ্লবের দ্বারাই একটা আমূল সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা যে জাতীয় বিপ্লবের কথা বলিয়া থাকি তাহার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আসিবে। আগেই বলিয়াছি যে, কৃষি-বিপ্লবরূপেই এই পরিবর্তন দেখা দিবে। কাজেই, এই পরিবর্তনের কাজ অগ্রসর করিবার জন্য যে সংগ্রাম আমরা চালাইব তাহা শুধু ব্রিটিশ ধনিক-শোষণকারীদেরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না, পরন্তু তাহাদের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ আমাদের গ্রাম্য শোষণকারীদের বিরুদ্ধেও আমাদের কৃষকগণের সংগ্রাম চলিবে। মোট কথা, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে আমরা কিছুতেই আমাদের কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রাম হইতে পৃথক করিতে পারিব না। কৃষকদের উৎপাদন-প্রথার সহিত যত প্রকার শোষণের ও পরগাছা সম্প্রদায়ের সংস্রব রহিয়াছে সে-সমুদায়কে সমূলে উৎপাটিত করিয়া না ফেলিলে কৃষক-সমস্যার প্রকৃত সমাধান কিছুতেই হইবে না।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে জমিদার ও রাজা-রাজড়ার শোষণের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে যে বিপ্লব আসিয়াছিল, ঠিক সেই বিপ্লবের জন্যই আমাদের এখন সংগ্রাম করিতে হইবে। এইরূপ বিপ্লবের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্তন ঘটিবে ঃ—

(১) সর্বপ্রকার জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ সাধন। এই উচ্ছেদের দ্বারা সকল প্রকার মধ্য-স্বত্বভোগীরাও লোপ পাইবে।

(২) ধনতান্ত্রিক-প্রথার পূর্ববর্তী, অর্থাৎ, মধ্যযুগীয় যে সকল শোষণ-প্রথা (যেমন, ভূ-দাসত্ব, নজরানা, বেগার প্রভৃতি) এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান আছে সে-সমুদায় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে।

(৩) দেশীয় রাজা-রাজড়ারা ভারতের যে-সকল অংশ শাসন করিতেছে সে সকল স্থান হইতে তাহাদের বর্বর যথেচ্ছাচার-মূলক শাসন তুলিয়া দিতে হইবে।

(৪) এখন যে শোষণতান্ত্রিক ও মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসন-প্রথা আছে তাহার স্থলে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটের অধিকারের উপরে গঠিত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আমাদের এই বিরাট দেশে কৃষকেরা সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন কল-কারখানার মজুরদের মতো সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল

নহে। কাজেই, কৃষকদের সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইয়া কল-কারখানার মজুরগণের সহায়তা লাভ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, সংগ্রামের নেতৃত্বের ভারও শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই অর্পণ করিতে হইবে। মজুর-শ্রেণীর প্রতিদিনকার জীবনের সহিত পল্টনের সিপাহীদের জীবনের তুলনা করা চলে। বাঁশি বাজিলে তাঁহারা কলে ঢোকেন, আবার বাঁশি বাজিলেই তাঁহারা কল হইতে বাহির হইয়া আসেন। মজুর-শ্রেণীর হাজার হাজার লোক একত্রে সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করেন। অল্পক্ষণের খবরেই হাজার হাজার মজুর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। ট্রেড ইউনিয়নের ভিতর দিয়াও মজুরেরা সংগ্রামের একটা সুশিক্ষা পাইয়া থাকেন। আবার কৃষক-শ্রেণীর মতো মজুর-শ্রেণীও শোষিত হইয়া থাকেন। এখানে কৃষকদের সহিত মজুরদের একটা খুব বড় ঐক্য রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, নিঃস্ব হইয়াই মজুরেরা সাধারণতঃ কল-কারখানায় মজুরি করিতে আসেন। কাজেই, সংগ্রাম করিয়া বিত্তহীন মজুরদের হারাইবার কিছুই থাকে না, কিন্তু, লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে অনেক। এই সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে দেশের অসংখ্য গ্রামে ছড়ানো কৃষকগণের সংগ্রামের নেতৃত্বেও মজুরগণই গ্রহণ করিতে পারিবে। দেশের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের যে-সকল লোক শোষণের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারিয়াছেন এবং শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছেন, সে-সকল লোকও শ্রমিক ও কৃষকগণের সংগ্রামের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ ধনিকগণের শাসন হইতে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করিবে তখন আমাদের শ্রমিকশ্রেণী বহুল পরিমাণে শোষণের হাত হইতে মুক্ত হইবে। বিদেশীয় মালিকদের চালিত কারখানাগুলির উপরে শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে। আগেই বলিয়াছি যে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব হইবে এবং সেই বিপ্লব কৃষি-বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই হইবে না, কাজেই, ইহার পর যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সমস্ত ধন-দৌলত পয়দাকারী শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর যে যথেষ্ট প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। যাঁহারা লড়াই করিয়া শাসন-ক্ষমতা লাভ করিবেন সেই ক্ষমতা যে তাঁহারা অন্য শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দিবেন না, এমন কথা ভাবা তো খুবই স্বাভাবিক।

কৃষক সংগঠন অপরিহার্যরূপে আবশ্যক

কৃষকদের ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। ভারতের একটা আমূল সামাজিক পরিবর্তন যাহাতে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধিত হয় তাহার জন্য কৃষকদের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু, সেই শুভদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া আমরা যে কৃষকদের প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগকে এড়াইয়া চলিব, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। কৃষকদের ছোট-বড় যত অভাব-অভিযোগ আছে সে সকলেরও প্রতিকারের জন্য আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে। তাহাদের প্রতিদিনের এই ছোটখাটো অভিযোগের প্রতিকারের জন্য লড়াই করিয়াই আমরা তাহাদের চরম সংগ্রামের স্তরে পঁহুছিতে পারিব। কিন্তু কোনও আন্দোলন কিছুতেই জোরালো হইয়া উঠিতে পারে না যদি না উহার পিছনে একটা শক্তিশালী সংগঠন থাকে। সংগঠনহীন আন্দোলন কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। এতকাল কৃষকদের যত আন্দোলন হইয়াছে তাহা কখনও কৃষকসংগঠনের ভিত্তির উপরে হয় নাই। তাহা ছাড়া, এক জায়গার আন্দোলনের সহিত অপর এক জায়গার আন্দোলনের কোনো যোগাযোগও এতকাল ছিল না। এই কারণে, কৃষক আন্দোলন যতটা শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল ততটা শক্তিশালী তাহা হইতে পারে নাই। বড়ই সুখের বিষয় যে, কিছুকাল হইত কৃষকগণের আন্দোলনকে সংগঠনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। আরও সুখের বিষয় এই যে, এই প্রচেষ্টা সমগ্র ভারতের কৃষক আন্দোলনকে একই সূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার জন্যই হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে 'নিখিল ভারত কৃষক-সভা' (All India Kisan Sabha) গঠিত হইয়াছে। যে সকল স্থানে কোনো না কোনো প্রকারের কৃষক সংগঠন ছিল সে সমুদায়কে ভিত্তি করিয়াই 'নিখিল ভারত কৃষক-সভা' প্রথমে গঠিত হইয়াছে। এখন ভারতের প্রায় প্রদেশেই উহার প্রাদেশিক শাখাসমূহ গঠিত হইতেছে। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতার বাংলার কৃষক সংগঠনকারীদের একটা সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। সেই সম্মেলনেই প্রথম 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটির অধিনায়কত্বেই আজ আমরা এই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে' (পাত্রসায়েরে, বাঁকুড়া) সমবেত হইয়াছি।

আজ এই সম্মেলনেই আমরা 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা' যথারীতি গঠন করিব। আমাদের এই প্রাদেশিক কৃষক-সভা অবশ্য 'নিখিল ভারত কৃষক-সভা'র প্রাদেশিক শাখা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিবে। ইতোমধ্যেই বাংলার কয়েকটি জিলায় আমাদের সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা কৃষকসংগঠনসমূহকে উপর হইতে গড়িবার চেষ্টা না করিয়া নীচ হইতেই গড়িয়া তুলিবে। কমপক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা আমাদের সংগঠনের কাজ আরম্ভ করিব।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলায় সময়োচিত ভাবেই গঠিত হইতেছে। নানারূপ সংকটের আবর্তে পড়িয়া আমাদের কৃষক-সমাজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় তাহাদের সংগঠিত করিয়া তোলা অপরিহার্য-রূপে আবশ্যক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষকগণের একটি শ্রেণী-সংগঠন। কৃষকদের যাহারা শোষণকারী তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিচালনা করাই কৃষক-সভার উদ্দেশ্য। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) যে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক-দের শ্রেণীসংগঠনসমূহের কাজ কংগ্রেস কিছুতেই করিতে পারিবে না। রাজনীতিক দল অর্থাৎ পার্টিগুলি শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ভিত্তিতে গঠিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থ থাকে বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মেলনে কোনও একটি রাজনীতিক পার্টি গঠিত হইতে পারে না। কংগ্রেসে ধনিক শ্রেণীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকিলেও উহার ভিতরে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও রহিয়াছে। কাজেই, কংগ্রেসকে রাজনীতিক পার্টি নামে কোনো অবস্থাতেই অভিহিত করা যাইতে পারে না। উহা একটা রাজনীতিক আন্দোলনের সংগঠন-বিশেষ, আরও খোলাসা করিয়া বলিতে গেলে, উহা বিভিন্ন রাজনীতিক মতাবলম্বীদের একটা সম্মেলনক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। বলা বাহুল্য যে বিভিন্ন রাজনীতিক মতাবলম্বী দল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই গঠিত হয়। যে সকল দল সাম্রাজ্যতন্ত্রের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে চাহে তাহাদেরই একটা সমবেত সংগ্রামের মিলন-মঞ্চে কংগ্রেসকে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা এখন চলিতেছে। আমরা চাহিতেছি যে এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ফলবতী হউক। ইহা সত্ত্বেও শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেসও এই

কথা জানে এবং মানে। এতৎসম্পর্কে আমি করাচি হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে যে মূল দাবিসমূহ বারে বারে গৃহীত হইয়াছে সে-সমুদায়ের উল্লেখ করিব।

বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি কম, বাংলার কৃষকগণের মধ্যে আবার খুবই কম। এই কম প্রতিপত্তি হওয়ার কারণ আছে এবং সেই কারণের সহিত বিজড়িত সমস্যাও খুব কঠিন। বাংলার কৃষকেরা বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে শোষিত হইয়া থাকেন। কৃষকদের স্তরের উচ্চে যতগুলি সামাজিক স্তর আমাদের দেশে আছে উহাদের সবগুলিই কৃষকদিগকে শোষণ করিয়া পুষ্ট হয়। এই অতি সত্য কথাটিকে যে অস্বীকার করিবে, সত্যের প্রতি যে তাহার এতটুকুও আস্থা নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কংগ্রেস যাঁহাদের হাতে আছে তাঁহাদের অধিকাংশই কৃষকদের শোষণের সহিত সংশিলষ্ট রহিয়াছেন। এই কারণে কৃষকেরা সর্ব্বদাই কংগ্রেসের লোকদিগকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে। যাহারা ভক্ষক তাহারা যে সহজে রক্ষকও হইয়া উঠিতে পারে একথা কৃষকেরা বিশ্বাস করিতে পারে না। ১৯২৮ সনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের সময়ে কংগ্রেসের মনোনীত সভ্যেরা কৃষকের স্বার্থের পক্ষে ভোট না দিয়া জমিদারের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।* ইহাতে কৃষকেরা কংগ্রেসের উপরে সকল বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। গত নির্বাচনের ফলাফল হইতে আমরা একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। বাংলার কৃষকগণের মধ্যে মুসলমান-ধর্মাবলম্বীরই বিপুল সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে। অথচ, কংগ্রেসের নামে একজনও মুসলমান বাংলার আইনসভায় (লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বিতে) নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা কংগ্রেসী মুসলমান, কিংবা কংগ্রেস-ভাবাপন্ন মুসলমান, তাঁহারাও কংগ্রেসের নামে নির্বাচন-প্রার্থী হইতে সাহস করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে অবর্ণ-হিন্দুরাই কৃষক, বর্ণ-হিন্দুরা নয়। এই অবর্ণ-হিন্দুদের মধ্য হইতেও মাত্র চারিজন লোক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাংলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বিতে নির্বাচিত হইতে পারিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি যে বাংলার কৃষকগণের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ কত কম! কৃষকগণের সহিত কংগ্রেসের এই সংস্রবহীনতার আসল কারণও

---

*এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু আইনসভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে আইনসভার কংগ্রেস সভ্যেরা কৃষকস্বার্থের বিরুদ্ধে এবং জমিদারদের স্বার্থের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

আমি উল্লেখ করিয়াছি। কাজেই সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ হইবে না।

নিখিল ভারত কৃষক-সভার বাংলার শাখা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা প্রয়োজনের তাকিদেই গঠিত হইতেছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষক-সমিতিও ঠিক এই প্রয়োজনের তাকিদেই গঠিত হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষকগণের একটি অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান শুধু হইবে না, ইহা কৃষকদিগকে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত করিয়া তুলিবে। ইহা কৃষকগণের একটি সংগ্রামশীল সংগঠন হইয়া উঠিবে। কেবলমাত্র সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য লইয়া কোনো সংগঠনই আজিকার দিনে টিকিয়া থাকিতে পারে না, বিশেষ করিয়া ভারতের মতো অধীন দেশে রাজনীতিক-উদ্দেশ্য-বিবর্জিত সংগঠনের অস্তিত্ব থাকা একেবারেই অসম্ভব। অপর দিক হইতে দেখিতে গেলে আর্থিক স্বার্থের ভিত্তির উপরেই রাজনীতির জন্ম হইয়াছে। কিন্তু, আমি আগেই বলিয়াছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষকগণের কোনো অভিযোগকেই এড়াইয়া চলিবে না, তা সে-অভিযোগ যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন। কৃষক সমিতিগুলি যদি কৃষকদের প্রতিদিনের ছোট-খাটো অভিযোগগুলির প্রতিকারের জন্য লড়াই করিতে না পারে তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে কৃষকের বড় লড়াইও কৃষক সমিতি লড়িতে পারিবে না। কৃষক সংগঠনের কাজে যাঁহারা নিয়োজিত রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই বিষয়টির প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কৃষক ও শ্রমিকগণের এমন অনেক নেতা আছেন যাঁহারা নিজেদের স্বার্থই শুধু সিদ্ধ করিতে চাহেন, শ্রমিক-কৃষকের ভাল কখনও চাহেন না। এই-জাতীয় নেতারা বলিয়া থাকেন যে শ্রমিক-কৃষকের পক্ষে রাজনীতির চর্চা করা উচিত নহে, তাঁহাদের উচিত নিজেদের অবস্থা শোধরাইবার জন্য শুধু সংস্কার-মূলক আন্দোলন করা। কিন্তু, এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে-কোনও অর্থনীতিক আন্দোলন রাজনীতিক আন্দোলনও বটে। রাজনীতি কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ-ফল নহে। যে-কোনও শ্রেণীর (ধর্ম-সম্প্রদায়ের নহে) শ্রেণীগত স্বার্থের সংরক্ষণ বা উদ্ধারের জন্য যে আন্দোলন বা সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাহারই নাম রাজনীতি বা পলিটিক্‌স্‌। স্টেট বা রাষ্ট্র শ্রেণী-বিশেষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার একটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে আসা একান্তই আবশ্যক। শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থোদ্ধারের জন্য যখন যে-ভাবেই আমরা লড়াই করি না কেন, রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত করার লক্ষ্য হইতে আমরা

এতটুকুও বিচলিত হই না। মোট কথা, শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী-স্বার্থের যে সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলিয়া আসিতেছে তাহা রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে কৃষক আন্দোলন করিতে যাইয়া কৃষকদের অতি ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগকেও আমরা এড়াইয়া চলিব না। এই দিক দিয়া কৃষক সংগঠনকারিগণ যত অধিক তথ্য ও পরিসংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারিবেন ততই আমাদের কাজের সুবিধা হইবে। কৃষকগণের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ উপশমকারী আইন পাস করাইয়া লইবার বিরোধীও আমরা হইব না। বরঞ্চ, এইরূপ আইন পাস করাইয়া লইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও আমরা করিব। শুধু এই কথাটাই আমাদের সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে এই জাতীয় আইন পাস করানোই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না।

কংগ্রেস ও কৃষক-সভা

আমি বলিয়াছি যে বাংলায় ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস (ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা) কৃষকগণের উপরে কোনও প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই, এবং বাংলায় কৃষকগণ (যাহারা বিপুল সংখ্যাধিক্যে মুসলমান) কংগ্রেসকে খুব অবিশ্বাসের চোখে দেখে। কেন যে কংগ্রেসের উপরে বাংলার কৃষকেরা ভরসা করিতে পারে না তাহার কারণও আমি উপরে বর্ণনা করিয়াছি। একথা সত্য যে বাংলার কৃষকগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা-সঞ্চার দেশের বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস কখনও করিতে পারিবে না। স্থানে স্থানে কৃষক সমিতিসমূহ গঠন করিলে সেই সকল সমিতির ভিতর দিয়াই শুধু বাংলার কৃষকগণ রাজনীতিক চেতনা লাভ করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা'র অধিনায়কত্বে বাংলার সর্বত্র কৃষক সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু, তাই বলিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা যে কংগ্রেসের সহিত কোনও যোগাযোগই রাখিবে না, এমন কথা কেহ যেন মনে না করেন। কর্ম-পন্থাতিতে যেখানেই কৃষক-সভার সহিত কংগ্রেসের ঐক্য থাকিবে সেখানেই কৃষক-সভা কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়া সংগ্রামের পরিচালনা করিবে। কৃষক-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সঙ্ঘগত ভাবে কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়ার দাবিও আমরা পেশ করিতেছি। অবশ্য, তদ্দ্বারা কৃষক-প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীন সত্তা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে কংগ্রেস কৃষক-সভা ব্যতীত আর কিছুই নহে। একথা অবশ্য ঠিক নয়। কংগ্রেসের ভিতরে কৃষকগণের এমন প্রতিপত্তি কোথাও নাই, যাহা হইতে এমন উক্তি করা সম্ভবপর হইতে পারে। আজকাল কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে গণ-সংযোগের কথা ঘোষিত হইতেছে। এই গণ-সংযোগ শুধু তখনই সম্ভবপর হইবে যখন কৃষক ও শ্রমিকগণের সঙ্ঘগুলিকে উহাদের পৃথক পৃথক সত্তা অব্যাহত রাখিয়া সমষ্টিগত ভাবে কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। গণ-সংযোগের ঘোষণার পিছনে যদি অকপট ঐকান্তিকতা বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইলে গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমষ্টিগত ভাবে সংযুক্ত-করণের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি কংগ্রেসের তরফ হইতে তোলা কিছুতেই উচিত হইবে না। এই প্রস্তাবে রাজি হইলেই শুধু কংগ্রেস সাম্রাজ্যতন্ত্র-

বিরোধী সংগ্রামের শক্তিসমূহের মিলন-মঞ্চে পরিণত হইতে পারিবে। অবশ্য, যতদিন কৃষক-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমষ্টিগত ভাবে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিতে কংগ্রেসকে রাজি করাইতে পারা না যাইবে ততদিন চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকেরা কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দাবির জন্য লড়াই চালাইতে থাকে।

নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা

কিছুদিন পূর্বে যে নির্বাচন হইয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির নাম আশাতীতরূপে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি বর্তমান থাকিতে পৃথক ভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা গড়িয়া তুলিবার আবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তর আমি সংক্ষেপে প্রদান করিব। সকলেই জানেন, কৃষক-প্রজা সমিতির নাম প্রথমে শুধু 'নিখিল বঙ্গ প্রজা-সমিতি' ছিল। প্রকৃত কৃষকগণের সহিত উহার যোগাযোগ ছিল না বলিলেও চলে। অনেক প্রজাই কৃষক বটে, কিন্তু কৃষকমাত্রই প্রজা নহে। যে সকল বড় বড় মধ্য-স্বত্বভোগী কৃষকগণের শোষণের সহিত লিপ্ত রহিয়াছে তাহারাও প্রজা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রজা ও কৃষকের স্বার্থ সব সময়ে এক হইতে পারে না। নূতন আইনে কৃষকদের ভোটের অধিকার কিছু বাড়িয়াছে। তাই নির্বাচনের অল্প দিন পূর্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা-সমিতি উহার নামের সহিত 'কৃষক' শব্দটিও জুড়িয়া দিয়াছে। কৃষকদের ভোট না পাইলে নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। নির্বাচনের পূর্বে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি অতিশয় কর্মঠ হইয়া উঠিয়াছিল। উহার প্রচারের দ্বারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সবই কিছু হইয়াছিল ভোট সংগ্রহের জন্য। কৃষকদের সংগঠিত করিয়া তোলার কিংবা তাহাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার কোনো উদ্দেশ্য যে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির ছিল এমন কোনো পরিচয় উহার কাজ হইতে পাওয়া যায় নাই। নির্বাচন শেষ হইয়া যাওয়া মাত্রই কৃষক-প্রজা সমিতি জমিদারগণের সহিত সোলেনামা করিয়া লইয়াছে। নির্বাচনের সময়ে সকল বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া যাইয়া নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি এখন জমিদার শ্রেণীর সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।* উক্ত সমিতির প্রধান নেতা মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক জমিদারদের সম্বন্ধে ও মিনিস্টারদের পদ সম্বন্ধে পূর্বে যত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই

সবই তিনি এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষকদের স্বার্থকে পদদলিত করিয়া তিনি এখন জমিদারগণের সহযোগিতায় বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতিকে তিনি জমিদারগণের নিকটে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোট এগারো জন মন্ত্রীর মধ্যে তাঁহাকে লইয়া মাত্র দুইজন মন্ত্রী নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য সংগ্রামের পথে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্য যে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির ছিল না, তাহা এখন বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কৃষকদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া উক্ত সমিতি যাহা পাইতে চাহিয়াছিল তাহার সবটা না হইলেও খানিকটা উহা পাইয়া গিয়াছে। কৃষকদের নিকটে যত বড় বড় ওয়াদা নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি করিয়াছিল সে-সবের মধ্যে যে এতটুকুও অকপট সরলতা ছিল না, তাহা এখন বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কাজেই, পৃথক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা সংগঠনের যে অত্যধিক প্রয়োজন আছে সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া, নিখিল ভারত কৃষক-সভার প্রাদেশিক শাখারূপেই আমাদের এই কৃষক-সভা যে গঠিত হইতেছে ইহার প্রতিও সকলের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

---

* এই নিবন্ধ লেখা হওয়ার অনেক পরে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির একটা বিশিষ্ট অংশ মিঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন।

কৃষক আন্দোলন ও ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা

সকলেই জানেন যে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। বাংলার কৃষকেরা তো বিপুল সংখ্যাধিক্যে মুসলমান। কৃষকগণের শোষণের সহিত যাহারা সংলিপ্ত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। এই কারণে, বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে (এই সকল স্থানে মুসলমান কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী) কৃষক আন্দোলনের ভিতর দিয়া অনেক সময়ে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার মূর্তি প্রকটিত হইয়া উঠে। অনেকে আবার নিজেদের কু-মতলব হাসিল করিবার জন্য কৃষকগণের আর্থিক সংগ্রামকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার চিত্রে বিচিত্র করিয়া থাকে। এই সবই হইতেছে মর্মান্তিক দুঃখের বিষয়। কৃষক আন্দোলনকে যাহারা খর্ব করিতে চাহে, কৃষকগণের দাবি-দাওয়ার পূরণে যাহাদের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারা যে কৃষক আন্দোলনকে বিশ্রীরূপে অঙ্কিত করিতে চাহিবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু, কৃষকগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, কৃষকদের সংগ্রামের কাজে যাঁহারা আত্মনিয়োগ ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্বার্থান্বেষী লোকদের ফাঁদে জড়িত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহা খুবই ক্ষোভের বিষয় হইবে। তাঁহাদের সর্বদা এই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে কৃষক আন্দোলন হিন্দু কিংবা মুসলমানের আন্দোলন নহে, উহা শুধু কৃষকগণেরই আন্দোলন। কৃষকেরা কোন্ ধর্ম মানিয়া চলেন তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। ধনের উৎপাদনকারী-রূপে হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ-খৃস্টান প্রভৃতি সর্ব ধর্মাবলম্বী কৃষকগণেরই স্বার্থ এক। এই স্বার্থের উদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্যই শুধু আমরা সংগ্রামের পরিচালনা করিব।

এই সত্য কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মহাজন হিন্দু কৃষক ও হিন্দু খাতককে কখনও রেয়াত করিয়া শোষণ করে না। মুসলমান মহাজন ও মুসলমান জমিদার প্রভৃতিও নিষ্ঠুর ভাবে মুসলমান কৃষকগণকে শোষণ করিয়া থাকে। শোষণের কথা যেখানে উঠে সেখানে ধর্মের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের কোনো আকর্ষণ থাকে না এবং

থাকিতে পারেও না। একটুকু নিরপেক্ষ মন লইয়া বিচার করিলেই আমি যে সত্য কথা বলিতেছি, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অপরে যাহাই করুক না কেন, আমার বিনীত অনুরোধ এই যে কোনো কৃষক সংগঠনকারীই যেন কৃষক আন্দোলনকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক আন্দোলন করিয়া না তোলেন। এইরূপ করিলে কৃষকগণের সর্বনাশ হইবে। ইতোমধ্যেই বহু জিলায় পুলিস 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' নীতি অবলম্বন করিয়া কৃষক আন্দোলনকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জিলায়, বিশেষ করিয়া নোয়াখালি জিলায়, কোথাও ডাকাতি হইলে পুলিস সর্বাগ্রে কৃষক সংগঠনকারিগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অনেক দিন হাজতে বন্ধ করিয়া রাখে, যেন কেবল ডাকাতেরাই কৃষক আন্দোলনের পরিচালনা করিয়া থাকে।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগ

আমি আগেই বলিয়াছি যে কল-কারখানার শ্রমিকগণ ও খেত-খামারের কৃষকগণই শুধু দেশের যাবতীয় ধন-দৌলতের উৎপাদক। এই দুই শ্রেণীই আর সকলের দ্বারা এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর দ্বারা অতি নিষ্ঠুর ভাবে শোষিত হইয়া থাকে। উভয়ই শোষিত হয় বলিয়া কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক; স্বাধীনতা লাভের ও ক্ষমতা হস্তগত করার ব্যাপারে শ্রমিকগণ শুধু আপন শ্রেণীর সংগ্রামের পরিচালনা করিবেন না, তাঁহারা কৃষকগণের সংগ্রামের নেতৃত্বও গ্রহণ করিবেন। কিন্তু, কৃষক আন্দোলনের নেতৃগণ আজিও এই কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তো আবার জিনিসটাকে এত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন যে শহর হইতে কোনো উপদেশ-নির্দেশ নেওয়াই তাঁহারা পছন্দ করেন না। অবশ্য, প্রকৃত সংগ্রামের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো পরিষ্কার ধারণা নাই বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টি এত সঙ্কীর্ণ। গ্রামের কৃষক আন্দোলন ও শহরের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগাযোগ আমাদিগকে অবশ্যই স্থাপন করিতে হইবে। শ্রমিক আন্দোলনের সংস্রবে না আসিলে কৃষক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার পরিষ্কার ধারণা কৃষক সংগঠনকারীদের মনে জন্মিবে না। মাঝে মাঝে কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিগণের যুক্ত সম্মেলন হওয়াও আবশ্যক। এই জাতীয় সম্মেলনের দ্বারা শুধু ভাবের আদান-প্রদান হইবে না, উভয় আন্দোলনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

নবরচিত শাসন-পদ্ধতি

আগামী পহেলা এপ্রিল তারিখে একটি নবরচিত শাসন-বিধি ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহে প্রবর্তিত হইবে। এই শাসন-বিধি আমাদের দেশের জনগণের গঠিত কোনো সভা-সমিতির দ্বারা রচিত হয় নাই। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণী আমাদের দেশকে শোষণ ও শাসন করিতেছে। তাহাদের দেশে তাহাদেরই একটা আইন-সভা আছে, যাহার নাম হইতেছে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট। এই পার্লিয়ামেন্টই নূতন শাসন-পদ্ধতি রচনা করিয়া এই দেশে পাঠাইয়াছে। আমাদের শোষক শ্রেণীর দ্বারা রচিত এই শাসন-পদ্ধতি যে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হইবে না, এই কথা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারা আমরা কোনো সত্যকারের অধিকার লাভ করি নাই। বিদেশীয় শাসকগণের দ্বারা রচিত শাসন-পদ্ধতি হইতে প্রকৃত অধিকার লাভের আশা করাও বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই নূতন শাসন-পদ্ধতির দ্বারা ভারতের জনগণ বিদেশীয় শোষণের হাত হইতে এতটুকুও রেহাই পাইবে না, পক্ষান্তরে, এই দামী শাসনতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য তাহাদিগকে অতিরিক্ত করভারে নিপীড়িত হইতে হইবে। জমিদারী-প্রথার বনিয়াদ ইহার দ্বারা অধিকতর পাকাপোক্ত হইয়া গিয়াছে। এই আইনে প্রাদেশিক গবর্নরগণ ও ভারতের গবর্নর-জেনেরেলের শাসন করিবার, কিংবা, আইন তৈয়ার করিবার ক্ষমতার কোনো সীমা রাখা হয় নাই। তাঁহারা যাহাই করুক না কেন, ভারতবাসীদের তাহাতে বলিবার কিছুই নাই। একমাত্র ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের নিকট ও ইংল্যান্ডে যে ভারত সংক্রান্ত ব্যাপারের মন্ত্রী আছেন তাঁহার নিকট গবর্নর-জেনেরেল জওয়াবদিহী করিতে বাধ্য। ভারতের আর্থিক নীতি পরিচালনার ব্যাপারে কেহ কোনো কথাই বলিতে পারিবে না। সেটা ইংল্যান্ডের ভারত-মন্ত্রী ও ভারতের বড়লাটের বিশিষ্ট দায়িত্ব। ভারতের যে কেন্দ্রীয় আইন-সভা গঠিত হইবে উহার হাতে রাজস্ব ও ব্যয়ের ব্যাপারে অতি সামান্যমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

আমরা যখন নূতন শাসন-পদ্ধতির কথা বলি, তখন কথা উঠে যে তদ্দ্বারা আমাদের কৃষকগণ অতিরিক্ত করভার ও ঋণভার হইতে মুক্তি পাইবেন কিনা, তাঁহাদের উৎপাদন করিবার কল-কৌশলের উন্নতি হইবে কিনা এবং বিনা সুদে

তাহারা টাকা ধার পাইবেন কিনা। ভূমিহীন খেত-মজুরের সংখ্যা আমাদের দেশে সাড়ে তিন কোটীরও বেশী। তাঁহারা ভূমি পাইবেন কিনা, সে-কথাও নব শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে। এইরূপে কল-কারখানার শ্রমিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখ-সুবিধার কথাও উঠে। নূতন শাসন-পদ্ধতিতে এ-সবের কোনো ব্যবস্থাই নাই। এই-সকল কারণে নব শাসন-পদ্ধতি আমাদের নিকটে মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে সকলেই প্রতিবাদ করিয়াছে। এখন হইতে এই শাসন-পদ্ধতিকে বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি যখন শিথিল হইয়া যাইবে তখনই শুধু আমরা বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটের দ্বারা একটা শাসন-পদ্ধতি-রচনাকারী সভা আহ্বান করিতে পারিব। এই সভাই শুধু স্থির করিতে পারিবে যে আমাদের শাসন-পদ্ধতি কোন প্রকারের হইবে। যে প্রকারেরই হউক, তাহাতে যে জনগণের, বিশেষ করিয়া আমাদের কৃষক ও শ্রমিকগণের, যথেষ্ট ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই।*

---

* ১৯৩৭ সনের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তারিখে বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়ের নামক স্থানে নিখিল বঙ্গ কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এই প্রবন্ধটি সেই সম্মেলনের সভাপতি পরিষদের তরফ হইতে পেশ করা হইয়াছিল এবং ইহা ২৮শে মার্চ তারিখে সম্মেলনে পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল।

কৃষকদের বিভাগ

কৃষকদের মধ্যে কয়েকটি বিভাগ রহিয়াছে। সেই বিভাগগুলি মোটা-মুটি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(১) ভূমিহীন কৃষক। ইঁহাদের অনেকে অপরের জমীন ভাগে চাষ করেন। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশেরই আবার কোনো চাষ-বাস নাই। শহরের কল-কারখানায় কাজ-কর্ম পাওয়া যায় না বলিয়াই ইঁহারা গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছেন। খেত-খামারে মজুরি ইঁহারা করেন বটে, কিন্তু সব সময়ে মজুরিও পাওয়া যায় না। আবার মজুরির হার এত কম যে তাহাতে কোনো প্রকারে দিন গুজরান হয় না। গ্রাম-দেশে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে সেই সংগ্রামে এই ভূমিহীন কৃষকেরাই সকলের আগে আগে থাকিবেন। কৃষক সংগঠনকারীদের পক্ষে উচিত হইবে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া খেত-মজুরদের মধ্যে, বিশেষ ভাবে প্রচার-কার্য চালানো। খেত-মজুরদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইলে তাঁহাদিগকে মজুরদের রাজনীতিক দলে টানিয়া আনিবার চেষ্টাও করিতে হইবে।

(২) এমন সকল কৃষক দ্বিতীয় বিভাগে পড়িবেন যাঁহাদের হাতে কিছু কিছু জমি-জমা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভরণ-পোষণ চলে না। যতটুকু জমি তাঁহাদের আছে তাহাতে তাঁহারা চাষও করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গায় মজুরিও তাঁহাদের করিতে হয়। তাঁহারাও নিষ্ঠুররূপে শোষিত হন। কাজে কাজেই, গ্রাম-দেশের সংগ্রামে তাঁহারাও আগুয়ান হইয়া আসিবেন। তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) তৃতীয় বিভাগের কৃষকদের হাতে এতটা জমি-জমা থাকে যাহাতে তাঁহাদের কোনো প্রকারে দিন গুজরান হয়। এইরূপ মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার কৃষকদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু, তাঁহারাও জমিদার ও মহাজন প্রভৃতির দ্বারা শোষিত হন। তাঁহাদের অবস্থাতেও ক্রমশ ভাঙন ধরিয়াছে। কৃষক সংগঠনের কাজে তাঁহাদিগকেও দলে টানিতে হইবে।

(৪) কৃষকদের চতুর্থ বিভাগে পড়ে ধনী কৃষকগণ। তাহাদের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। ধনী কৃষকদের হাতে প্রচুর জমি-জমা থাকে।

তাহারা নানা ভাবে অপর কৃষকদিগকে শোষণ করিতে ছাড়ে না। অপর কৃষকগণের নিকটে তাহারা জমি ভাগে চষিতে দেয়। ভূমিহীন কৃষকদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া তাহারা নিজেদের খেত-খামারে তাঁহাদিগকে গোলামের মতো খাটায়। ধনী কৃষকেরা সুদখোর মহাজনের ব্যবসায় করিয়া সর্বদা কৃষকদের জমি হস্তগত করিবার চেষ্টায় থাকে। তাহাদিগকে কৃষক শুধু এই জন্য বলা যাইতে পারে যে জীবনধারণের চালচলনে তাহারা কৃষকদেরই মতো। শেষ পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই কৃষকদের সঙ্গে থাকিবে না। তবে; গোড়ায় তাহারা জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কৃষকদের সহিত যোগদান করিতে পারে। *

---

* এই অংশটুকু ১৯৩৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ কৃষক সম্মেলনে পঠিত লেখকের অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত।